

এই লেখকের :

শ্রীময়ী

অমানিতা মানবী

দেবা ন জানন্তি
(যন্ত্রস্থ)

শক্তিমান্ তরুণ শিল্পী শ্রীগৌরী ঘোষ 'প্রান্তিক'-এর প্রচ্ছদপট এঁকেছেন। এর জন্যে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা ক'রে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যাপারে সুহৃদ্বর গীতিকবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত নানারূপে সাহায্য করেছেন। এর জন্যে তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।

অবান্তর

উপন্যাস পড়তে ব'সে যদি পাঠককে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত অবান্তর কাহিনীও পড়তে হয়, তো সেটা বিশেষ সুখকর না হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও কয়েকটী কথা এখানে লিখতে বাধ্য হ'চ্ছি। লাভ-পুর, বীরভূমের (শ্রীহীন) তারাশঙ্কর আমি নই ; সুতরাং এই প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, সেই মহাজনের পদাংক অনুসরণ ক'রে নিজের উপ-প্রচারের আম্রেড়ন অথবা অপর পক্ষকে কটাক্ষ করবার মহৎ প্রয়াস নিয়ে এই লেখনী-চালনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ঘটেনি।

আমার কোনো অস্তিত্বই নেই, তারাশঙ্কর নামটা আমার নকল, ডেমি-হিট্‌লারের মতোই ভূয়ো আমি—ইত্যাদি ইংগিত ও মন্তব্য 'আদি ও অকৃত্রিম' (শ্রীহীন) তারাশঙ্কর এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক অশ্লীল-রস-সাহিত্য-সেবী শনিবারের চিঠি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বহু ক্ষেত্রেই করেছেন। (শ্রীহীন) তারাশঙ্কর বলেছেন, প্রবর্তক-এ বহু খোঁজ ক'রেও তিনি আমার কোনো সংবাদই পাননি। কিন্তু এ অভিযোগ অত্যন্ত হাস্যকর। তিনি প্রবর্তক-এ অনুসন্ধান করলেই আমাকে পেতে পারতেন, কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত প্রায় বারো বছর থেকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ওটাও আমার একটী স্থায়ী ঠিকানা। তা' ছাড়া তিনি প্রবর্তক-এ অথবা ডি. এম. লাইব্রেরীতে (আমার উপন্যাস 'শ্রীময়ী' এবং 'অমানিতা মানবী'র প্রকাশক) একখানা পোষ্টকার্ড দিয়েও তো দেখতে পারতেন যে, আমার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় কি না! (খুব সম্ভবতঃ তা' করেন নি এই জন্যে যে, আমার মতো হীনজনের কাছে তাঁর একটা 'অটোগ্রাফ' বিনা আয়াসে এবং অর্থব্যয়ে সংগৃহীত হ'য়ে যাবে!) এ ছাড়াও পয়লা মার্চ ১৯৪৩ তারিখে আমি 'শনিবারের চিঠি'তে আমার নাস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে (শ্রীহীন) তারাশঙ্কর ও সর্বজ্ঞ সজনী দাসের একটা যুগ্ম-প্রয়াসের অযৌক্তিকতা জানিয়ে 'শনি-

বারের চিঠি'-সম্পাদককে যে চিঠি দিয়েছিলাম, তা'তেও আমার ঠিকানা ছিলো। কিন্তু সে চিঠি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক প্রকাশ করবার সাহস পাননি। এমন কি সাধারণ ভদ্রতার সৌজন্যে (শ্রীহীন) তারা-শঙ্কর কিংবা বিজ্ঞ সাংবাদিক সজনী দাসের কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তরও পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের অযৌক্তিকতা ও অভদ্র মনো-ভাবের লজ্জাকে এড়িয়ে গিয়ে 'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক কেবল মাত্র অনুগ্রহ ক'রে ঘোষণা করলেন যে, অতঃপর ভবিষ্যতে আর কোনো গণ্ডগোল ঘট্‌বে না।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তবু সেই 'গণ্ডগোল' থামেনি। সজনী-প্রসাদ-পুষ্ট (শ্রীহীন) তারাশঙ্করের পক্ষ থেকে আমার উপরে পাঠক-সাধারণকে কেন্দ্র ক'রে যে অনর্গল শর-বর্ষণ লক্ষ্য করছি, তা'তে দুঃখের সংগে জানাতে বাধ্য হ'চ্ছি, তাঁর মতো প্রতিভাবান লেখকের কাছ থেকে এই নাম-সম্বন্ধীয় দুর্বলতা আমরা আশা করিনি। তাঁর লেখা কি এতোই তরল এবং স্বকীয়তা-শূন্য যে, আর একজন তারাশঙ্করের উপস্থিতিতে তাঁর এতোদিনের প্রতিষ্ঠিত নামের ভিত্তিতে ফাটল ধরবে? তাঁকে আমরা সত্যিকারের শিল্পী ব'লেই জানতুম। এমন একটা দর-কষাকষি মন নিয়েও যে তিনি সাহিত্য-জগতে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন—এ কথা কল্পনা করতেও দুঃখ বোধ করি। তাঁর এই আসল এবং নকল তারাশঙ্করকে চিনিয়ে দেবার পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টাকে ঠিক সেই কারণেই প্রত্যেকবার অত্যন্ত হাস্যকর ব'লে মনে হয়েছে। ঘটনাক্রমে (শ্রীহীন) তারাশঙ্করের উপস্থিত প্রকাশক 'মিত্র এণ্ড ঘোষ'-এর কর্তৃপক্ষের সংগেও আমি পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি। পরিচয় হয়েছে পরম সুহৃদ যাদু-সম্রাট পি. সি. সরকারের মধ্যবর্তিতায়। তাঁদেরকেও আমার ঠিকানা ইত্যাদি বলেছিলাম। এ ছাড়া বন্ধুবর সরকারের সংগেও (শ্রীহীন) তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তবুও দেখছি, আসল তারাশঙ্করের কাছে আমি যথাপূর্ব অপচ্ছায়ার মতোই আতংকজনক অথচ নাগালের বাইরেই থেকে যাবো।

যে চিঠি আমি 'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদককে লিখেছিলাম, কিন্তু যা' প্রকাশ করবার মতো সৎ-সাহস pseudo সমালোচক শ.চি.স.র হয়নি, তা'র কিছুটা নীচে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম :

······প্রথমতঃ আপনি আসল এবং নকল কথা দু'টি তারাশঙ্কর নামের পূর্বে ব্যবহার ক'রে আপনার পাঠকদের আপনাদেরই স্বভাব-সুলভ যে রংগ-রস বিতরণ করেছেন, তা'র যৌক্তিকতা নিতান্তই ভিত্তিহীন। আমার স্বর্গত পিতামাতা (ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য গুণে তাঁরাও বীরভূমেরই অধিবাসী) যখন আমার নামকরণ করেন, শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর (আপনাদের কথায় আসল) তখন সাহিত্যে জন্মগ্রহণও করেন নি।............... সুতরাং আসল নকল-এর অবতারণা এ ক্ষেত্রে শোভন হ'য়েছে কিনা এ কথা বুদ্ধিজীবী শ. চি. সঃ-রই বিচার্য। তারপর আমার দ্বিতীয় উপন্যাসখানির নামকরণ নিয়ে শনি-মণ্ডল আবার বেশ গোল পাকিয়ে তুলেছেন। অনেক মাথা ঘামিয়ে 'অমানিতা মানবী' কথাটির অর্থ বা'র করতে না পেরে তাঁরা অবশেষে ব্যাপারটি ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভগবানের হাতে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে, সাহিত্যিক দাম্ভিকতা পরিহার ক'রে গাবেষণিক শ. চি. সঃ একবার বাংলা ভাষাতত্ত্বের কর্ণধারগণের দ্বারস্থ হ'লে কি বিশেষ ক্ষতি হ'তো?...............কিন্তু তিনি (শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর) অনুগ্রহ ক'রে প্রবর্তকের ঠিকানায় একখানি কার্ড ফেলে দিলেই হয়তো এই ব্যাপারটির মীমাংসা হ'তে পারতো। অবশ্য সে ক্ষেত্রে তাঁর এবং 'শনিবারের চিঠি'র উপরি-প্রচারের পথ আংশিকভাবে নষ্ট হ'তো এবং সুপণ্ডিত শ. চি. সঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে Demi Hitler-এর নজির দেখিয়ে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেয়ার সুযোগ পেতেন না।

অবশেষে এ কথা আমার বক্তব্য যে, তারাশঙ্করবাবু সুসাহিত্যিক হিসাবে আমারও শ্রদ্ধার্হ। প্রতারণা ক'রে তাঁর যশের ভাগীদার হওয়ার ইচ্ছা অথবা শিক্ষা কোনোটাই আমার নেই।...............

একদা বঙ্কিমচন্দ্র জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনায় উত্তপ্ত হ'য়ে বলেছিলেন : এ তো সমালোচনা নয়; রীতিমত malicious আক্রমণ। 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণকেও কি এই malicious পর্যায়ে ফেলা যায় না?

এই পত্রখানিকে আপনার পত্রিকায় ছাপলে বাধিত হ'ব।—ইতি

(স্বাক্ষর)

১৭ই ফাল্গুন ১৩৫০

পরিশেষে আন্তরিক দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, আমার কাহিনী আরম্ভের মুখে পাঠক-সাধারণের কাছে এই অপ্রীতিকর প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি ব'লে বিশেষ ভাবে লজ্জিত বোধ করছি।] এই আলোচনায় না নাম্‌লে হয়তো প্রতিপক্ষের কাছে আরো দুর্জ্জেয়ই হ'য়ে উঠতাম। আমার প্রতিপক্ষ 'লাভপুর' 'বীরভূম' 'শ্রীহীনতা' ইত্যাদির ট্রেডমার্ক ধারণ ক'রেছেন। নিজের অকৃত্রিমতার পরিচয় দিয়ে সে-সবের প্রচারও ক'রেছেন বিভিন্ন আংগিকে, তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় 'শনিবারের চিঠি'তে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনে। প্রয়োজন বোধ করলে তিনি লোক্যাল ট্রেইনে বিক্রীত ওষুধের রেজিষ্টার্ড নম্বরের মতো একটা রেজিষ্টার্ড নম্বরও করিয়ে নিয়ে নূতনতর ভংগীতে তা'র প্রচার করুন। পাঠক-পাঠিকারা না হয় তাই দেখেই বই কিনবেন। আমি তাঁর কোনো ট্রেডমার্কের ধার দিয়েই যাইনি; কোনোদিন তাঁর নবতর ট্রেডমার্ক অথবা রেজিষ্টার্ড নম্বরের ছায়া দিয়েও হাঁটবো না—এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। লাভপুর, বীরভূমের অকৃত্রিম শ্রীহীন তারাশঙ্কর আশ্বস্ত হ'তে পারেন।

৬, পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
ফোন: বি. বি.-১৭৬০

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম পূজনীয় মাতুল
শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়
-কে

প্রান্তিক

মহানগরীর কোলাহল তিনশো মাইল দূরে এই গ্রাম। শহরের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়। তাম্রাভ সহরের যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকের মতো মন্থর পদধ্বনি এখানের নিরীহ শান্ত লোক-গুলির বুকের মধ্যে স্পন্দিত হ'তে থাকে। ট্রেইন, রেডিও আর খবরের কাগজ সময় ও দূরত্বের ব্যবধানকে সহজ ক'রে আনলেও মানসিক ব্যবধান ওদের তেমনি অটল। দূর সহর-বাসীর বিচিত্র জীবন-যাত্রা এদের মনে বিস্তার করে গভীর এক রহস্য, অননুভূত এক বিস্ময়।

বাড়ী রাস্তার ধারেই। টিনের ছাউনি; একখানা ইটের দেয়াল; সিমেন্টের মেঝে। মাঝখানে খানিকটা কাঁচা উঠোন; অপর পাশে কল ও চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার দেয়াল ঘেঁসে উঠেছে একটা কামরাঙা গাছ। ভোরবেলা মহামায়া আঙিনা পরিষ্কার করছিলেন। দিবসের প্রারম্ভিক লোহিতাভা সবেমাত্র স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিলো। পায়ের কাছে ছোট্ট সবুজ চারাগাছটা হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মাত্র কয়েকটি সবুজ পাতার সমন্বয়। মহামায়া নীচু হ'য়ে স্পর্শ করলেন চারাগাছটাকে। ঊর্ধ্বমুখী প্রাণ-শক্তি ওর নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে বাইরের আলো আর বাতাসের কাছে। মহামায়া নিজের সমস্ত স্নায়ুতে, বিন্দুতম রক্তে অনুভব করলেন ঐ সবুজ পাতার মর্মরিত স্পন্দন। চারিপাশের জঞ্জালগুলো পরিষ্কার ক'রে তিনি চারাগাছটাকে সেদিন প্রাণ দিয়েছিলেন। এ কাহিনী অনেক দিনের। সেদিনের সেই চারা গাছ রূপায়িত হ'য়েছে বৃক্ষে। কিন্তু মহামায়া আজ নেই। কামরাঙা গাছের এ অখ্যাত ইতিহাস কেউ জানে নি। আর জানলেও কারো মনে থাকবার কথা নয়।

বাড়ীর চারিদিকে উঁচু বাঁশের বেড়া বহির্জগৎ থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে এদের শান্ত জীবন-বিবর্তন। একপাশে রান্না আর একদিকে শোবার ঘর। উঠোনের দিকে এক ফালি বারান্দায় রাজশেখর-বাবু মাত্বর বিছয়ে সমস্ত সকালটা গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে ব'সে থাকেন। আশে পাশে প'ড়ে থাকে অগোছালো কয়েকখানা ত্বদিন আগেকার খবরের কাগজের পাতা।

সূর্য প্রখর হ'য়ে উঠছে। ঠিক সকাল অতীত হ'য়ে গেছে। গড়গড়ার কল্‌কেতে তামাক কখন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে সেদিকে রাজশেখরবাবুর লক্ষ্য নেই। অনিমেষ দৃষ্টি তাঁর ওই কামরাঙা গাছটার ওপর প্রসারিত।

— বাবা, তোমার তামাক পুড়ে যায় নি ? বইএর পাতা থেকে মুখ তুলে তপতী জিগ্‌গেস করলে।

রাজশেখর-বাবু যেন চম্‌কে উঠলেন। বয়েস পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যেই। তবু তাঁর কপালে বার্ধক্যের অসংখ্য সর্পিল রেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। মাথার মাঝখান-টাতে নেই একটিও চুল। মেরুদণ্ডও রীতিমতো নমিত।

—পুড়ে গেছে ? তপতীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : গেছে বোধহয়। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো। একটু ব্যস্ততার সংগেই এবার বললেন : আত্রেয়ীকে ব'লে আয় না মা, আর একবার সেজে দিক। অফিসেরো সময় হ'য়ে গেলো বোধ হয়। আচ্ছা, আত্রেয়ী অতো কী রাঁধছে বল দেখি ? কী দরকার অতো হাংগামা করবার ? ওটাকে তো ইচ্ছে করলেই সংক্ষেপ ক'রে নেয়া চলে। হ্যাঁ, যা মা, কল্‌কেটা ওকে দিয়ে আয়।

তপতী কল্‌কেটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলো। চক্‌চকে কালো চুলের দীর্ঘ বেণী চোদ্দ বছর বয়েসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দুলে উঠলো।

—দিদি ! তপতী থমকে দাঁড়ালো। আগুনের আঁচে আত্রেয়ীর সারা মুখটা রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে। ঘর্মাক্ত মুখখানা একবার আঁচল দিয়ে মুছে নেয়ার মতো অবসরও ওর হয় নি। আঁলটা কোমরে জড়ানো ; কোলের কাছের কাপড়ে মসলার দাগ ; জড়ানো চুলের রাশি আপনার ভারেই কাঁধের ওপর এসে ভেঙে পড়েছে। আত্রেয়ী নিবিষ্ট মনে কী একটা তরকারী নাড়ছিলো।

—এই দিদি ! তপতী আবার ডাকলে। আগুন দাও। কল্‌কেটা এগিয়ে দিয়ে বললেঃ বাবা চাইছেন।

—আবার তামাক কেন ? ঘড়িটা একবার দেখ। শেষে তো খাবার সময় পাবেন না। কল্‌কেতে আগুন রেখে আত্রেয়ী বললেঃ বাবাকে চান করতে বলগে যা। তুইও সেরে নে। লক্ষ্মণ গেলো কোথায় ? ওকে বল বাবার জায়গা করতে।

তপতী বেরিয়ে এলো। রান্নার সমস্ত কাজ শেষ করতে আত্রেয়ীর আর মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।

সাড়ে ন'টা বাজে। অবসর নেই কারও। রাজশেখর-বাবু খেতে বসেছেন। তপতী সবেমাত্র বাবার অফিস যাওয়ার জোগাড় আর কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে নিজের সজ্জা সেরে নিচ্ছে। আত্রেয়ী স্নান করতে ব্যস্ত। স্নান মানে গায়ে কয়েক বালতি জল ঢেলে নেয়া। এই ওর স্নানপর্ব। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই একই রকমের স্নান। কোনো রকমে কিছু জল গায়ে ঢালা ; অতি সংক্ষেপে ভিজে কাপড়টা বদলানো ; তারপর ভিজে চুলটা যেমন তেমন ক'রে জড়িয়ে নিতে নিতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে আসা। এর মধ্যে নেই কোনো বিলাস ; নেই অণুমাত্র মানসিক প্রসার। আত্রেয়ীর জীবন এমনিই। শ্রান্তি নেই, বিশ্রামও নেই। নেই আত্মপরিচর্যা, কিম্বা আত্ম-বিশ্লেষণ। সংসারের ধোঁয়ার গভীরতার তলায় ও অবলুপ্ত

হ'য়ে গেছে। সংসারের দাবীর কাছে ওর স্বতন্ত্র কোনো চেতনা নেই ; নেই প্রকারান্তরের পরিচিতি।

আজো আত্রেয়ী ছুটেই কলতলা ত্যাগ করলো।

—এই যে এসেছি, বাবা। কই তুমি তো ডাকোনি আমায়? আমার কি দেরী হ'য়ে গেছে? হ্যাঁ, ভাত আনছি। ওরে ছোটদি, পাখাটা ছুটে নিয়ে আয় তো।

ভাতের থালা নিয়ে এলো আত্রেয়ী ; রোজ যেমন আনে। রাজশেখরবাবুও প্রত্যহের মতোই অনুযোগ করলেন : কে তোকে বলে এতো রাঁধতে? এতোগুলো ক'রে তরকারী···না, এ ভালো নয়, আত্রেয়ী। তোর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। এতো খাটুনি কখনো সহ্য হয়? একটা ভাত আর একটা তরকারী। ব্যস; এই তো যথেষ্ট। আমার ভালোও লাগে না এতো সব খেতে। কোনোটাই যেন মন ভ'রে খাওয়া যায় না। তাছাড়া লক্ষ্মণও তো বেশ রাঁধে। ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই তো হয়।

—কই বাবা, আজ তরকারী কেমন হ'য়েছে বললে না তো? প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী : নিশ্চয়ই ভালো হয়নি।

—কেন? খুব ভালো হ'য়েছে। বাটি থেকে খানিকটা তরকারী তুলে নিয়ে রাজশেখর-বাবু বললেন : কিন্তু সমস্ত সকালটাই যে তোর নষ্ট হয়। পড়াশোনা করবার সময় মোটেও পাস না।

—কেন? রাত্রে? আর চারটি ভাত দিই, বাবা?

—না ; আর চাই না।

আত্রেয়ীর পড়াশোনার সমস্যাটা সাময়িকভাবে চাপা পড়লো। সাংসারিক কোনো কথা উঠলেই আত্রেয়ী তখনই অদ্ভুতভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বাবাকে সমস্ত দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার গ্লানি থেকে সন্তর্পণে আড়াল ক'রে

রাখতে চায়। দুঃখের বোঝাটাকে অম্লান বদনে টেনে নেয় নিজের ঘাড়ে। সংসারের কোনো সমস্যা নিয়েই ও রাজশেখর-বাবুকে মাথা ঘামাতে দেয় না। দুঃখ ও অনটনের সমস্ত ইতিহাসটাকেই ও বাবার অনুভূতির বাইরে গোপন রাখে। মাসের প্রথমেই মাইনেটা তিনি তুলে দেন আত্রেয়ীর হাতে; তারপর আত্রেয়ী ঠিক চালিয়ে নেয়। ওদের দাদা সুহৃদকে পাঠাতে হয় প্রতিমাসে কুড়ি টাকা। ভুল হবার উপায় নেই। টাকাটা হাতে পেয়েই আগে আত্রেয়ী লক্ষ্মণকে পোস্টঅফিসে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু চলে না; রাজশেখর-বাবু যা মাইনে পান তা'তে তাঁর সংসার চলতেই পারে না যদি না আত্রেয়ী যাদুবিদ্যা জানে। রাত জেগে স্কুলের পড়া তৈরী ক'রে তাকে হ'তে হ'য়েছে ভালো ছাত্রী; পরীক্ষায় প্রথম। পেতে হ'য়েছে বৃত্তি। গোড়ায় ভালো মেয়েদের সে রীতিমতো সমীহ ক'রে চলতো। আর ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতে চাইতো স্থূলাকার বইগুলোকে। এখন কিন্তু ভালো মেয়ে কিম্বা বৃহদাকার বই কোনোটাতেই ওর কী শরীর কী মন কুঁক্‌ড়ে আসে না। সহপাঠিনীরাও কেউই ওকে ভালো না বেসে পারে নি। তাদের কাছে আত্রেয়ীর সংগ ছিলো এক পরম রমণীয় বস্তু। ও-ই তাদেরকে সর্বপ্রথম সাঁতার কাটতে শেখায় স্কুল-কম্পাউণ্ডের পুকুরে। আর এই গেলো বারেও স্কুলের খেলাধূলায় সর্বশ্রেষ্ঠের সম্মান ও-ই লাভ করেছিলো।

কিন্তু সংসারে বেঁচে থাকতে হ'লে, দুঃখ এবং দারিদ্র্যের হিংস্র থাবা থেকে নিজেকে এবং প্রিয়জনদের রক্ষা করতে হ'লে আরো কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন—এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতেও আত্রেয়ীর বেশী সময় লাগে নি। ও জানে যে ও নিজেই একমাত্র লোক রাজশেখর-বাবুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যা'র একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের ছুটির পর সে

যে এক বাড়ীতে রোজ এক ঘণ্টা পড়িয়ে আসে—এ সংবাদটা ইচ্ছে ক'রেই ও বাবার কাছে গোপন রেখেছে। কিছু ভাব্‌বার সময় নেই ওর মুহূর্তমাত্র। রাত্রে ও স্বপ্ন দেখে না কোনোদিন। যুদ্ধক্ষেত্রে গতিই জীবন; আর নিশ্চলতা মানে মৃত্যু।

রাজশেখর-বাবু খাওয়া সেরে উঠলেন। বুঝি বা দেরীই হ'য়ে গেলো। ক্ষিপ্রতর হ'য়ে যাওয়ার আয়োজন সেরে নিয়ে ডাক দিলেন: লক্ষ্মণ!

তপতী পানের কৌটা এনে দিলে। পকেটে রাখতে রাখতে তিনি সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন। লক্ষ্মণ সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর উদ্দেশে রাজশেখর-বাবু বললেন: স্কুলে দিয়ে আসবি ওদের। আর দুপুরে বাড়ী ছেড়ে যাসনি কোথাও।

তিনি চ'লে গেলেন। যাওয়ার আগে কিন্তু প্রত্যহই তাঁর ও দু'টো কথা বলা চাই।

আত্রেয়ী বললে: লক্ষ্মণ, আর দুটো জায়গা ক'রে দাও আমার আর ছোটদির। আমি একেবারে কাপড় ছেড়ে আসছি।

রান্নাঘরের ছোটো-খাটো কাজগুলো লক্ষ্মণ সেরে ফেললো। এ সংসারে ও অনেক দিনের লোক। বছর ত্রিশ কী বত্রিশ বয়েস। রুক্ষ, কঠিন চেহারা। সমস্ত মুখে একটা গভীর উদাসীনতা। কথা বলে কম; কাজ করে অজস্র। ওর কর্তব্য কখনো ওকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। কোনো কাজও ওর প'ড়ে থাকে না। এ সংসারে নিজের দায়িত্বের সীমা ও সূক্ষ্মভাবেই অনুভব করে। এদের দুঃখে ওর মুখে আরো কঠিন অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। এদের সুখে ওর দৃষ্টিতে যে হাসির রেখা ফুটে ওঠে তা' লক্ষ্য করবার মতো আর কেউ নেই এ পরিবারে।

তপতী খেতে ব'সে গেছে। আত্রেয়ীও ভাতের থালা নিয়ে এসে বসলো। একটু জোরেই বললে : তোমার ভাত বাড়া রইলো, লক্ষ্মণ ; নিয়ে খেয়ো।

ভাত বাড়াই থাকে। লক্ষ্মণের কোনো অসুবিধে হয় না। লক্ষ্মণ জবাব দিলে : আচ্ছা, বড়দি।

লক্ষ্মণ মাত্র দশ বছর আগেও আত্রেয়ীকে ভূতের ভয় দেখিয়েছে ; শাসনও করেছে। এখন ওকে ডাকে বড়দি ব'লেই।

খাওয়া ওদের এতো তাড়াতাড়ি সারতে হয় যে কথা বলবার অবসর থাকে না।

—তোমার জামাটা সেলাই ক'রে রেখেছি। তপতী বললে।

সংক্ষেপে উত্তর দিলে আত্রেয়ী : বেশ।

—এরপর আর ওটা ব্যবহার করা চলবে না ; গা দেখা যাবে।

স্কুলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত দু' বোনেই।

—কই ? জুতো পায়ে দিলি না ? আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে।

—না, দেবো না। তপতী জবাব দিলো।

—কেন ?

—তুমিও তো দাও না।

—আমারটা যে ছিঁড়ে গেছে। সামনের মাসে এক জোড়া কিনে নেবো। কিন্তু তা ব'লে তুই পায়ে দিবি না কেন ?

—এক সংগেই পায়ে দেবো। আমারটাও ছিঁড়ে গেছে। কই তুমি তো বাবাকে বলোনি তোমার জুতো ছিঁড়ে গেছে ?

—বলবো আবার কি ? সব কথাই কি বাবাকে বলতে হয় ?

তপতী জবাব দিলো না। সংসারের অবস্থার কথা সবই

সে বুঝতে পারে। দিদি যে বাবাকে লুকিয়ে মাষ্টারী করে তপতীও সে কথা কোনোদিন বাবার সামনে উত্থাপন করে নি।

খালি পায়ে প্রথম দিন রাস্তায় বেরুতে তপতী রীতিমতো ঘেমে উঠেছিলো। লজ্জায় ও মুখ তুলে তাকাতে পারে নি কারুর দিকে। আত্রেয়ী কিন্তু বুঝতে পারে যে ওর নগ্ন পায়ের দিকে কারুর দৃষ্টি দেয়ার সময় নেই। তা' ছাড়া অনেক মেয়েই স্কুলে খালি পায়ে আসে। সবাই কিছু রাজার মেয়ে নয়। আর মহানগরীর রীতিনীতির সংগে এখানের ব্যবধান তিনশো মাইল। বরং খালি পা-ই ওর স'য়ে গেছে। নতুন জুতোর শব্দ তুলে রাস্তা চলতেই যেন লজ্জা করতে পারে।

স্কুলের ছুটীর পর আত্রেয়ী গেলো পড়াতে। তপতী বাড়ী ফিরলো। ওর এখন অনেক কাজ। দিদির ফেরবার আগে জলখাবারের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলা চাই। ভাতটা চড়িয়ে দিতে পারলে কাজ অনেক এগিয়ে থাকে। তরকারীটাও কোটা শেষ করতে হবে। বেচারী দিদিকে সে এবেলা আর কোনো কাজ করতে দিতে চায় না। তপতী বাড়ী ফিরে সমস্ত পরিবেশটাকে স্পন্দিত ক'রে তোলে। মুখর হ'য়ে ওঠে গৃহের প্রতিটি বায়ু-স্তর। তপতী কথা বলে অজস্র; হাসে প্রচুর; গান করে উচ্চকণ্ঠে; কাজ করে সশব্দে। বাড়ীর কাউকে গম্ভীর হ'য়ে থাকতে দেয় না। লক্ষ্মণের সংগে ও গল্প করে; আত্রেয়ীকে হাসায়। ওর এক ঝাপটা হাসির তরংগ বাড়ীর সমস্ত গুমোট ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আত্রেয়ী গেলো পড়াতে। স্কুল থেকে ফেরার পথে এক ডেপুটীর মেয়ে তা'র ছাত্রী। ছোটো মেয়ে। নীচু ক্লাসে পড়ে। নাম হাসি। দোতলা বাড়ীর ওপরের একটা ঘরে ব'সে আত্রেয়ী হাসিকে পড়িয়ে যায়।

যথারীতি পড়ানো শেষ হ'লো। বাড়ীর কর্ত্রী আত্রেয়ীর জন্যে রোজ জলখাবার পাঠিয়ে দেন। আজো তা'র ব্যতিক্রম হ'লো না। প্রথম দিন আত্রেয়ী ভালোভাবেই আপত্তি জানিয়েছিলো।

—না, আমার ক্ষিদে পায় নি। ও বলেছিলো।

চারুপ্রভা জবাব দিয়েছিলেন : অসম্ভব। নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছো।

—হাতমুখ না ধুয়ে আমি খাই না। নিজের আপত্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো আত্রেয়ী। কেন খাবে ও পরের বাড়ীতে ?

—এখানে জলের অভাব নেই। হাতমুখ ধুয়ে নাও।

চারুপ্রভা সেদিন নিষ্কৃতি দেন নি। আত্রেয়ীকে খেতে হ'য়েছিলো।

অধ্যাপনা শেষ ক'রে আত্রেয়ী বাড়ী ফিরছে। পেছন থেকে ছুটে এসে হাসি ওর হাতে একটা বন্ধ খাম দিয়ে বললে : আপনার।

—কি ? বিস্মিত প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী।

হাসি উত্তর দিলো না। খাম খুলে আত্রেয়ী দেখলে দু' খানা দশ টাকার নোট। ও জিগ্‌গেস করলো : কে দিলে ?

—দাদা।

—কোথায় তোমার দাদা ? বাড়ী আছেন ?

—আছেন।

—ডেকে নিয়ে এসো। আত্রেয়ী আদেশ করলে।

হাসির দাদা এলো। বাড়ীর বড়ো ছেলে। নাম অজিত।

—কুড়ি টাকা কেন ? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

অজিত খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে নিজেকে। এ পরিস্থিতিটা অপ্রত্যাশিত। আত্রেয়ী চার মাস আগে প্রথম

যখন পড়াতে আসে, অজিত তখন প্রায়ই আসতো সামনা সামনি। কথা বলতো হাসির পড়া সম্বন্ধে: আরো বলতো অনেক বাজে কথা, যে কথার সংগে আত্রেয়ীর কোন সম্বন্ধ নেই।

—সমস্ত দিন স্কুলে লেখা-পড়া ক'রে আসো; তোমার কষ্ট হয়। অজিত বলেছিলো একদিন।

—বিশ্রামের আমার দরকার হয় না। পরিশ্রম করা অভ্যেস আছে। রুক্ষ উত্তর দিয়েছিলো আত্রেয়ী।

ক্ষণিক নীরবতা। হাসি একটা ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করছিলো। আত্রেয়ী স্থির করছিলো পরদিনের পড়া।

দশ টাকা মাইনে তোমার বড্ড কম হ'য়েছে। অজিত বলেছিলো: বাবাকে ব'লে কিছু বাড়িয়ে দেবো।

—দরকার নেই। বইএর পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতেই নিস্পৃহ উত্তর দিয়েছিলো আত্রেয়ী: এক ঘণ্টার জন্যে দশটাকা খুব কম নয় তো?

—অন্য পুরুষ মাস্টার রাখলে তো অনেক বেশী দিতে হ'তো। আত্রেয়ীর জন্যে আত্রেয়ীরই বিপক্ষে ওকালতি করলে অজিত।

—তাঁরা হয়তো আমার চেয়ে অনেক ভালো পড়াতেন। নিজেকে সমর্থন করলে আত্রেয়ী।

—তুমিও তো চমৎকার পড়াও।

আত্রেয়ী চট্ ক'রে ভেবে পেলো না এর আর কী উত্তর দেওয়া যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে খাপছাড়া ভাবে বললে: আপনাদের পছন্দ হ'লেই হ'লো

আরো একদিনের কথা:

পড়ানো শেষ ক'রে আত্রেয়ী উঠবে ভাবছিলো। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো অজিত। বললে: অনেকখন

পড়িয়েছো। এখন বেড়াতে খুব ভালো লাগবে। চলো, খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক।

—কোথায়? বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলো আত্রেয়ী।

—পাহাড়ের ওদিকে। অজিত বলেছিলো।

উত্তর দিতে আত্রেয়ীর বিলম্ব হয় নি।

—লোকে ভালো বলবে না। সে বলেছিলো: অকারণে বদনামকে আমন্ত্রণ জানানোটা বোকামি। বদনাম যে হ'বে এ আপনি আমার চাইতেও ভালো বোঝেন। তখন পাঁচ জনের সমালোচনায় আপনিও ইন্ধন জোগাবেন। বন্ধুদের কাছে প্রচার করবেন আমার রঙীন কুৎসা; বিনিময়ে কিনবেন নিজের বাহাদুরী।

—আমাকে তুমি এমন ভাবো? একটা নিঃশ্বাস ফেলেই অজিত বলেছিলো।

—সবাই ভাববে। এইটাই স্বাভাবিক।

আরো কয়েকদিন পরে:

আত্রেয়ী আসার সংগে সংগেই হাসি ওকে একখানা চিঠি দিয়েছিলো।

—কে দিলে?

—দাদা।

খাম খুলে কয়েকটা লাইন প'ড়েই চিঠিটা মুড়ে পাশে রেখে দিলে আত্রেয়ী। এখন ও হাসিকে পড়ানোতে মন দিলে।

যাবার সময় অজিত পাশে এসে দাঁড়ালো। ওর প্রতি ধারালো দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আত্রেয়ী বললে: নিন আপনার চিঠি। আর কখনো লিখবেন না আমায়।

—কেন? অজিত খাঁটি বেকুবের মতো প্রশ্ন ক'রে বসলো। তা'র বি. এ. ক্লাসে পড়া মনস্তত্ত্বের বিদ্যেয় এ পরিণামের কথা লেখা নেই। ব্যাপারটা ওকে রীতিমতো জটিল ঠেকছে।

—কেন আবার কি? আত্রেয়ী শান্ত কণ্ঠেই বলেছিলোঃ মনের বিকার আর সময়ের অপচয় কোনোটাতেই মানুষ লাভবান হয় না।

বোকামির ভাবটা এতোক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে অজিত। বললেঃ ঠিক বুঝলাম না।

—না বোঝবার মতো নাবালক আপনি নন। হয় আপনাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করতে হবে; নয় আমাকে এ বাড়ী আসা বন্ধ করতে হবে। ভেবে দেখবেন কোনটা বাঞ্ছনীয়।

এবার অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতে চাইলে অজিত। বললেঃ জানো, আমি তোমার ভীষণ বদনাম রটাতে পারি। অজিত ক্রমশঃ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠছে। ও ব'লে চললোঃ এমন দুর্নাম যা'তে সমস্ত সহর তোমাকে নিয়ে আলোচনা করবে। রাস্তায় যাবার সময় লোকে দেখিয়ে দেবে আঙুল দিয়ে।

—জানি। কিন্তু তাতে আপনার লাভ? অবিচলিত প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী।

—তোমার লোকসানই আমার লাভ? তোমার ভালো-মন্দ, সুনাম-দুর্নামের সংগে আমার সম্বন্ধ কি?

—কিছুই না। কিন্তু তা'তে আমি এক চুলও নামবো না। অথচ আপনি ক-তো নীচে নেমে যাবেন একবার ভেবে দেখেছেন?

—তোমার কাছে আমার নীচে নামা কী ওপরে ওঠার মূল্য কতোটুকু?

নিরীহা আত্রেয়া এরপর নীরব ছিলো। কোনো উত্তর না পেয়ে অজিত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গিয়েছিলো।

মানুষের আকাংক্ষার শেষ নেই।

পড়াতে পড়াতে একদিন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিলো। হাসি উঠে গেলো। আত্রেয়ী নিজের বইগুলো বুকের কাছে

আঁকড়ে ধ'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছিলো। কোথা থেকে এসে অজিত দাঁড়ালে একেবারে দরজার সামনে। বললে: দাঁড়াও, একটু দরকার আছে তোমার সংগে।

অজিতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো জায়গা ছিলো না। আত্রেয়ীকে দাঁড়াতে হ'লো। সে বললে: কিন্তু আমার সময় নেই।

—তবু তোমাকে দাঁড়াতেই হ'বে; শুনতে হবে আমার কথা।

অজিত শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো।

—বেশ বলুন।

আত্রেয়ীর সমস্ত ভংগী কঠিন হ'য়ে উঠলো। তাই ওকে আজ অজিতের মনে হ'লো ভয়ানক সুন্দর। প্রায় শ্যামবর্ণ তা'র দেহে অপরূপ এক লাবণ্য এবং সুষমায় অজিত স্তম্ভিত হ'য়ে উঠলো। সপ্তদশী কিশোরীর দেহের সুস্পষ্ট বাহুরেখায় অজিতের কামনা উঠলো লেলিহান হ'য়ে। জর্জরিত অজিত বললে: তোমায় আমি ভালোবাসি, আত্রেয়ী!

—আশা করছিলাম। অদ্ভুত মনে হ'লো আত্রেয়ীর উত্তর।

—তুমি জানতে? আশান্বিত অজিত জিগ্‌গেস করলো।

—কি?

—আমি তোমায় ভালোবাসি?

—জানতাম, এ-কথা একদিন আমায় শুনতে হ'বে! শান্ত কণ্ঠে আত্রেয়ী বললে: তা'র আগেই অবশ্য এ-বাড়ী আমি ছাড়তে পারতাম। কিন্তু পারলাম না কেবল আমার টাকার দরকার ব'লে। আপনার কুৎসিত দৃষ্টি আমায় কাতর করেছে। আপনার লজ্জাহীন লোলুপতা আমাকে করেছে বার-বার অপমান। তবু টাকা ··· টাকার প্রয়োজন ছিলো আমার।

হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত আবেগে আত্রেয়ীর কণ্ঠরোধ হ'য়ে এলো।

অজিত তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। বললে: টাকা তোমার যতো প্রয়োজন আমি দেবো, আত্রেয়ী। কোনো অভাব তোমার থাকবে না।

হঠাৎ আত্রেয়ী অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো: যান, যান আপনি আমার সমুখ থেকে। শিগ্‌গির চ'লে যান বলছি।

এ চীৎকার শুনে অজিত একেবারে ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে গেলো। শান্ত হ'লো তার রক্তস্রোত। নির্জীবের মতো সেদিন সে বলেছিলো: তুমি এসো, আত্রেয়ী; পড়িয়ো; যেমন রোজ আসো। আমি আর কোনোদিন তোমায় বিরক্ত করবো না।

অপমানিত অজিত শান্ত পায়ে সেখান থেকে স'রে গিয়েছিলো।

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসছে। আত্রেয়ী কয়েক মিনিট নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়েছিলো। অকস্মাৎ ওর মনে হ'লো, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। বাবা বাড়ী এসে পড়বার আগেই ওকে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। আত্রেয়ী ক্ষিপ্রপদে পথে এসে নামলো।

এ ঘটনা মাত্র কিছুদিন আগেকার।

আজ আত্রেয়ী অকম্প্র স্বরে প্রশ্ন করলে: কুড়ি টাকা কেন?

—আমি দিইনি; বাবা দিয়েছেন। সামনেই পরীক্ষা; খাটুনিটা তোমার আজকাল কিছু বেশী হ'চ্ছে—মাত্র এই কথাটুকু আমি পেড়েছিলাম।

অভাবিতভাবে হাসি প্রতিবাদ ক'রে উঠলো: মিথ্যে কথা।

অজিত এগিয়ে এলো। বোনের গালে ঠাস্‌ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললে: তুই কথা বলিস কোন সাহসে?

হাসি সরবে কেঁদে ফেললো।

আত্রেয়ী তুলে নিলে ওর নিজের বইগুলো। খাম থেকে বা'র ক'রে নিলে একখানা দশ টাকার নোট। সেটাকে হাতের মধ্যে ভাঁজ ক'রে নিতে নিতে নীরবে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলো।

দুই

ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে আত্রেয়ীর চাকরীর ঐখানেই হ'লো অবসান। আর যায়নি ও তারপরে। ডেপুটী-গিন্নি ওকে চিঠি দিয়েছিলেন ; লোকও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মনস্থির করতে আত্রেয়ীর বেশী সময় লাগে নি।

—পড়ানো ছেড়ে দিলাম। তপতীকে বললে আত্রেয়ী।

—বেশ করেছো। আমি তো কতোদিন তোমায় বলেছি।

—কিন্তু…টাকা আসে কোথা থেকে ? একটা নিঃশ্বাস ফেললে আত্রেয়ী।

—তা' হোক। দাদার পরীক্ষা তো হ'য়ে গেছে। দাদা আসছে বাড়ী। একটা দশ টাকার মাষ্টারী দাদাই জুটিয়ে নিতে পারবে। তাছাড়া দাদা দিতো কিনা তোমায় মাষ্টারী করতে ?

সন্ধ্যের পর অফিস থেকে এসে রাজশেখর-বাবু বললেন : সুহৃদ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসছে। পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে লিখেছে। খুব সম্ভব পাশ করবে। আজই চিঠি এলো।

বোনেদের মন খুশীতে উথ্‌লে উঠলো। বেশ একটা ভরসা উপলব্ধি করলে ওরা। এতোদিন যেন সংসারে ওদের অবস্থিতি আলগা হয়েছিলো। এবারে ওরা দাঁড়াতে পারবে শক্ত হ'য়ে। মনে ওদের ফিরে এলো লুপ্ত সংহতি। আত্রেয়ী ভাবলে : সংসারে কঠিন দায়িত্বের হাত থেকে ও নিষ্কৃতি পাবে এবার। ও একটু নির্লিপ্ত থাকতে পারবে দুঃখ এবং অভাব থেকে। নিজেকে ও পাবে নিরালা, মুক্ত। শৃংখল ওর বুঝিবা একটু আলগা হ'লো।

—এবারে ও একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারবে।

রাত্রে আহারের পর রাজশেখরবাবু গড়গড়া টানতে টানতে বললেন: মানুষ করেছি ওকে; বড়ো করেছি। শত অভাব আর অভিযোগের মাঝেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছি। এবার ও সংসার চিনুক।

রাত্রি গভীর হ'য়ে আসছে। সুপুরিগাছের ওপর থেকে বাদুড়ের ডানার ঝাপ্‌টানি স্পষ্ট শোনা যায়। আকাশে উঠেছে অজস্র তারা। লক্ষ্মণ সমস্ত কাজ শেষ ক'রে শুতে গেছে। আত্রেয়ী বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রাজশেখরবাবু মৃদু কণ্ঠে ব'লে চলেছেন: শিগগির আমাদের অফিসেই একটা কাজ খালি হবে। ওখানেই দেবো ঢুকিয়ে। তারপর সুহৃদ সংসার করবে। বৌ আনবো একটি মনের মতন। স্ত্রী না থাকলে মানুষের জীবনে সংগতি আসে না; থাকে না একাগ্রতা। পুরুষ ছন্নছাড়া হ'য়ে যায়; দায়িত্বহীন জীবন কাটাতে সুরু করে। অভাব আছেই; দুঃখও আছে। তবু ওর মধ্যেই আনতে হয় একজনকে, যে ভালো-মন্দর অংশ নেবে। রাশিকৃত দুঃখের মাঝেও জীবনের মাধুর্য নষ্ট হয় না যদি জীবনে দুঃখের ভাগ নেয়ার কেউ থাকে।

রাজশেখরবাবু যেন ভুলেই গেছেন যে তিনি কথা বলছেন তাঁর কন্যাদের সংগে। তিনি অনর্গল ব'লে চলেছেন: যুদ্ধে যেমন প্রয়োজন হয় অস্ত্রের, জীবনে তেমনি প্রয়োজন হয় নারীর। সহযাত্রী থাকলে পথের দুর্গমতা অনেকটা সহনীয় ব'লে মনে হয়।

গড়গড়ায় ঘন ঘন টান দিতে থাকেন রাজশেখরবাবু। বাক্য থেকে তিনি চ'লে যান নির্বাক, শব্দহীন অতীতে; বহুপরিচিত এক আবেষ্টনীর মধ্যে। কথা তাঁর স্তব্ধ হ'য়ে যায়। অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকেন তিনি অন্ধকারের দিকে।

অসংখ্য ঝিঁঝিঁপোকা ডাকে। কামরাঙা গাছে অজস্র জোনাকি ঝক্‌ঝক্ করে।

গভীর নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রে আত্রেয়ী বললে : বাবা, রাত লো। চলো শুতে যাই।

—ইস্, তাই তো। হঠাৎ যেন ধ্যানভংগ হ'লো রাজশেখরবাবুর। তিনি ব্যস্ত হ'য়ে বললেন : চল্ মা। অনেক দেরী ক'রে দিলাম তোদের। আবার সকালেই উঠতে হবে।

রাজশেখরবাবু উঠলেন। তপতীর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো। ও সবচেয়ে এগিয়ে গেলো। বাবার বালিশ দুটো তুলে নিয়ে আত্রেয়ী সব পেছনে চললো।

এমনি ক'রেই ওদের রাত্রির সূচনা হয়; রাত্রি যায় অতিবাহিত হ'য়ে। প্রভাত আসে সমস্ত দিনের বৈচিত্র্যহীন কর্মতালিকা নিয়ে।

কিন্তু বৈচিত্র্য আছে। আত্রেয়ী স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিলো। তপতীর শরীর অসুস্থ ব'লে ও সেদিন স্কুলে যায় নি।

—শোনো।

পশ্চাৎ-আহ্বানে আত্রেয়ী ফিরে দাঁড়ালো। অজিত এগিয়ে আসছে ওর দিকে। আত্রেয়ী তা'র কোনো কথাতেই সাড়া না দিয়ে চ'লে যেতে পারতো। কিন্তু ও দাঁড়ালো। কেনই বা পালিয়ে যাবে ?

—কেমন আছো ? অজিত শুষ্ক কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে।

—কিন্তু এ কথা জিগ্‌গেস্ করতে তো আর পথ আগ্‌লে দাঁড়ান নি ? আত্রেয়ী শান্ত কণ্ঠে বললে : আসল বক্তব্যটা শেষ ক'রে ফেলুন না।

—বক্তব্য আর কী ? চলো, ওধারে খানিকটা বেড়িয়ে আসি। এই তো সবে চারটে কুড়ি।

আত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারলে না।

কয়েক মিনিট পরে বললে: আচ্ছা, আপনি কী ভেবেছেন বলুন তো?

অজিত ভেবেছিলো, চাকরী ছেড়ে দিয়ে ও নিশ্চয়ই অনুতপ্ত। কারণ ওরা যে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত আত্রেয়ীই সে কথা বলেছে। ভেবেছিলো, বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে পুনশ্চ নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসবে। নাই আসুক, ও যদি মাত্র আভাসে বা ইংগিতেও জানায় যে অজিতের কাছ থেকে টাকা নিতে ওর আপত্তি নেই তাহ'লেই অজিত যে কোনো মুহূর্তে ওকে টাকার যে কোনো সংখ্যা দিতে প্রস্তুত।

অজিত বললে: ধরো, তুমি আমার সংগে খানিকটা বেড়ালেই। এতে তোমার আপত্তির কারণ কি? তাছাড়া অতো ভালোমানষি তোমার বয়েসের মেয়েদের শোভাও পায় না।

উত্তর দিতে আত্রেয়ী ঘৃণা বোধ করলে; এমন-কি ওর দিকে তাকাতেও। চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়ালে ও। অজিত অকস্মাৎ আরো এগিয়ে এসে আত্রেয়ীর হাতখানা চেপে ধরলো। বললে: আজ তোমাকে যেতেই হ'বে আমার সংগে।

আত্রেয়ীর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। অনেক কষ্টে ও সামলে রাখলে অপমানের অশ্রু। হাত ছাড়িয়ে নেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রেই ও বললে: আপনি কি জোর ক'রে আমায় নিয়ে যেতে পারবেন এই দিনে দুপুরে? আকস্মিক আক্রমণের প্রভাব খানিকটা সামলিয়ে নিয়ে, ঠোঁটের বাম কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে আত্রেয়ী টেনে চললো: সে শক্তিও আপনার নেই। ঐ তো দু'জন ভদ্রলোক আসছেন। ওঁদের আমি বলতে পারি, রাস্তায় আপনি আমার অপমান করছেন। তখন কিন্তু আপনার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না।

অজিত অতো দূর পর্যন্ত ভেবে দেখে নি। চট্ ক'রে হাত

ছেড়ে দিয়ে ও বললে: বেশ, বেড়াতে না যাও চলো আমাদের বাড়ীতে। সেখানে তো আর তোমার কোনো ভয় নেই।

—ভয় আমার এখানেই বা আছে নাকি? আত্রেয়ী বললে: ভয়ের কথা আমি বলি নি। অদ্ভুত প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী: আচ্ছা অজিতবাবু, আপনি আমায় বিয়ে করবেন? আমাকে তো আপনার খুব পছন্দ! আ—র একদিন ব'লেওছিলেন, আমায় আপনি ভালোবাসেন।

অজিতের দৃষ্টিতে স্পষ্ট বোকামি ফুটে উঠেছে। ও নিষ্কম্প নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো।

—করুন না আমায় বিয়ে। অদ্ভুত একটু হেসে আত্রেয়ী যেন আবেদন জানালে: আমিও উদ্ধার হবো; তাছাড়া এমন চমৎকার মেয়ে আপনিও পাবেন না। হাসিতে আরো খানিকটা স্পন্টতা এনে আত্রেয়ী বললে: জোর ক'রে বলতে পারি এমন চমৎকার বৌ। করবেন বিয়ে? বলুন না আপনার মাকে।

নিজে যে কতোক্ষণ প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সে হিসেবে লজ্জিত হ'য়ে যেন অজিত জোর ক'রেই বললে: কী সব বলছো আত্রেয়ী?

—ভয়ানক সত্যি কথা। কেন? আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

আত্রেয়ীর কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস করবার মতো কিছু নেই। কিন্তু অজিতের কল্পনা-রাজিণ্যে এই শ্বেত পরিবেশ মোটেও স্থান পায় নি। অসহায় অজিত বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। আর আত্রেয়ী তার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে।

হঠাৎ আত্রেয়ী অজিতের গায়ে একটা ঠেলা মেরে বললে: যান, ভেবে দেখুন গিয়ে। বিয়েরও তো আপনার বয়েস হ'লো। তখন যত ইচ্ছে বেড়াবেন আমাকে সংগে নিয়ে।

এবার আত্রেয়ী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। সে হাসি ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠলো অজিতের বুকের মধ্যে। শরীরটা ওর যেন দুলছে; মাথার মধ্যে অননুভূত শূন্যতা। আত্রেয়ী মিলিয়ে গেলো ওর সামনে।

কিশোরীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, ইতিহাস লেখে না এমন কথা।

কিন্তু সময়ের স্রোত গড়িয়ে যেতে লাগলো এসব ঘটনার ওপর। মাটীর স্তর জমতে লাগলো তলায়। স্মৃতির পশ্চাৎ-পটে ঝাপ্সা হ'য়ে যেতে লাগলো এ সব তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাহিনী।

রাজশেখরবাবুর সংসারে সহসা একদিন সুসময় এলো, এলো আনন্দ। ওদের আকাশ ঝল্মল্ ক'রে উঠলো একদিন সকালে সূর্যের সোনালি আলোর আভায়। সুহৃদ আসবে। অনেকদিন সে বাড়ী আসে নি, টাকা খরচ হ'বে এবং পড়াশুনার ক্ষতি হবে ব'লে। আজ এক বছর পরে সুহৃদ বাড়ী আসছে। ওরা দু' বোনেই ষ্টেশনে গেলো দাদাকে নিয়ে আসতে। লক্ষ্মণ বাড়ী পরিষ্কার করছে। দেখতে দেখতে গোটা বাড়ীটাকে ও চক্চকে ক'রে তুললো। রাজশেখরবাবু উপদেশ দিচ্ছিলেন, বাজার থেকে কী কী আনতে হ'বে; সুহৃদ কী কী খেতে ভালোবাসে।

আত্রেয়ী ও তপতী যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলো তখন সবে সকাল হ'য়েছে। ট্রেইন এসে পৌঁছাবার তখনও কয়েক মিনিট দেরী আছে। ওরা প্ল্যাট্ফর্মে পায়চারী করতে লাগলো। মন ওদের আবেগে অসম্ভব চঞ্চল।

অবশেষে ট্রেইন এলো বিজয়ী বীরের মতো; গর্বিত এক সেনাপতির মতো। সুহৃদ গাড়ী থেকে নামলো। বয়েস প্রায় তেইশ; বলিষ্ঠ দেহ; সরল দৃষ্টি। প্ল্যাট্ফর্মে নেমেই

ও দুই বোনকে একসংগে বুকের মধ্যে টেনে আনলে। তপতী আবেগের চাপে প্রায় কেঁদে ফেলছিলো; অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিলে।

—কেমন আছিস? আত্রেয়ীর পানে তাকিয়ে সুহৃদ প্রশ্ন করলে: বাবা কেমন?

—ভালো, সব ভালো। তুমি কেমন আছো?

—ভালোই দেখছিস না? চল, বেরুনো যাক।

কুলির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে ওরা বাইরে এলো।

—একটা গাড়ী নেয়া যাক, কী বল? সুহৃদ বললে।

আত্রেয়ী বোধহয় বারণ করতে যাচ্ছিলো। কী হবে গাড়ী? এইটুকু রাস্তা হেঁটে গেলেই তো হয়। কিন্তু ও বললে: না, না।

গাড়ীতে ওদের ছোটোখাটো অনেক আলাপ হ'লো। লক্ষ্মণ কেমন আছে; রান্না কে করে; ওদের পড়াশোনা কি রকম হচ্ছে......ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ সুহৃদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্‌গেস করলে।

—পরীক্ষা ভালো দিয়েছো? আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে।

—পাশ করতে পারি। তোদের পড়া কেমন হচ্ছে?

—ভালো।

ক'লকাতার সমস্ত আকর্ষণ যেন সুহৃদের কাছে ম্লান হ'য়ে এলো। এই পরিবেশ এতো মধুর, এতো রমণীয়, এর আগে সুহৃদ কখনো অনুভব করেনি। এদের সংস্পর্শ ওর অন্তরে এতোখানি প্রশান্তি আনতে পারে, সুহৃদ কোনোদিন কল্পনাও করে নি। দু'ধারে ঘন গাছপালার মধ্যে উঁচু-নীচু পথ। ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছে মন্থর গতিতে। নেই সে উৎকট চাঞ্চল্য; নেই দুর্ণিবার স্পন্দন, অসহনীয় তীব্রতা। কোলাহল এখানে ক্লান্ত করে না নিজের সত্তাকে; চঞ্চল করে না চিত্ত, ব্যগ্র

করে নামল। সবই এখানে শান্ত, সবই স্থির। গাছের মাথায় কী মৌন প্রশান্তি; সকালের রোদে কেমন একটা নরম উষ্ণতা। সুহৃদ যেন অবাক হ'য়ে গেলো। মাথার ওপর এমন অবারিত আকাশ কতোদিন ওর চোখে পড়ে নি। যেন স্তম্ভিত হ'য়ে আসছে সুহৃদ।

গাড়ী থামলো বাড়ীর সামনে এসে।

রাজশেখরবাবু জিগ্‌গেস করলেন: কেমন আছো? সুহৃদের সর্বাংগে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন: শরীর তো ততো ভালো মনে হ'চ্ছে না।

—আজ্ঞে না; শরীর ভালোই আছে। সম্প্রতি পরীক্ষার খাটুনি গেলো তাই।

—বেশ কিছুদিন বিশ্রাম ক'রে শরীরটাকে সারিয়ে নাও। স্বাস্থ্যের চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই।

এর পর কয়েকটা দিন সুহৃদের কেটে গেলো অবকাশ আর নিরবচ্ছিন্ন অবসরের মধ্যে।

সুহৃদ গোটা দুই ট্যুশনি জোগাড় ক'রে নিয়েছে। চাকরী-লাভ এখনো সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। রাজশেখরবাবুও নানা জায়গায় চেস্টা করছেন; কিন্তু সুবিধে আজো কিছু হয় নি। ওঁর নিজের অফিসের কাজটাও ব্যবস্থা করা গেলো না।

সুহৃদের পরীক্ষার ফল বেরুলো; ও পাশ করেছে। পরীক্ষা দেওয়ার পর ক'লকাতায় থাকতে ও ভেবেছিলো এম-এ, পড়বে। কিন্তু বাড়ী এসে সে ইচ্ছে ওর লোপ পেয়ে গেলো। রাজশেখরবাবুকে ও মানসিক শান্তি এবং আর্থিক সুবিধা দিতে চায়। নিজেদের সংসার যে অভাবের তা ও অনুভব করে। বোনেরা যে খুব কষ্ট ক'রে থাকে; চলে অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে—এ সত্য ওকে রীতিমতো বাধা দেয়। সুতরাং সুহৃদ সংসারকে আঁকড়ে ধরলো। দুঃখ ওকে দূর

করতেই হবে। বোনেদের ব্যাহত জীবন, বাবার অর্থকৃচ্ছ্রতা সুহৃদ লাঘব করবেই।

একদিন রাজশেখরবাবু বললেন : আত্রেয়ীর এবার বিয়ে দেয়া উচিৎ, কি বলো?

—এ বছরে ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে নিক। সুহৃদ উত্তর দিলে : এতো দূর প'ড়ে শেষকালে পরীক্ষাটা দেবে না?

কিন্তু বিয়ের চেষ্টা চলতে লাগলো। রাজশেখরবাবুর নিজের কখনো আত্রেয়ীর বিয়ের কথা মনে হয়নি। বিয়ে যে মেয়ের একটা দিতে হ'বে—এ কথা বুঝিয়ে দিলেন হিতৈষীরা। সে যে বড়ো হ'য়েছে এবং অতো বড়ো মেয়ে যে ঘরে রেখে দেয়া উচিৎ নয়—এ কথা বুঝতে পারলেন রাজশেখরবাবু প্রাতিবেশীদের নিকট হ'তে। তাছাড়া এই স্নেহাতুর দরিদ্র পিতার মনে ছিলো একটা গোপন ভয়। আত্রেয়ীকে ছাড়া তিনি ভাবতে পারেন না নিজেকে। সমস্ত সংসারের মধ্যে আত্রেয়ী যে কতোখানি স্থান অধিকার ক'রে আছে, রাজশেখরবাবু ব্যতীত একথা যেন আর কেউ ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। অদ্ভুত লাগে তাঁর; তিনি আশ্চর্য হ'য়ে যান এ কথা ভেবে যে আত্রেয়ী তাঁকে একদিন ছেড়ে চ'লে যাবে; থাকবে না তাঁর সংগে। তিনি বঞ্চিত হবেন আত্রেয়ীর সমস্ত স্নেহ এবং সেবা থেকে। তাই যদিও বা কদাচ আত্রেয়ীর বিয়ের কথা তাঁর মনে হ'য়েছে, তিনি আমলে আনেন নি সে চিন্তাকে; মন তাঁর মানতে চায় নি এই ব্যবস্থাকে। কিন্তু ঘুম নেই প্রতিবেশীদের চোখে। শুভানুধ্যায়ী তাঁরা; তাঁদের অযাচিত উপদেশের মূল্য আছে। তাই রাজশেখরবাবুকেও একদিন বিচলিত হ'য়ে উঠতে হ'লো। কিন্তু সুহৃদের কাছে একটা স্পষ্ট জবাব শুনে তিনি রীতিমতো আশ্বাস বোধ করলেন।

যে ক'টা জায়গায় রাজশেখরবাবু বিয়ের চেষ্টা করেছেন,

তা'রা টাকা চায়। টাকা ছাড়া কন্যার বিবাহ-চেষ্টা নাকি বাতুলতা। কিন্তু টাকার অংকটা রাজশেখরবাবুর ধারণারও বাইরে। তিনি চমকে ওঠেন। অতো টাকা থাকলে তো রাজশেখরবাবু মেয়ের বিয়ের পরিবর্তে সাম্রাজ্য খরিদ করতে পারতেন। সুহৃদের মতামত জেনে তবু তিনি খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন। আত্রেয়ীর বিয়ে না-দেয়ার তবু একটা কারণ রইলো।

ক্রমে আত্রেয়ীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা এগিয়ে এলো। ডুবে গেলো ও পুস্তক-সমুদ্রে। বেশীরভাগ দিনই তপতী রাঁধে। আত্রেয়ী রান্নাঘরে ঢুকলে তা'কে ও জোর ক'রে ঠেলে বার ক'রে দেয়। পরীক্ষার দিন যতোই নিকটতর হ'য়ে আসে রাজশেখরবাবুর মনের সেই গোপন মেঘ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে তাঁর সমস্ত অন্তর।

অবশেষে পরীক্ষা শেষ হ'লো। আর ঘরে রাখা যায় না আত্রেয়াকে। রাজশেখরবাবুর হিতৈষীরা উঠলো ব্যস্ত হ'য়ে। সুতরাং রাজশেখরবাবুকেও উদ্ব্যস্ত হ'তে হ'লো। কিন্তু আবহমান কালের সেই প্রাথমিক উপকরণ টাকা, টাকা কোথায়? আত্রেয়ীর ভবিষ্যৎ স্বামীর মূল্য অনেক টাকা। যে টাকা জোগাড় করতে রাজশেখরবাবুকে বাস্তুটুকুও বন্ধক দিতে হবে; হ'তে হবে সর্বস্বান্ত; হ'তে হবে ঋণগ্রস্ত। অনন্তপ্রসারী চিন্তা-সমুদ্র সাঁতরিয়েও তিনি তীর পেলেন না। কোথায় টাকা? কে তাঁকে এতো টাকা ঋণ দেবে? যদিই ধার পাওয়া যায় তো শোধই বা দেবেন কেমন ক'রে? না; আজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনাও সে ঋণ শোধ করবার মতো সামর্থ্য তাঁকে দিতে পারে না। তারপর সে ঋণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বেড়েই চলবে চক্রবৃদ্ধি হারে।

রাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েও আত্রেয়ীর ঘুম আসে না চোখে। ইদানীং প্রায়ই এমন হয়—অধিক রাত্রি পর্যন্ত ও জেগে থাকে। শোনে তপতীর গভীর নিশ্বাস-পতনের শব্দ।

জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ও চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে। বহুদিন ও ঘুমোবার চেষ্টা করেছে; সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে দিয়েছে তাড়িয়ে। বাইরে থেকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে মাথায় জল মাখিয়ে এসেছে; তৃষ্ণা না থাকা সত্ত্বেও জল খেয়ে এসেছে; মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করেছে। কিন্তু আজ আর কোনো চেষ্টা নেই ওর। আজ আর রাত্রি-জাগরণ ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে না। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। বাইরে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। চোখের ওপর ভেঙে পড়ছে অন্ধকার। এই পিছল অন্ধকারের মধ্যে ও যেন ভেসে বেড়াতে চায় বন থেকে উপবনে, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। সেখানে ও ভীষণ একা; ভয়ানক নিঃসঙ্গ। সেখানে আলো নেই বাতাস নেই, নেই কোনো কলরব। শুধু গভীর এক স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতার সাগরে তরংগ নেই, স্রোত নেই; মাত্র এক অন্তহীন প্রশান্তি।

আত্রেয়ী ভাবছিলো।

ভাবছে ও নিজের কথা। বিগত কয়দিন থেকে ও শুধু নিজের কথাই ভাবছে। শুধু সংসারের কেন বিশ্বের অন্য কোনো সমস্যা বা প্রশ্নের প্রতি ও সম্পূর্ণ উদাসীন। নিজের কথা ভাবতে বেশ লাগছে ওকে; ভয়ানক ভালো লাগছে। আর অপর পাঁচজন যে ওর কথা ভাবে, ওর কথা আলোচনা করে— এই উপলব্ধিটাই ওকে গভীর এক সুখে আপ্লুত ক'রে দেয়। ও টের পেয়েছে, বিশেষ ক'রে ওর বাবা এবং দাদা ওর কথা আলোচনা করেন। কী কথা তা'ও ও জানে। সমস্ত হৃৎপিণ্ডে আত্রেয়ীর লাগে এক প্রচণ্ড ধাক্কা; রক্তে ব'য়ে যায় একটা প্রবল স্রোত। তাঁরা আলোচনা করেন ওর বিয়ের কথা। কেন করেন? এতোদিন তো করেন নি? ওর বয়েস হয়েছে! সুতরাং বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে। আত্রেয়ীর কানে কে যেন সুধাবর্ষণ করলো।

সমস্ত হৃদয় ওর সিঞ্চিত হ'লো ; আবেশে ভ'রে উঠলো মন। কথাগুলোকে ও গানের ছন্দ দিয়ে বার বার আবৃত্তি করতে লাগলো। অবশেষে ওর ক্লান্ত চোখে শান্ত ঘুম নেমে এলো।

এ দিকে রাজশেখরবাবুর মাথায় এক ফন্দি খেলে গেলো। সুহৃদের বিয়ে দিয়ে তো বেশ দু'পয়সা পাওয়া যেতে পারে? আর আত্রেয়ীর বিয়েতে সেই টাকাটা কাজে লাগলেই…… চমৎকার প্ল্যান। রাজশেখরবাবু খুশীতে প্রায় ছেলেমানুষ হ'য়ে উঠলেন।

সুহৃদকে ডেকে তিনি বললেন: দেখো, এক কাজ করো।

দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে সুহৃদ তাকালো ওঁর দিকে। রাজশেখর বাবু বললেন: তুমি বিয়ে করো।

সুহৃদ বিস্মিত হ'লো। সে ভাবে নি একথা তিনি এমন স্পষ্ট ক'রে অকস্মাৎ ওকে বলতে পারেন। এ বিষয়ে ও নিজেও ভেবে দেখে নি কোনোদিন।

রাজশেখরবাবু বললেন: বিয়ে না করলে জীবনে একাগ্রতা আসে না; আসে না নিষ্ঠা। উন্নতি করবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে কখনো জাগে না।

সুহৃদ চুপ ক'রে রইলো। রাজশেখরবাবু ভাবলেন, আর দেরী করা উচিৎ নয়; এবারে ব'লে ফেলা যাক। এর পরের যুক্তিগুলো জানলে কিছুতেই সুহৃদ অমত করতে পারবে না।

—আসল কথাটা কী জানো? রাজশেখরবাবু বললেন: আত্রেয়ীর বিয়েতে অনেক টাকা লাগবে। সে টাকা আমি কখনো জোগাড় করতে পারবো না; সমস্ত জীবনেও না। তোমার বিয়েতে কিছু টাকা আসবেই। আত্রেয়ীর বিয়েতে সেই টাকাটা লাগাবো। কি বলো? ভেবে দেখো তুমি। এবার সত্যিই আত্রেয়ার বিয়ে দেয়ার সময় হ'য়েছে। সত্যিই তো আর চিরকাল ঘরে রেখে দেয়া চলবে না।

সুহৃদ উত্তর কিছুই দিলে না। কিন্তু ও চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। বিয়ের কথা ও ভেবে দেখে নি কোনোদিন; আর বিয়ে করবার জন্যে আপাততঃ ও প্রস্তুতও নয়। উপার্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করাটা যে আত্মহত্যারই রূপান্তর তা' ও বিশ্বাস করে। উপরন্তু টাকা নিয়ে বিয়ে করারও পক্ষপাতী ও নয়। অথচ পরিস্থিতি ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এখনই ওর বিয়ে করাটা মাত্র টাকার জন্যেই। মনুষ্যত্বের কোনো প্রশ্নই অন্তরে জাগতে দেয়া চলবে না। ও সব বড়ো কথাগুলো গরীবদের জন্যে নয়। কিন্তু ও স্থির করতে পারলো না কিছুই।

দুপুরে আহারের পর সুহৃদ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলো। ঘরে প্রবেশ করলে আত্রেয়ী। হাল্কা অথচ দৃঢ় ওর পদক্ষেপ।

—কী? সুহৃদ ওকে জিগ্‌গেস করলে।

কোনো ভূমিকা না ক'রে সোজাসুজি বললে আত্রেয়ী: দাদা, তোমরা কি আমার বিয়ের চেষ্টা করছো?

—চেষ্টা আর তেমন হ'চ্ছে কোথায়? নেহাৎ যদি ভালো কোনো সম্বন্ধ কোনোক্রমে এসে পড়ে তবেই

আত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারলে না। মিনিট কয়েক পরে বললে: দেখো, নিজেদের সর্বনাশ ক'রে বিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন আমি বুঝি না। বিয়ে না হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাদেরকে আজীবন ঋণগ্রস্ত ক'রে তুলতে আমার ঘোরতর আপত্তি। টাকা ছাড়া বিয়ে যদি না-ই হয়, পড়বো। অনেক মেয়েতো আজকাল কলেজে পড়ছে। অবশ্য তোমরা যদি আমায় বোঝা মনে করো তো সে আলাদা কথা।

—কি বলছিস তুই? সুহৃদ বললে: বোঝা মনে করার কথা নয়। আর যেখানে সেখানে যে তোকে যেতে দেবো না —এও তুই জানিস।

—তা আমি জানি। কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যে, তোমরা আমার জন্যে যা' ভাবনায় পড়েছো, আসলে ব্যাপারটায় ভাববার তেমন কিছু নেই। টাকা ধার ক'রে আমার বিয়ে দেয়ার দরকার নেই।

হঠাৎ যেন পিছলে বেরিয়ে গেলো আত্রেয়ী ঘর থেকে। নীরবে অনেকক্ষণ প'ড়ে রইলো সুহৃদ। ও ভাবলে, সত্যিই তো আত্রেয়ীকে কলেজে পড়ালে হয়। মফঃস্বলের কলেজ সত্বেও কয়েকজন মেয়ে তো এখানে পড়ে।

ইতিমধ্যে একদিন ম্যাট্রিকের ফল বেরুলো। আত্রেয়ী পাশ করেছে; আশাতিরিক্ত ভালোভাবে পাশ করেছে। এতোটা কেউ কখনো আশা করে নি। অজস্র সাংসারিক চিন্তা আর অসংখ্য কাজকর্মের মধ্যেও আত্রেয়ী যে পরীক্ষায় এ সম্মান পেতে পারে এটা ছিলো সবারি ধারণার অতীত।

কয়েক জায়গা থেকে আত্রেয়ীর বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগলো। শেষ অবধি প্রায় নিঃখরচায় কোনো পক্ষই রাজী হ'লো না। অবশেষে একদিন আত্রেয়ীর কপাল ফিরলো। ভালো জায়গা থেকে ওর এক সম্বন্ধ এলো। টাকা-কড়ি এক আধলাও দিতে হবে না। সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে পাত্রই। দ্বিতীয় পক্ষ; প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান মারা গেছেন। জমিদার; টাকার ওপর শুয়ে থাকে, হেঁটে যায় টাকার ওপর। পাত্রের বয়স চল্লিশ পার হ'য়েছে। কিন্তু কিম্বদন্তী, সুপুরুষ।

—আত্রেয়ীকেও তো একবার জিগ্‌গেস করতে হয়। সুহৃদ বললে রাজশেখরবাবুকে: ওরও মতামত নেয়া দরকার।

—নিশ্চয়ই। লেখাপড়া শিখেছে; ওর মতামত চাই বই কি। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি জিগ্‌গেস করছি ওকে। তিনি ডাকলেন: আত্রেয়ি, একটু শুনে যা তো মা!

আত্রেয়ী এসে দাঁড়ালো এক পাশে; শান্ত, নম্র। চলা-ফেরায় ওর একটা সংযত শ্রী।

—হ্যাঁ মা, তোর একটা সম্বন্ধ এসেছে। রাজশেখরবাবুই বললেন: লোক ভালো; বনেদি বংশ; বড়োলোক। একমাত্র খুঁত বলতে বয়েসটা কিছু বেশী আর প্রথমা স্ত্রী, অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থাতেই মারা গেছেন। তা' বয়েসের সংখ্যাটাই তো আর জীবনের তুলাদণ্ড নয়। মন যদি থাকে কাঁচা, দেহে যদি থাকে যৌবন, তা'কেই তো সত্যিকার যুবক বলে। দেখ অবশ্য তুই ভেবে। তোরই পছন্দ অপছন্দ প্রধান। তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে······

আত্রেয়ী দাঁড়ালো শক্ত হ'য়ে।

—আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কী? ও বললে: ভালো মন্দ তোমরা আমার চেয়ে কম বোঝো না কি? তোমরা যেখানে আমাকে দেবে, সেখানেই আমার ভালো হবে। হ্যাঁ, এইটাই আমার বিশ্বাস।

কথাটা শেষ ক'রে আত্রেয়ী মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে পড়লো; বোধহয় কথাগুলো প্রায় বক্তৃতার মতোই শুনিয়েছে।

আত্রেয়ী ফিরে এলো নিজের ঘরে, বলিষ্ঠ হাতে একটা দাঁড়ি টেনে দিয়ে, যা'র পরে চলতে পারে না কোনো কথা; যা' একেবারে সম্পূর্ণ; যা'র আর দ্ব্যর্থতা নেই। ও যে নিজের বাবাকে, দাদাকে, সর্বোপরি সমগ্র সংসারটাকে একটা কঠিন দায় থেকে মুক্ত করছে, এ বড়ো কম কথা নয়। ওঁদের দুশ্চিন্তার বোঝা আজ থেকে কমবে—এই সান্ত্বনাতেই আত্রেয়ী বেশ তৃপ্তিবোধ করতে লাগলো। এখানে আত্রেয়ী বড়ো নয়; বড়ো সংসার, সমাজ, অর্থ। তা'দের কাছে ও যে নিজেকে বিনয়ী করতে পেরেছে, পেরেছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে

নিতে, এতেই ও পরিতুষ্ট। সংসারে বড়ো নয় একার সুখ; দশজনের সুখটাই বরণীয়। আত্রেয়ীর মন অস্বাভাবিক শান্ত হ'য়ে এলো। শুয়ে শুয়ে ও ভাবছে, এ ভালোই হ'লো। ওর যে একটা কিনারা হ'য়েছে আত্রেয়ী এতে আনন্দিত। আজ থেকে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে ও নিজে যে সবাইকে অব্যাহতি দিতে পারলো—এই ভেবেই ও সুখী। সকলের উদ্‌গ্রীব, উৎসুক দৃষ্টি থেকে এতোদিন পরে ও আজ নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে; তা'দের আলোচনায় ও পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবে। আজ থেকে ওর বিশিষ্টতার হ'লো অবসান।

আরো ভাবলে আত্রেয়া, স্ত্রীলোকের কাছে প্রধান কথা স্বামী; প্রাপ্ত-বয়স্ক কিম্বা তরুণ এটা অবান্তর বিলাস। স্ত্রী-লোকের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তা'র স্বামী আছে। স্বামী কয়টি স্ত্রীর অধিকারী হ'য়েছেন, সেটা বড়ো নয়। ও যে বিনা আয়াসে এবং কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানেই একজন টাট্‌কা স্বামী পাচ্ছে —এ কথা ভাবতেই ও বিস্ময় অনুভব করে। এমন মেয়ে ও কম ক'রে কুড়িটা দেখিয়ে দিতে পারে, পৃথিবী ওলট-পালট ক'রেও যা'দের একটা স্বামী জুটছে না; যা'রা প্রায় হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। একজন স্বামী, যা' লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে যে কেউ হ'তে পারে, সেই সাধারণ একটা স্বামী পর্যন্ত তা'রা বছরের পর বছর চেষ্টা ক'রেও জোগাড় করতে পারছে না। আর সেই পরম রমণীয় ব্যক্তিটি কি না এক কথায় আত্রেয়ীর জুটে যাচ্ছে। ও খানিকটা হেসেই ফেললে মৃদুকণ্ঠে নিজের কপাল দেখে।

ভদ্রলোক; সম্ভ্রান্ত বংশ; চেহারা ভালো। সুখে প্রায় ছল্‌ছলিয়ে উঠলো আত্রেয়ী। এ পৃথিবীতে ওর দাঁড়াবার একটা জায়গা হ'লো, যেখান থেকে নিশ্চিন্ত মনে ও সমস্ত জগতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারবে। এখানে তো ও ভেসে

বেড়াচ্ছিলো, এ তো পরের সংসার। নিজের বলতে এখানে ওর কি আছে? এবারে ও গভীর নিশ্বাস ফেলবার একটা বিস্তৃত জায়গা পাবে; যেখানে ওর অধিকার থাকবে অটল, গাম্ভীর্যের সুষমায় মণ্ডিত। বিয়ে করতে এমন কিছু রাজপুত্রের প্রয়োজন হয় না। সংসারে চেষ্টা করলে সবাইকেই শ্রদ্ধা করা যায় আর যায় ভালোবাসা। এর জন্যে বিশেষ কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় না কোনো নির্জন দ্বিপ্রহরের পটভূমির, কিম্বা কোনো তারাভরা রাত্রির। মানুষের জীবন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। আত্রেয়ী মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগলো: স্বপ্ন নয় বাস্তব।

কয়েকটা দিন কেটে গেলো। বসন্তের রৌদ্র-ঝলমল কয়েকটা শাণিত প্রখর দিন। বিবাহোৎসব এগিয়ে এলো, সব প্রায় স্থির হ'য়ে গেছে। এমন সময় হ'লো এক বিপর্যয়। আত্রেয়ীর এক সহপাঠিনীর আকস্মিক আবির্ভাব হ'লো একটা মারাত্মক জলোচ্ছ্বাসের মতো। ওরা এক সংগেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। নাম অনীতা। পড়ছে এখন কলেজে।

—এই, তোর নাকি বিয়ে রে? জিগ্‌গেস করলে অনীতা।

আত্রেয়ী তখন বিছানায় শুয়ে একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়ছিলো। পড়ছিলো মানে, বইয়ের পাতা ছিলো খোলা, আত্রেয়ী ছিলো তাকিয়ে বাইরের নীল আকাশের দিকে।

—হুঁ। আত্রেয়ী উঠে বসলো।

—খাওয়া!

—বিয়ের দিন আসিস। আজ কী?

—ভগ্নদূত। অনীতা বললে।

—মানে? আত্রেয়ী তাকালে ওর দিকে।

—ওখানে তোর বিয়ে হ'তে পারে না। এক মুহূর্তে অনীতার মুখ আশ্চর্য রকম কঠিন এবং গম্ভীর হ'য়ে গেলো।

আত্রেয়ী কোনো উত্তর দিতে পারলে না; তাকিয়ে রইলো অনীতার মুখের দিকে; যে-মুখের অভিব্যক্তি অত্যন্ত কঠিন এবং দৃঢ়। কয়েক মিনিট পরে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো আত্রেয়ীর ঠোঁটের পটভূমিকায়।

—কি হ'লো কি? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে: ভাঙ্‌চি দিতে এসেছিস?

কিন্তু এ ঠাট্টা অনীতার গা ছুঁয়ে গেলো মাত্র। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর আনলো না।

—কী হ'য়েছে খুলে বল। আত্রেয়ী সাগ্রহে প্রশ্ন করলে।

—ওখানে তোর বিয়ে হ'তে পারে না। ইন্দ্রনারায়ণবাবু অর্থাৎ তোর ভবিষ্যৎ স্বামী আমাদেরি কোনো এক আত্মীয়াকে বিয়ে করেছিলেন। সুতরাং ভালোভাবেই জানি যে ভদ্রলোক হ'লেও তিনি চূড়ান্ত মাতাল; টাকা আছে, কিন্তু ব্যয়িত হয় তা' ব্যসনে। ওঁর আগের স্ত্রী কি ভাবে মারা যান তা' আমরা মনে করতেও শিউরে উঠি। বাড়ীর পাঁচজনের আলোচনায় আজ যখন জানতে পারলুম যে, এই সহরেই কোন্ এক আত্রেয়ীর সংগে তাঁর পুনর্বিবাহের সম্বন্ধ হ'চ্ছে, তখনি ছুটে চ'লে এসেছি তোর কাছে। না, না; ওখানে তোর বিয়ে হ'তে পারে না।

—তুই যা সব বললি তাতে আমার কি? আত্রেয়ী নির্লিপ্ত হ'য়েই যেন বললে: সংসারে আমার অবস্থাও খুব সুখের নয়। আমি পাবো স্বামী; জমিদারের স্ত্রী হবো; গায়ে গয়নার রাশি উঠ্‌বে; গাড়ী চড়বো; দাস-দাসী খাটাবো—এই তো যথেষ্ট মেয়েমানুষের পক্ষে। স্বামী মাতাল বা পরনারীগামী কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে সে-সব নিয়ে মাথা ঘামানো পাপ।

বিমূঢ়া অনীতা প্রশ্ন করলে: এ সব কি সত্যি বলছিস তুই?

—সত্যিই তো। আত্রেয়ী শান্ত জবাব দিলে।

—স্বামী তুই পাবি একজন, সন্দেহ নেই। অনীতা বললেঃ কিন্তু সে তোর স্বামী হ'বে না। সে হ'বে তোর কাছে একজন বিশেষ পুরুষ মাত্র, যা'র সংগে তোর আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না শুধু একটি মাত্র সহজ সম্বন্ধ ছাড়া। তুই হ'বি তা'দেরি মধ্যে একজন, যা'দের সে মূল্য দিয়ে কেনে। খালি তোর দামটা কিছু বেশী দেবে, এই যা।

অনীতা আবেগে হাঁপিয়ে উঠেছে।

আত্রেয়ীর মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির ক'রে উঠলো। ওর সমস্ত শরীরে ব'য়ে গেলো একটা হিম-শীতল স্রোত। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ও বললেঃ কিন্তু অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। বোধহয় আর কোনো উপায় নেই।

—কখনই কোনো কিছুর জন্যে অনেক দেরী হ'য়ে যায় না, আত্রেয়ী। ইস্পাতের মতো শক্ত হ'য়ে অনীতা বললে।

—কিন্তু তুই তো জানিস না; সব ঠিক হ'য়ে গেছে। ডিলিরিয়্যমের মতো বললে আত্রেয়ী।

—বেঠিক করতে কতোক্ষণ?

দৃঢ় ভংগীতে অনীতা পাশের ঘরের দিকে গেলো; যেখান হ'তে রাজশেখরবাবু ও সুহৃদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো।

আত্রেয়ী বিছানায়ই প'ড়ে রইলো নিষ্প্রাণের মতো। প'ড়ে রইলো এমন নির্লিপ্তের মতো যেন ব্যাপারটার সংগে ওর কণামাত্র সম্বন্ধও নেই। ও প'ড়ে রইলো এমনি এমনিই; যেমন প'ড়ে রয়েছে তাকের ওপর অর্থাভাবে সারাতে-না-পারা অচল ঘড়িটা।

তিন

বিয়ে গেলো ভেঙে। আত্রেয়ী কুমারীই র'য়ে গেলো। ও জমিদার-গিন্নী হ'তে পারলো না। আত্রেয়ীর মন ফিরে এলো সেই বিশিষ্ট স্থানে, যেখানে কোনো কলরব নেই; নেই চঞ্চল আলোড়ন। কিন্তু তবু ও গেলো সংকুচিত হ'য়ে; গেলো খানিকটা কুঁক্‌ড়ে ছোটো হ'য়ে। ও সেই বোঝা, সেই একটা বিরাট সমস্যা হ'য়েই রইলো। জীবনের পরিণতি ওর যাই হোক, তবু সমস্যার একটা সমাধান হ'তো। থাকতো না ওর সমস্ত শরীর বেষ্টন ক'রে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তবু ও খানিকটা গড়িয়ে যেতো, সে যেখানেই হোক। এ যেন মধ্যপথে দাঁড়িয়ে থাকা; পরিণতিহীন, অর্থহীন। তবু থাকতো একটা নতুন জীবনের আস্বাদ, বিচিত্র পথের একটা ইংগিত।

যা' হোক, আত্রেয়ীর দিন কাটতে লাগলো। মাঝে মাঝে দৃষ্টি পড়ে ওর আকাশে সোনালী মেঘের দিকে, নারিকেল গাছের কম্পনরত পত্রশীর্ষে। তপতীর পড়ার তদারক ক'রে, দু'বেলা রান্না ক'রে আর সেলাই নিয়ে ওর দিন স্বচ্ছন্দেই কাটতে লাগলো।

—কলেজে পড় না। ব'সে থেকে কি করবি? সুহৃদ একদিন ওকে বললে।

—পড়বো; যাক না কিছুদিন। আত্রেয়ী উত্তর দিলে।

এ উত্তরের অর্থ সুহৃদের কাছে অস্পষ্ট রইলো না। ও জানে, পড়া মানে কলেজের মাইনে, বই, শাড়ী, জুতো ইত্যাদি।

—টাকার জন্যে আটকাবে না। সুহৃদ বললে: সামনের মাস থেকে আরো একটা মাষ্টারী পাবো।

স্থির হ'লো, আত্রেয়ী কলেজে ভর্তি হবে আর সুহৃদ করবে বিয়ে। রাজশেখরবাবু ঠিক ক'রে ফেলেছেন, ওর বিয়ে দিয়ে যে কয়েক তাড়া নোট পাওয়া যাবে আত্রেয়ীর বিয়েতে তা' খাটালেই চলবে।

পাত্র হিসাবে সুহৃদ বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিত, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান। বিয়ের নীলামে ওর দর কিছু উঠবে। ঠিক হ'লো মেয়ের বাবা বিয়ের পর সুহৃদকে একটা ভালো চাকরী দেবেন। চাকরী দেয়ার ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই আছে। রাজশেখরবাবুর মন আনন্দে তরংগায়িত হ'য়ে উঠলো। ঠিক হ'লো সব কথা-বার্তা। বিয়ের দিনেই কন্যাপক্ষ রাজশেখরবাবুর হাতে তুলে দেবেন নগদ দু'হাজার টাকা।

বিয়ের মাত্র কয়েক দিন বাকি। আশীর্বাদ হ'য়ে গেছে। বাড়ীর আব্‌হাওয়া তবু খানিকটা হাল্কা হ'য়ে উঠবে। গাম্ভীর্যের নীরেট শক্ত দেয়ালগুলো ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাক। আত্রেয়ী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বড়োলোকের মেয়ে; তা' হোক; ওদেরি মতো মেয়ে তো? রাজশেখরবাবু নিতান্ত উৎসাহী হ'য়ে উঠেছেন এই ক'দিন। দিন দুই হ'লো ও-পক্ষ রাজশেখরবাবুর হাতে বিয়ের খরচা বাবদ্‌ কিছু টাকাও দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুহৃদ পাচ্ছে না তেমন উৎসাহ। বিয়ের দিন যতোই এগিয়ে আসছে, মন ওর ততোই ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো। চোখ বন্ধ ক'রে স্রেফ ঝাঁপিয়ে পড়া। ডুবলেও ডুবতে পারে; বাঁচলেও বাঁচতে পারে। ওর একটা মস্ত আশংকা, ভবিষ্যৎ বধূ অর্থবতী ব'লে। একথা মনে হ'লেই ও যেন বিরূপ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু রাজশেখরবাবু বুঝিয়ে দিলেন: কিছু এসে যায় না মেয়ের বাপের টাকা আছে কি নেই তা'তে। দেখতে হবে ওদের নিজেদের লাভ-লোক্‌সান। ঝড়ের ঝাপ্‌টা থেকে আপাততঃ ওদের নিমজ্জমান নৌকাখানি বাঁচাতে

হবে। টাকার সংগে মেয়ের কী সম্বন্ধ? টাকা নেবেন রাজশেখরবাবু; নেবেন প্রতাপবাবুর কাছ থেকে।

সুহৃদ রাজী না হ'য়ে পারলে না। প্রয়োজনের কাছে ওর ভাবপ্রবণতা যে নিরর্থক, একথা বুঝতে ওর অধিক বিলম্ব হ'লো না। আত্রেয়ীর বিয়ে দিতে হবে। টাকা না হ'লে কেউ মেয়ে নেবে না। আর সে টাকা যদি ওকে উপলক্ষ্য ক'রেই উপার্জিত হয়, তা' হোক না। ঝাঁপ দেয়ার জন্যে সুহৃদ প্রস্তুত হ'লো।

যথারীতি সানাই সুর তুললো; শাঁখ বাজলো। অনেক লোক হৈ চৈ করলো। ভাঙলো অনেক সরা, খুরি। অনেক তরুণীর অংগে ঝল্‌সালো অলংকার। অনেক কুমারীর বুকে দোল খেয়ে গেলো স্বপ্ন।

রাজশেখরবাবু উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের লগ্নের আর দেরী নেই। দোতলার কোন এক ঘর থেকে আসছে গানের শব্দ। কে জানে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবছিলো যে বেসুরো চীৎকার করা মেয়েদের জন্মগত স্বভাব এবং অধিকার। বরাসনে উপবিষ্ট সুহৃদেরো কান এড়ায় নি এ সংগীত। ও ভাবলে, স্ত্রীর ভগ্নী নয় তো?

ইত্যবসরে মেয়ের বাবা প্রতাপবাবু রাজশেখরবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন একান্তে। বললেন: বেয়াইমশাই, একটা কথা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। রাজশেখরবাবু আগ্রহী হ'য়ে উঠলেন।

ভীষণ অপদস্থের ভংগী নিয়ে প্রতাপবাবু শুরু করলেন: কিছু মনে করবেন না। টাকাটা আজই আপনার হাতে দেয়ার কথা ছিলো। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে এখনি সেটা দিতে পারলাম না। আপনি কিন্তু কিছু মনে করতে পাবেন না।

—কিছু না, কিছু না; সে কী কথা। রাজশেখরবাবু প্রায়

লাফিয়ে উঠলেন: দেবেন এখন পরে; তা'র জন্যে অতো ব্যস্ত হবার কি আছে? আর এতো ক'রে আমাকে বলবারই বা আছে কী?

—তাছাড়া এ তো আর আমাদের ব্যবসাদারের সম্বন্ধ নয়। প্রতাপবাবু রাজশেখরবাবুর হাতটা টেনে নিলেন নিজের হাতে। বললেন: আজ থেকে আমরা যে নিকট আত্মীয়। টাকা বড়ো নয়; বড়ো মানুষ। কী বলেন বেয়াইমশায়?

রাজশেখরবাবু প্রায় আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন ওঁর উদারতা আর মহানুভবতা দেখে। এতো বড়োলোক, কিন্তু একটু দেমাক্ নেই; নেই এতোটুকু অহংকার। কৃতজ্ঞতায় রাজশেখরবাবুর হৃদয় দ্রবীভূত হ'য়ে গেলো। ওঁর চোখ দিয়ে বোধহয় জলও গড়িয়ে আসতে চাইছিলো।

—বন্ধুবান্ধব অনেকেই আপত্তি তুলছিলো, শর্মিলাকে কেন আপনাদের ওখানে বিয়ে দিচ্ছি? অনেকে রীতিমতো ক্ষুণ্ণও হ'য়েছিলো। তা'দের আমি কি বলেছি জানেন? বলেছি: টাকা পয়সাই মানুষের সব চাইতে বড়ো পরিচয় নয়; তা'র পরিচয় মনুষ্যত্বে। সত্যিকারের ভালো আব্‌হাওয়ার মধ্যে যদি মেয়ে থাকতে পায় তো সে তা'র অতি সৌভাগ্যের কথা। মিলি তো সুখের মধ্যেই মানুষ হ'য়েছে; দাঁড়াক না একবার। দুঃখের মুখোমুখী; জীবনকে চিনুক। স্বামীর হাত ধ'রে যেদিন হাসিমুখে সমস্ত দুঃখকে ও জয় করতে পারবে, সে-দিনই তো ওর মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। অভাব আর দুঃখের আগুনে পুড়ে মানুষ তবেই না খাঁটি সোনা হওয়ার সুযোগ পায়।

রাজশেখরবাবু শুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন প্রতাপবাবুর মুখের দিকে। বয়েস বছর পঞ্চাশ; মাথায় প্রকাণ্ড টাক; মুখে বার্ধক্যের একটি রেখাও পড়ে নি; গোঁফ-জোড়া পাকিয়ে

সূঁচালো ক'রে দিয়েছেন; দেখলেই মনে হয় যেন বিশ্বের সমস্ত শঠতার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে ওঁর ওই ভয়াবহ গোঁফজোড়া। চারিধারে একটা চাপা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে প্রতাপবাবু বললেন: আমি আশা করি মিলি মা আমার উপযুক্ত স্থানেই যাচ্ছে। আপনার সেবা করতে পেরে ও নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করবে।

—আজ থেকে আমার আর একটি মেয়ে হ'লো। রাজশেখরবাবু ভারি গলায় বললেন: আমার ঘরে যে লক্ষ্মী আসছেন, তাঁর যেন তুল্য মর্যাদা দিতে পারি।

লক্ষ্মী এলো রাজশেখরবাবুর বাড়ী। এলো ঘর আলো ক'রে; কিন্তু সংগে অর্থ এলো না। তবে রাজশেখরবাবু সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। প্রতাপবাবুর মতো বড়লোকের কাছে দু' তিন হাজার টাকা কিছুই নয়।

শর্মিলাকে পেয়ে রাজশেখরবাবু আনন্দিত হ'লেন, তৃপ্ত হ'লেন। আত্রেয়ী আর তপতী খুশী হ'লো। ওরা যথারীতি লক্ষ্মীকে বরণ ক'রে ঘরে তুলে নিলে। শর্মিলার রূপ দেখে দু' বোনই বিস্মিত হ'লো। বিয়ের পূর্বে ওরা খ্যাতি শুনেছিলো; কিন্তু সে যে এমন তা' কল্পনাও করতে পারে নি। আত্রেয়ী আদর ক'রে ডাকলে: বৌদি! আর তপতী কিছু বলতেই পারলে না।

ওদের মধু-যামিনী। দু' বোনে ঘর সাজালে ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে।

রাত্রি গভীর; বাড়ী নিস্তব্ধ। বর-কনের ঘরে উঁকি মারবার মতো কেউ নেই এ বাড়ীতে।

সুহৃদ কোথায় গেছে; এখনো বাড়ী ফেরে নি। রাজশেখরবাবু দু'বার বলেছেন: আজকের দিনে ওর এ আচরণ অসংগত। কচি মেয়ে; বোধহয় জেগে থেকে থেকে এতোক্ষণে ঘুমিয়েই

পড়েছে। আত্রেয়ী একবার এসেছিলো। নতুন টেব্‌ল্‌-ক্লথের ওপরে নীল শেডের মধ্যে মোমবাতি জ্বলছিলো। সেই স্তিমিত আলোকে শর্মিলাকে মনে হ'চ্ছিলো এক অপরূপ রাজকন্যা। শাড়ীর রূপালী পাড়ে আর গায়ের অলংকারে ঠিক্‌রে পড়ছিলো আলোর কণা। আনত মুখে ওর এক অনির্বচনীয় শুভ্র সুষমা। দরজাটা ছিলো ভেজানো। আত্রেয়ী কখন নিঃশব্দে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো ও টের পায় নি। হঠাৎ শব্দ শুনে শর্মিলা তাকালো চোখ তুলে।

—কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

কোনো উত্তর দিলে না নবাগতা; চুপ ক'রে রইলো। আত্রেয়ী ভাবলে, বোধহয় এই রীতি। কিন্তু কী আশ্চর্য! সহজ কথার উত্তর দিতে এতো কিসের সংকোচ? ও আবার জিগ্‌গেস করলে: জল খাবেন? ঘুম পাচ্ছে খুব, না?

উত্তর নেই। আত্রেয়ীর সন্দেহ হ'লো। মনে হ'লো না, এ নিছক লজ্জা। আর একটা কী ও জিগ্‌গেস করতে যাচ্ছিলো। ঠিক তখনি বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেলো। আত্রেয়ী উঠলো চম্‌কে; কিন্তু শর্মিলা তেমনি স্থির। শাড়ীর আঁচলটা স্তূপীকৃত হ'য়ে শ্লথ আলস্যে ভেঙে পড়েছে মাটীতে। আত্রেয়ীর মনের মধ্যে অদম্য ইচ্ছে হ'লো পরম স্নেহে এবং সযত্নে আঁচলটা তুলে দেয় শয্যার ওপর। কিন্তু সুহৃদ এসে গেছে; আর সময় নেই। ফিরে দাঁড়িয়ে ও সুহৃদকে বললে: আচ্ছা লোক তুমি। ছিলে কোথায়? এদিকে বৌ তো ধ্যানে বসেছেন।

—তুই ধ্যান ভাঙাতে পারলি না? সুহৃদ হাসিমুখে প্রশ্ন করলে।

—যা'র ভাঙাবার সেই ভাঙাক। আত্রেয়ী প্রায় ছুটে পালালো।

ঘরের মধ্যে কয়েক মিনিট বাক্যহীন স্তব্ধতা। শেডের ভেতর

মোমবাতির শিখাটা কাঁপছিলো। জানলার বাইরে বিস্তীর্ণ আকাশ আর গভীর অন্ধকার। নারকেল আর সুপুরি গাছের পাতাগুলো বাতাসে দুলছে। আমগাছটার ভেতরে একটা কাক দু'বার ডানা ঝাপ্‌টে কা কা ক'রে উঠলো। রাস্তার ধারের কতোগুলো কচুগাছের পাতায় মিউনিসিপ্যালিটির লাইটের আলো এসে পড়েছে।

সুহৃদ খাট থেকে নেমে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো। শর্মিলা তেমনি পাথরের মূর্তির মতো চুপ ক'রেই ব'সে র'য়েছে। সুহৃদ বালিশগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলে। ঠিকই ছিলো তবু বিছানার চাদরটাকে পুনর্বার চারিদিকে টেনে দিলে। কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে পকেট থেকে প্যাকেট্‌টা বা'র ক'রে বললে: একটা সিগারেট খাবো? তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

শর্মিলা নড়লো না; তুললে না একটু মুখ। ফস্‌ ক'রে দেশলাই ধরিয়ে সুহৃদ ঠাট্টার সুরে বললে: মৌন মানেই সম্মতি; কি বলো? সিগারেটে একটা জোরালো টান মারলে সুহৃদ।

কিন্তু সিগারেটের আয়ু পাঁচ মিনিট। তারপরই সেটাকে টান মেরে ফেলে দিতে হ'লো।

—এক গ্লাস জল খাওয়া যাক। সুহৃদ নামলে খাট থেকে। ঘরের কোণে কুঁজোতে জল ছিলো। ও আশা করেছিলো শর্মিলা নিজে নেমে আসবে জল গড়াবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু নিজে হাতেই গড়িয়ে নিতে হ'লো ওকে।

—জল খাবে? সুহৃদই অবশেষে পরিচর্যা করতে চাইলে।

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে জানালে, ও জল খাবে না।

গ্লাসটা কুঁজোর মুখে রেখে ফিরে এলো সুহৃদ। এবারে বসলো শর্মিলার ঘনিষ্ঠ হ'য়ে। বাতির শিখাটা কাঁপছিলো।

ফুলের পাতলা মৃদু গন্ধে ঘরটা ভ'রে গেছে। শর্মিলার পরিচ্ছদও সুরভিসিক্ত।

—গরম লাগছে? সুহৃদ কোমল কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে: মাথার কাপড়টা ফেলে দাও না। লজ্জা কি? কেউ তো দেখতে আসছে না?

কেউ দেখতে না এলেও মাথার কাপড় আল্গা করবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেলো না। সুহৃদ আর একটু এগিয়ে এসে শর্মিলার মাথার কাপড়টায় টান দিলে। শর্মিলা হাত দিয়ে সামলে নিলে স্খলিত আঁচলটা।

—আমার কাছে তোমার লজ্জা কি? সুহৃদকে বলতে হ'লো।

টেব্‌লের ওপর যৌতুক পাওয়া সোনার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সুহৃদ বললে: অনেক রাত হ'য়েছে দেখছি; বারোটা বাজে। একবার ভেবেও নিলে ও আর একটা সিগারেট ধরানো চলে কি না। অবশেষে বললে: এসো, শোয়া যাক।

সুহৃদ পাঞ্জাবীটা খুলে টাঙিয়ে রাখলে। শর্মিলা সামান্য ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলো। ওর শরীরের সমস্ত অলংকার উঠলো ঝক্‌-ঝক্ ক'রে। আর শরীরের সমস্ত রক্ত সুহৃদের বুকের মধ্যে দিলে এক প্রচণ্ড ধাক্কা।

—বাতিটা নিভিয়ে দিই; কি বলো? সত্যিই বাতিটা নিভিয়ে দিলে সুহৃদ। তরল অন্ধকারে ভ'রে গেলো সমস্ত ঘর। সুহৃদ শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। বাইরে আকাশে কোথায় এক টুকরো চাঁদ উঠছে। গাছের ফাঁক দিয়ে তা'রি ভাঙা-চোরা আলো এসে পড়েছে ঘরে। এতোক্ষণ সে বিদ্যমানতাটা জানা যায় নি। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক তীব্রতর হ'য়ে উঠলো।

সুহৃদ স্ব-স্থানে গিয়ে কাত্‌ হ'য়ে পড়লো, আধশোয়া অবস্থায়।

শর্মিলাকে ডাকবার চেষ্টা করলে দু'বার; গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে গেলো সুহৃদ। জোর ক'রে সহজ এবং কোমল গলায় ও ডাকলে : শর্মিলা!

অন্ধকারে শর্মিলা সুহৃদের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

—এসো না, শোবে। অনেক রাত হ'লো যে। হৃৎপিণ্ডের মাতামাতির শব্দে সুহৃদ নিজের কথাই ভালো ক'রে শুনতে পেলো না।

শাড়ীটা শ্লথ ক'রে দিয়ে শর্মিলা আলগোছে শুয়ে পড়লো। সংগে সংগে ওর একরাশি কালো চুল বালিশের আশে পাশে পড়লো ছড়িয়ে। সুহৃদ বালিশে মাথা রাখলে। গভীর নিঃশ্বাসের সংগে ও টেনে নিলে শর্মিলার চুলের উগ্র গন্ধ। একবার ওর দিকে স্পষ্ট ক'রে দৃষ্টিও দিলে। কিন্তু অন্ধকারে বোঝা গেলো না শর্মিলা কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে। জানলা দিয়ে হাওয়া ব'য়ে আসছে; কাঁপছে মশারীর ঝালর; বাইরে বাদুড়ের পাখার শব্দ। ঘুম কই চোখে? রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরের মন্থর গতি অনুভব করা যায় যেন। টেব্‌লের ওপর হাত-ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দও শোনা যায়। ঘড়ির কাঁটা অতি ধীরে ধীরে অতিক্রম ক'রে চলেছে মুহূর্তের বিরাট সমুদ্র; মানুষ যেমন ক'রে অতিক্রম করে দীর্ঘ জীবনের দিনগুলো। একদিন ওই ঘড়ি চিরদিনের মতো স্তব্ধ হ'য়ে যাবে; যেমন একদিন শেষ হ'য়ে যায় মানুষের দীর্ঘ যাত্রাপথ। যেখানে মানুষ শেষ হ'য়ে যায়; যায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে; যেখানে থাকে না এক কণা মাত্র চিহ্ন।

কিন্তু ঘড়ি আপাততঃ চলছে। সুহৃদ মৃদু কণ্ঠে ডাকলে : শর্মিলা।

—কি?

—ঘুম পাচ্ছে তোমার?

উত্তর নেই।

—খুব ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছো, না ?

নীরবতা।

—গরম লাগছে ?

নিস্তব্ধ।

—মশা লাগছে ? মশারীটা এবার ফেলে দেবো ?

চুপচাপ।

সুহৃদ রাগ না ক'রে পারলো না। বললে : তুমি কি কালা হ'লে নাকি ? কথার উত্তর দিতে আপত্তি কি ? না হয় নতুন বৌ ; কিন্তু আমিও তো নতুন স্বামী।

—কালা হ'বো কেন ? মৃদু কণ্ঠে বধূ উত্তর দিলে।

—যাক ; নিশ্চিন্ত হ'লাম। কিন্তু উত্তর দিচ্ছিলে না কেন ?

কথা নেই।

—কি, আবারো কথা বলছো না যে ?

—কি উত্তর দেবো ?

—যা' প্রশ্ন করছিলাম।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা। সুহৃদ শর্মিলার বুকের ওপর ন্যস্ত হাতখানি তুলে নিলে। শর্মিলা হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে ; কিন্তু পারলো না।

—ছাড়ুন। শর্মিলা বললে।

সুহৃদ চমৎকৃত হ'লো। বললে : ছাড়বার জন্যে ধরি নি। তা' ছাড়া আমাকে আপনি বলছো কেন ?

মৌনতা।

সুহৃদই বললে : আরো কাছে স'রে এসো না। মাঝখানে তো আর কাঁটা-তারের বেড়া নেই।

নীরবতা।

বাইরে অন্ধকারে জোনাকী জ্বলছে ; আকাশে কলংকবতী ক্ষীণ চাঁদ।

—এসো। ব'লে সুহৃদ দু'হাতে জড়িয়ে ওকে প্রায় বুকের কাছে নিয়ে এলো।

শর্মিলা ছটফট্ করতে লাগলো ওর বাহু-বন্ধনে।

—কি হ'লো কি ? সুহৃদ জিগ্‌গেস করলে ঃ অমন করছো কেন ?

কিন্তু তবুও শর্মিলার অস্থিরতার বিরাম নেই। নিজেকে ও মুক্ত ক'রে নেবেই। বিরক্ত হ'য়ে সুহৃদ পুনর্বার জিগ্‌গেস করলে ঃ কি হ'য়েছে কি ?

—ভালো লাগছে না। শর্মিলা জবাব দিলে।

—কারণ ?

—ঘুম পাচ্ছে। উত্তর হ'লো।

—না; পাচ্ছে না। সুহৃদ বললে।

—কি ক'রে বুঝলেন আপনি ?

—ঘুমের কথা যখন জিগ্‌গেস করেছিলাম তখন বলো নি। সুতরাং ঘুম তোমার পায় নি। তুমি মিথ্যে কথা বলছো।

পুনরায় স্তব্ধতা।

—অমন বালির বস্তার মতো প'ড়ে রইলে কেন ? বললে সুহৃদ ঃ জীবন্ত মানুষ তো তুমি ?

—সেই জন্যেই তো অসহ্য লাগছে। ছাড়ুন। আপনাকে গরম করছে না ? সহজ গলায় শর্মিলা প্রশ্ন করলে।

—একেবারেই না; বরং বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, বলোতো ? পছন্দ হয় নি ?

—অবান্তর।

—কী ?

—প্রশ্নটা। শর্মিলা বললে।

—কেন ?

—ওসব কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখানে।

—তুমি বুদ্ধিমতী। সুহৃদ ঠাট্টা করলো।

কয়েক মিনিট কাটলো। সুহৃদ ওকে আলিংগনমুক্ত ক'রে দিলে। শর্মিলা হাল্কা হ'য়ে গুছিয়ে নিলে নিজের পরিচ্ছদ আর সাব্যস্ত ক'রে নিলে চুলগুলো।

সুহৃদ পাশ ফিরে ঘুমোবার চেস্টা করলো।

—আপনার বুঝি এক বোন ? শর্মিলা জিগ্‌গেস করলে। সুহৃদের তন্দ্রা ভেঙে গেলো। কিন্তু কোনো উত্তর দিলে না ও।

—ভাই নেই ? পুনর্বার প্রশ্ন করলে শর্মিলা।

চুপচাপ।

—আপনার মা বুঝি অনেক দিন মারা গেছেন ?

উত্তর নেই।

—আপনি কালা বুঝি ?

—ভয়ানক। সুহৃদ এতোক্ষণে উত্তর দিলে : সত্যি সত্যিই ঘুম পাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

—আপনি তো চাকরী করেন না। তবে বিয়ে করলেন কেন ?

সুহৃদ চমকে উঠলো। বললে : তোমার শাড়ী ও সাবানের অভাব হবে না।

—দেখা যাবে।

—বোনেদের বিয়ে দেন নি কেন ? কয়েক মিনিট পরে শর্মিলাই প্রশ্ন করলে। ওর কণ্ঠে বোধহয় পরিহাসের সুর ছিলো ; সুহৃদ ঠিক হৃদয়ংগম করতে পারলো না।

—তোমার মতো মূর্খ রেখে বিয়ে দেয়ার চাইতে একটু লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দেয়াটাই বোধহয় ভালো।

সুহৃদ আবার পাশ ফিরলে সমস্ত বাক্যালাপের শেষে দীর্ঘ এক দাঁড়ি টেনে। ওর ভংগী দেখে মনে হ'লো আর কোনো কথা বলতে কী কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে ও প্রস্তুত নয়। ঘুম এলো অবশেষে; অনেক দূর থেকে; অন্ধকার-সমুদ্র সাঁতরে। সুহৃদ ভুলতে লাগলো শর্মিলার অবস্থিতি। ও যেন ভেসে চলেছে কোথায়, কোন অদৃশ্য দেশে। পরম এক আনন্দে ওর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো। নিমেষের জন্যে ফিরে এলো ওর চেতনা। ও বুঝতে পারলে যে নিজেই ও হাসছে।

এরপর ঘুম আসতে ওর কয়েক মুহূর্ত লাগলো মাত্র।

কয়েকটা দিন কেটে গেলো। মানুষ সঞ্চয় করলে কিছু অভিজ্ঞতা।

বাড়ীতে হৈ চৈ ক'মে এসেছে। আত্মীয়-স্বজনরা ক্রম-অপস্রিয়মান। সুহৃদ আবার লেগে গেছে পড়াতে; সকাল বিকেল দু'বেলাই। রাজশেখরবাবু নিয়মিত অফিসে যান। বেরোবার আগে আত্রেয়ী যথারীতি পানের ডিবেটা তাঁর কোটের পকেটে দিয়ে দেয়; গলার চাদরটা অভ্যাস মতো দেয় একবার ঝেড়ে; গড়গড়ায় ক'লকেটা বসিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। আজও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিয়ে রাজশেখরবাবু নীচু গলায় জিগ্‌গেস করলেন: হ্যাঁ রে বৌমা কোথায়?

—ঘরে।

—কি করছে? কি করে ও সব সময়েই ঘরের ভেতর ব'সে থেকে? ছেলেমানুষ, শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে যে?

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না।

—তোরা বুঝি আলাপ টালাপ করিস না ওর সংগে?

—কথা-বার্তা ও কমই বলে। আত্রেয়ী জবাব দিলে ঃ খেতে ডাকলে রান্না-ঘরে এসে খেয়েই চ'লে যায়। ছোড়দি সেদিন জিগ্‌গেস করেছিলো, তরকারী কেমন হ'য়েছে বৌদি ? মাত্র দুটি কথায় তা'র উত্তর হয়েছিলো, মন্দ নয়।

—যাস্ না ওর ঘরে। রাজশেখরবাবু বললেন ঃ হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আসবি। বলবি, চলো বৌদি তরকারী কুটতে হবে; রান্না দেখিয়ে দিতে হবে, রাঁধতে হবে। বলতে পারিস না তোরা ?

—সেদিন আমি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে। বললাম, চলো বৌদি, একা একা ব'সে কেন সব সময়ে ? তরকারী কুটবে আর গল্প করবে আমাদের সংগে। গেলো। বঁটিখানা দিলাম ওর দিকে টেনে। তরকারী ও কাটলে যতোক্ষণ বসেছিলো। কিন্তু বললে না একটিও কথা। যা' প্রশ্ন করি শুধু তা'রি উত্তর দিয়ে যায় জিগ্‌গেস করলাম, বৌদি তোমার অসুখ করেছে ? বললে, না ; অসুখ কেন করবে ? তুমি বুঝি চুপচাপ থাকতেই ভালো-বাসো ? ছোটদি জিগ্‌গেস করলে। জবাব দিলে, কার সংগে কথা বলবো এখানে ? ছোটদি ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলো, আমরা চাষা নই ; লেখাপড়াও কিছু শিখেছি ; কথা বলবার হ'লে খুব অসুবিধে হ'তো না। ওকে ইসারা করতে তবে থামলো। ছোটদি চ'লে যেতে পরে আমি বৌদিকে বললাম, কিছু মনে কোরো না বৌদি ; ছেলেমানুষ ও।

আত্রেয়ী থামলো। রাজশেখরবাবু গড়গড়ায় ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন। কিন্তু অনর্গল নির্গত ধোঁয়ার সংগে তিনি মানসিক চিন্তাগুলোকে নিষ্কাসিত করতে পারলেন না। উঠে পড়লেন তিনি। অফিসের বোধহয় খানিকটা দেরীই হ'য়ে গেলো। যাবার সময় তিনি বললেন ঃ সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখনো ছেলেমানুষ কি না ?

তপতী গেলো স্কুলে। বেলা হ'য়েছে। বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকে একজন ঠাকুর রাখা হ'য়েছিলো। সে এখনো আছে। আত্রেয়ী এটা পছন্দ করে না। কিন্তু সুহৃদ বললে : দু'দিন আরো থাকতে দে আত্রেয়ী। ও বাপের বাড়ী যাক, তখন যা' হয় করিস। নিজেদের দৈন্য পরের কাছে প্রকাশ ক'রে তো লাভ নেই।

—বৌ পর নাকি? আত্রেয়ী ঠাট্টা ক'রে বললে।

—আপন হ'তে সময় লাগে। সুহৃদ হাসিমুখে উত্তর দিলে।

অপেক্ষা ক'রে ক'রে আত্রেয়ী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সুহৃদ এখনো ফেরে নি। ও অবশ্য প্রায়ই এমনি দেরী করে। হঠাৎ আত্রেয়ীর ঘুম ভেঙে গেলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ও। কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে আন্দাজ করতে পারলো না। সমস্ত বাড়ী নিঃস্তব্ধ; সাড়া শব্দ নেই কোনো দিকে। দাদা কি তাহ'লে এখনো বাড়ী ফেরে নি? আত্রেয়ী পা টিপে টিপে এলো ওদের ঘরে; দরজা ঠেলে দেখলে, সুহৃদ নেই, শর্মিলা ঘুমোচ্ছে। ওর বুকের ওপর একখানা আধখোলা বই। জানলা দিয়ে এসে পড়েছে দুপুরের উগ্র রোদ।

—বৌদি, ও বৌদি! ওঠো, খাবে না আজ?

শর্মিলা চোখ খুললো। কিন্তু ওঠবার কোনো লক্ষণই দেখালে না।

—ওঠো ওঠো, ক্ষিধে পায় নি? আত্রেয়ী বললে।

—পেয়েছে না কি? শ্লেষের সুরে শর্মিলা বললে : আশ্চর্য তো, ক্ষিধে আবার পায় নাকি?

বিদ্রূপ গায়ে না মেখে আত্রেয়ী বললে : চলো চলো, আমরা খাইগে। দাদা তো আজ আসবার নামই করছে না। কোথায় যে যায়?

শর্মিলা উঠে বসলো। সর্বাংগে ওর একটা শ্লথ আলস্য।

আঁচলটা সাব্যস্ত ক'রে নিয়ে ও বললেঃ খেতে তো বলছো, পাপের ভাগ নেবে তুমি ?

আত্রেয়ী বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলো শর্মিলার মুখের পানে।

—বুঝলে না ? সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর আগে খায় না। খেলে পাপ হয়; নরকে যায়। শোনো নি কখনো ? মানো না এসব ? ছুঁচ ফোটাতে চাইলে শর্মিলা।

আত্রেয়ী হাসলো; বললেঃ আচ্ছা, পাপের অংশ আমিই নেবো না হয়। কিন্তু আপাততঃ খেতে তো চলো।

ওরা খেতে গেলো। খাবার সময়ে আত্রেয়ী এটা সেটা গল্প ক'রে চ'লেছে। শর্মিলা অনুভব করলে ওর বিদ্রূপগুলো ব্যর্থ হ'য়েছে। ভালো ক'রে ও কোনো কথারই উত্তর দিলে না; অবশ্য কোনো দিনই দেয় না।

—আর চারটি ভাত দেবে ? আত্রেয়ী জিগ্গেস করলে।

—না, আর দরকার নেই।

—একটু তরকারী ?

—উঁহু।

—অতো কম খেয়ে থাকো কেমন ক'রে ? আত্রেয়ী প্রশ্ন করলেঃ ক্ষিধে পায় না ?

—পায় বই কি, সময় মতো।

—কিন্তু তোমার ঐ খাওয়াতে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার আবার ক্ষিধে পেতো। আত্রেয়ী হেসে বললে।

শর্মিলা বোধ হয় অপেক্ষাই করছিলো। সুতরাং সুযোগ নষ্ট হ'তে না দিয়ে বললেঃ তোমাদের বেশী খাওয়া অভ্যেস।

প্রথমে আত্রেয়ী কথাটা ধরতে পারলে না। কিন্তু খুব দেরীও হ'লো না বুঝতে। এবার ও জবাব দিলেঃ হুঁ; ঘি,

দুধ, মাখন, সন্দেশ তো জোটে না। তবু কিন্তু তোমার চেয়ে আমার স্বাস্থ্যই ভালো মনে হয়।

—মাংস কিছু বেশী আছে সত্যিই।

—গায়ে শক্তিও।

—সবারি শক্তির দরকার হয় না। ঠোঁটে এক অপূর্ব ভংগী এনে শর্মিলা বললে: দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলা কি বাসন মাজার জন্যে অবশ্যই শক্তির দরকার হয়।

কথা যে এ এলাকায় এসে পড়বে আত্রেয়ী সেটা আশা করে নি। অবশ্য অনেক আগে থেকেই ও উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। এতোক্ষণে ফেটে পড়লো।

—কেউ বাসন মাজে, হাঁড়ি ঠেলে সত্যিই। আত্রেয়ী বললে: আর কেউ ড্রেসিং-সোফায় গা এলিয়ে আরসীতে মুখ দেখে আর টয়লেট ও গালের চামড়ার শ্রাদ্ধ ক'রে জীবনের অপচয় করে। কিন্তু আসল তফাৎটা তুমি ধরতে পারো নি দিদি। তফাৎ কোথায় জানো? মনে। মন দিয়েই মানুষের বিচার হয়; আর কিছু দিয়ে নয়। রঙ ফর্সা হ'লেই মন ফর্সা হয় না; বুঝলে?

আত্রেয়ী থালায় জল ঢেলে দিলে। খাওয়া ওর শেষ হ'য়েছিলো। শর্মিলার খানিকটা বাকি ছিলো। তবু আত্রেয়ীর আগেই ও উঠে পড়লো। সমস্ত মুখখানাতে ওর অপমানের রাঙিন্য।

সুহৃদ যখন বাড়ী ফিরলো, তখন প্রায় বিকেল। মুখ দেখে ওর মনে হয় না যে অস্নাত কী অভুক্ত।

—এতো দেরী হ'লো? উৎকণ্ঠার সুরে আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে: খেয়েছো?

—কোথায় আবার খাবো? রাস্তায় ঘাটে কে আর খাবার নিয়ে ব'সে আছে?

—তোমার বন্ধুদের ঠিক রাস্তা ঘাটের লোক ব'লে যে ভাবতে পারি না। হেসে বললে আত্রেয়ী : বলো না কোথায় খেলে ?

—বঙ্কিমদের ওখানে।

—ঠিকই ভেবেছি আমি। আত্রেয়ী বললে।

—ওঃ, কি গণৎকারী ? অমন শোনার পর সবাই ভাবতে পারে। তারপর ? তোরা বসেছিলি ?

—ছিলাম অনেকক্ষণ। বৌদি কিছুতেই খেতে যাবে না ; বললে, উনি না খেতে খাই কি ক'রে ? শেষে অনেক বুঝিয়ে, অর্ধেক পাপের অংশ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে খাওয়ালুম। সত্যিই দাদা, আজকালকার দিনে কিন্তু এমন দেখা যায় না।

সুহৃদ হাসতে হাসতে গেলো নিজের ঘরে। শর্মিলা বসেছিলো সেলাই নিয়ে। ঈজিচেয়ারে হাত পা এলিয়ে দিতে দিতে সুহৃদ বললে : আঃ ; এক গ্লাস জল দাও তো ?

শর্মিলা সেলাইটা রেখে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিলে। গ্লাসটা নিয়ে সুহৃদ বললে : ব্যাপার কি ? এতো গম্ভীর যে ?

শর্মিলা কোনো উত্তর দিলে না। সুহৃদ গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বা'র ক'রে ধরালো। একটা টান দিয়ে বললে : কী হ'য়েছে ?

—কী আবার হ'বে ? শর্মিলা উত্তর দিলো।

—অমন মুখ ভার ক'রে আছো কেন ?

—হাল্কা করতে আর পারছি কই ?

—আসল কথাটাই ব'লে ফেলো না। মেয়েরা এতো হেঁয়ালিও ভালোবাসে।

শর্মিলা কোনই উত্তর দিলে না। সুহৃদ আঁচ ক'রে নিলে, কিছু একটা হ'য়েছে। কিন্তু কিছু হবে কা'র সংগে ? তপতী এখনো বাড়ী ফেরেনি স্কুল থেকে। আত্রেয়ীর মুখ দেখে তো

মনে হ'লো না ওর সংগে কোনো কিছু হ'য়েছে? তা' ছাড়া আত্রেয়ী ঝগড়া করবার মেয়েই নয়। সুহৃদ সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে লাগলো।

কয়েক মিনিট পরে সুহৃদই কথা কইলেঃ কই, জিগ্‌গেস করলে না তো একবারো খাওয়া হ'য়েছে কি না; বা কোথায় ছিলাম এতোক্ষণ?

শর্মিলা আবার সেলাই নিয়ে বসেছিলো। মুখ না তুলেই ও বললেঃ কি আবার জিগ্‌গেস করবো? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে খেয়ে দেয়েই এসেছো। পুরুষ মানুষের খাবার থাকবার জায়গার কখনো অভাব হয় নাকি?

—তবু যদি বলি, এতোক্ষণ পেটে কিছু পড়ে নি। সুহৃদ বললে।

—তাহ'লে কী আর? কিছু খেয়ে নাওগে।

—তাই দাও; খাইনি কিছু।

শর্মিলা বললে না কিছু; অনুযোগ করলে না কোনো। সেলাইটা রেখে দিয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছিলো। সুহৃদ চট্ ক'রে ওর হাতটা ধ'রে ফেলে বললেঃ থাক; যেতে হবে না। অমন অনাদরের দান আমার গলা দিয়ে যাবে না।

—আদর অনাদর কি? ক্ষিদে পেয়েছে, খাবে। শর্মিলা উত্তর দিলে।

—সবাই তো তা' খায়। ওর মধ্যেও কি কিছু বিশেষত্ব নেই? খাদ্যবস্তুটাই প্রধান নয় এখানে। তাহ'লে তো পয়সা দিয়ে হোটেলে খেয়ে এলেই পারতাম। তবে আজ আমি সত্যিই খেয়ে এসেছি। তোমার কাছে শুধু সহজ পাওনাটুকু, সাধারণ ভদ্রতাটুকু আশা করেছিলাম। খেয়েছি কি না, অন্ততঃ একবার জিগ্‌গেস করলে তোমার সম্মানের হানি হোতো না।

সুহৃদ ছেড়ে দিলে ওর হাত। শর্মিলা গিয়ে বসলো নিজের জায়গায়।

—চেষ্টা করেছি তোমাদের এখানে এসে, শর্মিলা কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ বললে : ভদ্রতা শিখতে ; সময় লাগছে একটু আদব্-কায়দাগুলো আয়ত্ত করতে।

সুহৃদ কোনো উত্তর দিলে না ; সিগারেট টানতে লাগলো।

অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এলো। রাস্তায় জল দেয়া শেষ হয়েছে। তপতী এলো স্কুল থেকে। লক্ষ্মণ এলো তাস খেলে পাড়ার লোকেদের সংগে। ওদের আর একটা দিনের অবসান হ'তে চললো।

দিন ওদের এমনি ক'রেই কাটে। যেমন কেটে যায় লক্ষ লক্ষ লোকের ; আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে, সুখ-দুঃখের বিবর্তনে।

শর্মিলার একদিন পিত্রালয়ে যাবার সময় হ'লো। নিয়ে গেলো সুহৃদ নিজে। কয়েকদিন ওকে থাকতে হ'লো সেখানে প্রতাপবাবুর অনুরোধে। মস্ত বাড়ী, অনেক লোকজন। যাবার সময় রাজশেখরবাবু সুহৃদকে বলেছিলেন : কথাটা একবার বলবে নাকি ?

—কিসের ? সুহৃদ জিগ্গেস করেছিলো।

—কিসের আবার ? রাজশেখরবাবু একটু বিরক্তই হ'লেন। তখনি পরিষ্কার ক'রে দিলেন সুহৃদের প্রশ্ন : আত্রেয়ীর একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।

—কোথায় ?

—ভালো পাত্র। ডাক্তারী করে। অবস্থা ভালোই।

—তাহ'লে আর টাকার দরকার কি ? সুহৃদ বললে : ডাক্তারী করে যখন, রোজকারও করে। তারপর বলছেন, অবস্থাও ভালো। ওরা টাকা চাইছে কেন ?

এক মিনিট চুপ ক'রে রাজশেখরবাবু বললেন : অবস্থার সংগে কোনো সম্বন্ধ নেই। যা'দের মেয়ে আছে টাকা তা'দের দিতে হবেই ; অপর পক্ষের টাকা থাক আর নাই থাক ; মেয়ের

বাপ ধারই করুক আর বাস্তুই বন্ধক দিক। সুতরাং আমাদেরো টাকার যোগাড় করতে হবে যেমন ক'রেই হোক।

—বিয়ে দেয়ার এতো তাড়াই বা কিসের? আত্মরক্ষার অন্য পথ ধরলে সুহৃদ : ও-ও তো বলছিলো পড়বে আর আমিও মনে মনে তাই ঠিক করেছিলাম।

—বিয়ে তো দিতেই হবে। চিরকাল কিছু কুমারী থাকবে না; আর তা' সম্ভবও নয়। বয়েস বাড়িয়ে আর লাভ কি? বয়স্কা মেয়েকে সাধারণ লোকে পছন্দও করে না।

এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার সুহৃদের যুক্তি নেই। জটিল প্রশ্নকে ও ভয় করে আর যথাসম্ভব এড়িয়েও চলে। ও জিগ্‌গেস করলে : কতো টাকার দরকার?

—আড়াই হাজার। পণ দিতে হবে দু'হাজার আর বিয়ের খরচ পাঁচশো।

—তা'দের বুঝিয়ে বললে হয় না যে আমরা গরীব?

—সে চেষ্টার ক্রুটী হয় নি। কিন্তু পাত্রের বাবা কিম্বা পাত্র এরা কিছু বোঝে না; বুঝতে চায়ও না। কিছু টাকা বাগিয়ে নেবার এ সুযোগ কেউই ছাড়তে চায় না। আমিই কি ছেড়েছি। তোমায় যে আজ বলতে এসেছি, এও সেই একই কথা।

—কিন্তু আড়াই হাজারের ক্ষেত্রে যে আমরা অত্যন্ত গরীব। উত্যক্ত কণ্ঠে সুহৃদ বললে।

—সেই জন্যেই তা'রা দু'হাজারে রাজীও হ'য়েছে। প্রথমে চাইছিলো চার হাজার।

—টাকাটা ধার করুন; আমি শোধ করবো। সুহৃদ বললে।

—ধার করবো কেন? কি বলছো তুমি? আমি তো ভিক্ষে চাইছি না। ন্যায্য প্রাপ্য এটা আমার। আর ওরা বড়োলোক;

দিতে পারে ; দেবেও বলেছে। আমরা খালি হাত পেতে নেবো। তুমি ভাবছো, কেমন ক'রে হাত পাতবো ? লজ্জা করবে ? কিন্তু ভিখিরীর লজ্জা আর মহানুভবতা কোনো বিলাসই শোভা পায় না। তুমি বেয়াই মশায়কে কথাটা বলবে। বলবে যে, সামনের মাসেই আত্রেয়ীর বিয়ে স্থির হ'য়েছে। সুতরাং এখন থেকেই আয়োজন করা দরকার। স্পষ্ট বলতে না পারো, আভাষ দিয়ো।

রাজশেখরবাবু স্থানান্তরে গেলেন।

সুহৃদ শর্মিলাকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে এসেছে তিন দিন হ'লো স্ত্রীকে রেখে ও ফিরে যাবে ভেবেছিলো ; কিন্তু অনুরোধে প'ড়ে থাকতে হ'লো ওকে। প্রতাপবাবুর সংগে কয়েকবারই ওর কথা-বার্তা হ'য়েছে। কিন্তু টাকার কথা ও বলতে পারে নি ; পারবেও না। আদর-যত্নের ত্রুটী নেই। সবারই ব্যবহারিও ভালো। দু'দিন সত্যিই ও সংকুচিত হ'য়ে ছিলো। এখন কেটে গেছে সে ভাবটা। ক্রমশঃ ছয় দিন হ'য়ে গেলো। ওখান থেকেই সুহৃদ পড়াতে যায় ; পড়িয়ে আসে। নিজেদের বাড়ীও গিয়েছিলো দু' দিন। আত্রেয়ী ওকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলো, স্থায়ী বন্দোবস্ত করলে নাকি ?

—দূর ! সুহৃদ বলেছিলো ঃ প্ল্যান্ আছে কাল পরশু এসে পড়ছি।

রাজশেখরবাবু জিগ্‌গেস করেছিলেন ঃ বলেছিলে টাকার কথাটা ?

—সুবিধে পাই নি। আজই বলবো।

—এই এক সপ্তাহের মধ্যে সুবিধে পেলে না তুমি ? রাজ-শেখরবাবুর মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠেছিলো।

সুহৃদ ভালো ভাবেই জানে যে ও-কথা সে নিজে কখনো বলতে পারবে না ; কখনোই না। একবার ভাবলে, শর্মিলাকে

বলবে। কিন্তু তখনি অনুভব করলো, হয়তো শর্মিলার পিতাকে বলা সহজ; কিন্তু শর্মিলাকে নয়।

—আপনিই একদিন, সুহৃদ প্রস্তাব করেছিলো: যাবেন ওখানে। আপনি বললেই ভালো দেখাবে।

—তাই যেতে হবে দেখছি। কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন রাজশেখরবাবু।

আজ রাত্রে সুহৃদ বললে: কালই পাত্‌তাড়ি গুটোচ্ছি এখান থেকে।

—কেন? অদ্ভুত গ্রীবা ভংগী ক'রে শর্মিলা বললে: এখানে তোমার অসুবিধে হ'চ্ছে কিছু?

শর্মিলাকে এই রাত্রে দেখাচ্ছে অপূর্ব সুন্দরী। সুন্দরী, বসন্তের বনানীর মতো। কর্ণাভরণে ওর ঠিক্‌রে পড়ছে বৈদ্যুতিক আলো; শাড়ীর ঝল্‌মলে পাড় কাঁপছে বাতাসে।

—কেন কী? সুহৃদ বললে: শ্বশুড়বাড়ীতে আর লোকে ক'দ্দিন থাকে? তা'ছাড়া বাড়ীতেই বা সবাই ভাবছে কি?

—কী আবার ভাববে? মিষ্টি হেসে শর্মিলা বললে: যাবেই তো; যতোদিন ধ'রে রাখা যায়।

—এখানে তো চমৎকার তুমি। সুহৃদ বললে: বাড়ীতে অতো গম্ভীর থাকো কেন? কথা বললে পাঁচটা, উত্তর দাও একটা।

—কেন জানো? স্বরে আকর্ষণ ঢেলে শর্মিলা বললে: ওখানে তুমি অন্যান্য সকলের এবং আমারও। আর এখানে তুমি আর কারো নও, একান্তভাবে আমারই। শর্মিলা ওর একখানা হাত তুলে নিলে নিজের হাতে।

শর্মিলা যে এমন চমৎকারভাবে কথা বলতে পারে সুহৃদ সে তথ্য আজই প্রথম জানলে। মুগ্ধ হ'লো ও। আদর ক'রে শর্মিলাকে টেনে নিলে বুকের কাছে। ঠিক এই মুহূর্তেই ওর

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। শর্মিলাকে ছেড়ে যে ওকে একা থাকতে হবে, এ-কথা ভাবতেই ও মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো। স্ত্রীর ওপর ওর যে এতো দুর্বল মমতা—একথা আজ জেনে আশ্চর্য হ'য়ে গেলো সুহৃদ। কোথায় ছিলো শর্মিলা আর কোথায় ছিলো ও। দু'জনে মিলিত হ'লো এক বিশিষ্ট দিনে; দু'জনের জীবন-পথ হ'য়ে গেলো এক, অবিচ্ছিন্ন। দু'জনের মিলিত আত্মা একই লক্ষ্যের পানে আজ থেকে যাত্রা ক'রেছে। এ সব কথা সুহৃদ এর আগে ভাবে নি কখনো। ও গাঢ়কণ্ঠে ডাকলে: শর্মিলা!

শামলা নীরবে উপভোগ করছিলো স্বামীর আদর। ছোট্টো ক'রে সাড়া দিলে: উঁ। ঘুম ভেঙে ওঠার মতো ভংগী ওর।

—কাল সত্যিই আমাকে যেতে হবে। সুহৃদ বললে: কিন্তু যাবো কেমন ক'রে তাই ভাবছি। শর্মিলার গালের ওপর মুখ-খানা রেখে বললে: তুমিও চলো, মিলি।

—থাকো না আরো কয়েকটা দিন। শর্মিলা বললে: তারপর আমাকেও তোমার সংগে নিয়ে যেয়ো। ও জানে ওর মা বাবা ওকে যেতে দেবেন না। আর নিজেরো যাওয়ার বিন্দু-মাত্র আগ্রহ নেই।

সুহৃদ অবশ্য একথা জানে না। কারণ শর্মিলা যত্নসহকারেই লুকিয়ে রেখেছিলো স্বামী-গৃহের প্রতি ওর এই উৎকট বিতৃষ্ণা এবং এর সহজ সমাধান।

—তুমি এসেছো বাপের বাড়ী। সুহৃদ বললে: অতো তাড়াতাড়ি তোমাকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সেটা ভালোও দেখাবে না।

শর্মিলা নিঃশব্দে হাসলো। সুহৃদ বুঝতে পারলে না।

পরদিন কিন্তু সুহৃদের যাওয়া হ'লো না। তারপরদিনও না। ও জানে, এতোদিন ওর এখানে প'ড়ে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয়;

কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হ'য়ে ওঠে না। বাবার কাছে, বোনেদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে যে ও সংকুচিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু তবু এটুকু পথ অতিক্রম করবার ওর ইচ্ছা নেই যেন। বিস্মিত হ'লো সুহৃদ।

আর শর্মিলা নারী-সুলভ একটা হীন অহংকার বোধ করলে।

বিকেলে প্রতাপবাবু সুহৃদকে বললেন : শোনো বাবাজী! আজকাল ছেলেদের শ্বশুরবাড়ী এসে দু'দিন থাকতে অপমান হয়। কিন্তু তুমি যে রইলে এ ক'দিন, এতে আমরা অত্যন্ত সুখী হ'য়েছি। আরও কিছুদিন থাকলে আরো সুখী হবো। নিজের বাড়ী আর শ্বশুর-বাড়ীতে তফাৎই বা কোনখানে ? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের অফিসে একটা ভেকেন্সি হ'য়েছে। একটা দরখাস্ত লিখে কাল দিয়ো আমার হাতে। সামনের মাস থেকেই য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট হবে। মন দিয়ে কাজ কোরো। আমারো রিটায়ার করবার সময় হ'য়ে এলো। যেন তোমাকে আমার চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারি। তুমি অবশ্য ধ'রে নিতে পারো যে, চাক্‌রী তোমার হ'য়ে গেছে। সংসারে দাঁড়াতে পেরেছো শক্ত হ'য়ে দেখলেই আমাদের সুখ।

সুতরাং কালও সুহৃদের যাওয়া হয় না। তাহ'লে প্রতাপবাবু ভাবতে পারেন, চাকরীর খবরটি বাগিয়েই ছোঁড়া বাপের বাড়ী পিট্টান দিলে। সুহৃদ মনে মনে এ বাড়ী ছাড়বার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠলো। চাকরীটা পাওয়ার জন্যে ও আনন্দিত সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকতর সুখী হ'তে পারতো ও যদি নিজের চেষ্টাতেই চাকরীটা জোগাড় করা যেতো। ওর মনের অতলে উদয় হ'লো সত্যিই বুঝি বা ও অপদার্থ। কিন্তু উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সভ্যতার যুগে যোগ্যতার মূল্য নেই ; দাবীর বিচার নেই। জীবনকে দরিদ্র সংসারে টিকিয়ে রাখতে হ'লে ঘুষ চাই ; ঘুষ—টাকার, পরিচিতির, আত্মসম্মানের।

কিন্তু সন্ধ্যার কাছাকাছি আর এক বিপর্যয় ঘটলো। রাজশেখরবাবু স্বয়ং এসে উপস্থিত। সংবাদটা সুহৃদ যখন জানলে তখন দুই বৈবাহিকে আলাপ-আলোচনা জমে উঠেছে। সুহৃদের মনে ও মগজে তখন তোলপাড় চলেছে! যদিই ও কোনো রকমে বাবাকে জানিয়ে দিতে পারতো যে আপাততঃ টাকার কথাটা উল্লেখ না করাই ভালো; কারণ যিনি এতোখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে ওর জীবনের একটা সংস্থান ক'রে দিয়েছেন, তাঁর কাছে টাকা চাওয়াটা……কিন্তু আর সময় ছিলো না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সুহৃদ শুনতে পেলো, ওর বাবা বলছেন, দেখুন, বলতাম না আপনাকে। আপনাকে এর জন্যে তাগাদা দেয়াটা অভদ্রতা বুঝতে পারি। কিন্তু আত্রেয়ীর বিয়ের প্রায় সব ঠিক। কোনো জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করতে পারলুম না। দু'হাজার টাকা ওদের দিতে হবে যে ক'রেই হোক। তবে ছেলেটি উপযুক্ত। হাত-ছাড়া হ'য়ে গেলে অমন পাত্র সহজে পাওয়া যাবে না। গরীবদের মেয়ে থাকার মতো দুর্ভাগ্য সংসারে আর নেই।

প্রতাপবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না। রাজশেখরবাবু আশ্চর্য হ'লেন। ব্যাপারটা কি? ভদ্রলোক যে কথাই বলে না?

—আজ দিতে না পারেন, রাজশেখরবাবু তাঁর শেষ বাণ নিক্ষেপ করলেন: পরের সপ্তাহে দেবেন। অত্যন্ত প্রয়োজন। বুঝছেন তো? না হ'লেই চলবে না।

ওঁর কণ্ঠে যে কাতরতা ফুটে উঠলো, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সুহৃদ তা অনুভব ক'রে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে।

—য়্যাঁ, কি বলছেন? অবশেষে প্রতাপবাবু মুখ তুললেন।

রাজশেখরবাবু চমকে উঠলেন। পরমাণু মাত্র সহৃদয়তা নেই ওঁর মুখে। শুধু প্রার্থনা; কাতর করুণা-ভিক্ষা।

—বলছিলাম, টাকাটা তো না পেলে আর চলছে না। কোনো রকমে পুনরায় আবৃত্তি করলেন রাজশেখরবাবু। এ ছাড়া ওঁর গত্যন্তর ছিলো না।

—কিসের টাকা? প্রতাপবাবুর কপালটা বেশ কুঞ্চিত হ'লো।

—কেন? খোকার বিয়ের পণের টাকাটা। আপনি তো নিজেই দিতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন।

—ও·····নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখুন, বড্ডো টানাটানি যাচ্ছে এখন। টেবলের ওপর যেন কিছু খোঁজবার জন্যেই প্রতাপবাবু অকারণে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ডুবে যাওয়ার সময় শেষ আশ্রয়ের প্রতি রাজশেখরবাবু হাত বাড়ালেন: বেশ তো। তিনি বললেন: আজ দিতে না পারেন দু'দিন পরেই দেবেন। আমি কি আর আপনাকে তাগাদা দেবো?

—শুনেছেন? মুন্সিয়ানার সুরে প্রতাপবাবু বললেন: বাবাজীর একটা ভালো চাকরী ক'রে দিলাম আমাদের অফিসে?

—তাই নাকি? রাজশেখরবাবু আনন্দিত হ'লেন অত্যন্ত; কিন্তু সে আনন্দ অপ্রকাশ রেখেই শুধু বললেন: ভালোই হ'লো। এবারে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'লো। প্রতাপবাবু আরেকবার তামাকের জন্যে আদেশ করলেন। তামাক এলো। চক্রাকার ধোঁয়ার অজস্রতায় প্রতাপবাবুর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রাজশেখরবাবু মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে; দুশ্চিন্তার প্রচণ্ড দাপাদাপি চলেছে বুকের মধ্যে; দৃষ্টিতে গভীর অসহায়তা।

—দেখুন, নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রে গড়গড়ার নলটা এগিয়ে ধ'রে অকস্মাৎ প্রতাপবাবু বলে ফেললেন : টাকাটা আর দিতে পারবো না।। দুঃখিত এর জন্যে। কিছু মনে করবেন না।

এতোটা রাজশেখরবাবু আশা করেন নি। তিনি বজ্রাহত হ'লেন। সমস্ত মুখখানা তাঁর সাদা হ'য়ে গেলো।

চাল্

সুহৃদ নিজেদের বাড়ী এলো। রাজশেখরবাবুর সংগে দেখা করবারও সাহস নেই ওর। পাছে দেখা হ'য়ে যায়, এই ভয়ে ও পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ও তাঁদের কথা-বার্তা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলো। রাত্রে আহারের পর রাজশেখরবাবু বললেন: দেখো, ওরা লোক ভালো, এই ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এমন ব্যবহার করবে আশা করি নি।

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ওঁর দেবার ইচ্ছে ছিলো। সুহৃদকে বলতে হ'লো: হয়তো নানা কারণে দিতে পারছেন না।

—তুমি জানো না। গোড়া থেকেই এমন একটা মতলব উনি এঁটে রেখেছিলেন। নতুবা ওঁদের মতো বড়োলোকের কাছে দু'তিন হাজার টাকা কিছুই নয়—সেটা ভেবে দেখো।

—কিন্তু...ঢোক গিলে নিয়ে সুহৃদ স্ত্রী-পক্ষের ওকালতি করলে: লোকই যদি খারাপ হয়, তাহ'লে আমার জন্যে এতো চেষ্টা ক'রে কি চাকরী জোগাড় করতেন?

—চাকরী জোগাড় করতে তো তাঁর কিছুই খরচ হয় নি। এ কথা তিনি জানেন যে, তোমার একটা সুরাহা মানে তাঁর মেয়েরই একটা বন্দোবস্ত। কিন্তু আমার সংগে তাঁর সম্বন্ধ কি? আমার বিপদে তাঁর ছুটে আসবারো কিছু নেই; আমার সুখে আহ্লাদ করবারো তাঁর নেই কিছু। তাঁরই হাতে চাকরী খালি ছিলো; মেয়ের মুখ তাকিয়ে সেটা তোমায় ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। খুব বড়ো কথা নয় এটা। কিন্তু মিথ্যে ব্যবহার দিয়ে আমাকে তিনি কী বিপদে ফেললেন, একটু ভেবে দেখো তো?

সুহৃদ উত্তর দিলে না। উত্তর দেবার ওর নেইও কিছু। নিজেকেই ওর অপরাধী মনে হ'তে লাগলো।

রাত্রি গভীর হ'লো। চারিদিক নিস্তব্ধ। লক্ষ্মণের বাসন মাজা শেষ হ'য়েছে। ও গেছে শুতে। সুহৃদ মন্থর পায়ে নিজের ঘরে গেলো। বাতি নিভিয়ে দিয়ে ও শয্যা গ্রহণ করলে। সমস্ত দিন শর্মিলার কথা কিছু মনে পড়ে নি। কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে একাকী বিছানায় শুয়ে ওর মনে বিরহের কাঁটা অসহ্য হ'য়ে বিঁধতে লাগলো। অদ্ভুত; যে ক'দিন ও শর্মিলার কাছে ছিলো, তার অবস্থিতি সুহৃদের মনে বিশেষ কোনো মূল্য পায় নি। তা'কে ও গ্রহণ করেছে অবারিত ভাবে; যখন যে ভাবে পেয়েছে; যখন যে ভাবে শর্মিলা ওকে দিয়েছে। কিন্তু সে যে ওর সমস্ত মন জুড়ে ছিলো এ কথা সুহৃদ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। এখনো শর্মিলা রয়েছে ওকে বেষ্টন ক'রে। শর্মিলার চুড়ির টুং টাং শব্দ এখনো ওর বুকের মধ্যে বাজছে, শাড়ীর খস্‌খসানি এখনো ও পাচ্ছে শুনতে। শর্মিলার দেহ-সুগন্ধি এখনো দূর হয়নি ওর দেহ থেকে। শর্মিলার চুলের উগ্র গন্ধ এখনো ও অনুভব করছে নিঃশ্বাসের সংগে। বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র; আকাশে তারার স্পন্দন; ঝিঁ-ঝির কম্প্রমান সুর অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হ'চ্ছে। সুহৃদের চোখে ঘুম নেই। অথচ কয়েক ঘণ্টা মাত্র অতিবাহিত হ'য়েছে ও শর্মিলার কাছ ছাড়া আর ব্যবধানও ওদের মাত্র সাড়ে তিন মাইল পথ। শর্মিলা কি জেগে আছে এখনো? জেগে জেগে ভাবছে ওর কথা? মেয়েরা কি ভাবে? ওরা কি একাকিনী রাত জাগে? অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকে চুপ ক'রে? সুহৃদ জানে না। শর্মিলার অন্তরও কি ভারাক্রান্ত? ব্যথায় ম্রিয়মান? এখনো কি জেগে সে? প্রথমে ও ভেবেছিলো শর্মিলার ওখানে পুনরায় যাবে একেবারে শর্মিলাকে আনবার সময়; তা'র আগে আর নয়। কিন্তু অ-তো দি-ন? সে কি সম্ভব?

সুহৃদ ঘুমিয়ে পড়লো।

দাওয়ায় ব'সে রাজশেখরবাবু তখনো গড়গড়া টানছেন। কখন যে আগুন নিভে গেছে সেদিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওঁর চোখের ওপর অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। সামনে কামরাঙা গাছের শাখা বাতাসে দুলছে। ঐ কামরাঙা গাছের নীচে কতো দিন—কতো দিন রাজশেখরবাবু দেখেছেন তা'কে; দেখেছেন কতো অবস্থায়। আজ সে কোথায়? সে কি জানে আ-জো রাজশেখরবাবু তা'র কথা ভাবেন? ওঁর চোখ ছাপিয়ে জল ঝ'রে পড়ে। কোথায় আছে সে? মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? মৃত্যুতেই কি সব শেষ? জীবনের সমাপ্তি? হয়তো কে জানে মৃত্যুর পর একদিন তা'র সংগে দেখা হ'তে পারে। জীবনের এই পরিক্রমায় মানুষ কি চেনে মানুষকে? প্রিয়া কি চিনতে পারে প্রিয়কে? মায়া কি পারবে ওঁকে চিনতে? কে জানে?

—বাবা।

রাজশেখরবাবু চম্‌কে উঠলেন। পাশে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ী। স্নিগ্ধ কণ্ঠে ও প্রশ্ন করলে: এখনো শোওনি যে?

কি উত্তর দেবেন, রাজশেখরবাবু ভেবে পেলেন না। কিছু বলতে হয়, তাই বললেন: এখনি ঘুম আসছে না।

আত্রেয়ীও এতোক্ষণ জেগেছিলো বিছানায়। ঘুমের সংগে ও রীতিমতো যুদ্ধ করেছে। কিন্তু কেমন ক'রে ঘুমোবে ও? ও যে অনুভব করতে পারে, দাওয়ায় শুয়ে স্নেহাতুর বৃদ্ধ পিতা অতন্দ্র রাত্রি অতিবাহিত করছেন—এর মূলের বিরাট সমস্যা ও নিজে। আত্রেয়ী জানে এটা ভালোভাবেই। আর তাই ওর চোখে আজ ঘুম নেই।

আত্রেয়ী বললে, বললে করুণ ক'রে: বাবা, আমি দুঃখিত যে তোমাদের সংসারে আমি রীতিমতো একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। কেন তোমরা দিন-রাত আমার জন্যে ভাবো,

বাবা? বিয়ে না হয় নাই হবে। ঐ একটি মাত্র পথ ছাড়া মেয়েদের আরো তো পথ র'য়েছে। আমার বিয়ের জন্যে ধার-কর্জ ক'রে তোমরা ডুববে, সে আমি কিছুতে হ'তে দেবো না, বাবা।

—না, না। ডুব্‌বো কেন? রাজশেখরবাবু আত্রেয়ীকে এমন ক'রে কথা বলতে শোনেননি কখনো। নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলেন তিনি। কন্যার শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বরে তিনি বিস্মিত হ'লেন। রাজশেখরবাবু ভাবলেন, কোনো রকমে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া যায় কি না। না; কোনো উপায় উনি পেলেন না। অবশেষে সহজ সমাধানের মতোই বললেনঃ সুবিধে মতো পাত্র পেলেই দেবো তোর বিয়ে। ধার সামান্য কিছু করতে হবে মনে হ'চ্ছে; কিন্তু উপায় নেই। খোকার শ্বশুরের কাছে টাকাটা পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম—তা'ও হ'লো না। ভদ্রলোক যে আমায় অমন ক'রে ফাঁকি দেবেন তা' কল্পনায়ও আনতে পারি নি।

টাকাটা যে ওর বাবা উক্ত উপায়ে সংগ্রহ করতে পারেন নি এতে আত্রেয়ী যথেষ্ট আনন্দিত। ঐ টাকা যে ওরই বিয়ের জন্যে তিনি নিচ্ছেন, এ কথা ভাবতেও আত্রেয়ী অপমানে মতাশির হ'য়ে আসে।

—কেন তুমি অতো ভাবছো? লঘুকণ্ঠে অনুযোগ করলে আত্রেয়ীঃ আজকাল কতো মেয়েই তো বিয়ে না ক'রে আছে। কতো মেয়ে স্বাধীন ভাবে রোজগার করছে; ভাই-বোনদের মানুষ করছে; বাপ-মায়ের কষ্ট লাঘব করছে। সংসারে এ-সব কাজের কি কোনো মূল্যই নেই, বাবা?

রাজশেখরবাবু নীরব রইলেন।

রাত্রি গভীর হ'লো।

—ওঠো, বাবা। চলো, শুতে যাবো। অনেক রাত হ'লো।

শয্যাগ্রহণ ক'রে আত্রেয়ীর আবার সেই যন্ত্রণা। ঘুমের লেশ মাত্র নেই। পাশের বিছানায় তপতীর গভীর নিশ্বাসপতন শোনা যাচ্ছে। চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো ও। ওর মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তার সূত্রগুলো মাকড়সার মতো জাল পাকাতে লাগলো। সেই জটিলতার মধ্যে বারবার ও হারিয়ে ফেলছে নিজের গতি। দু'হাতে চিন্তার সূতোগুলো ও ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগিয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু সীমা পেলে না। এ সংসারে ওর কর্তব্য কতোটুকু ? নিজের প্রতি আর অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি ? ওর নিজের দাঁড়াবার স্থান কোথায়, যেখানে ও নির্ভয়ে অবস্থান করতে পারে ? এমনি সংকীর্ণ পথেই চিরকাল কি ওকে সাবধানে, সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হ'বে ? বিশ্বশুদ্ধ মেয়েদের কি এই একই পথ ? নিজের এই জীবন নিয়ে কী করবে ও ? কী করবে ? বাইরে নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বারবার বলতে লাগলো আত্রেয়ী ঃ কী করবে ও ? বাবা তো চিরকালের আশ্রয় নন্ ; ভাইও নয় ; তবে কোথায় ওর আশ্রয় ? বিছানা ছেড়ে উঠে ও জল গড়ালে। উঠোনে এসে হাল্কা পায়ে পায়চারী করলে কতোক্ষণ। আকাশে তারাগুলো মিট্ মিট্ করছে ; কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝংকার ; অন্ধকারের হৃৎপিণ্ডের মতো সুপুরিগাছের পাতাগুলো দুলছে।

আত্রেয়ীর মনে পড়লো অকস্মাৎ অজিতের কথা। অজিত। ওর কুমারী জীবনের প্রথম রাজপুত্র ; তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া হাঁকিয়ে যে এসেছিলো ওর কাছে। রাজপুত্র বলেছিলো ঃ ওকে ভালোবাসে। পরিচ্ছদ ছিলো তা'র রাজপুত্রের ; মন কিন্তু ছিলো না। সে কি বাস্তবিক ওকে ভালোবেসেছিলো ? সে কি ওকে নিয়ে যেতো সমস্ত দুঃখের সাগর অতিক্রম ক'রে ? কে জানে, হয়তো সে ভালোই বেসেছিলো ; কিন্তু আত্রেয়ীর সময় ছিলো কোথায় ? এক মিনিট ওর সময় ছিলো না থমকে

দাঁড়াবার কিংবা পশ্চাতে ফিরে তাকাবার। কঠিন দায়িত্বের আবর্ত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছিলো। এখনো কি অজিত ওকে ভালোবাসে? ভালোবাস্‌তে পারে ওরা এতোদিন? আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রে তা'র কথা মনে পড়ছে ওর বারবার, কথা বলবার সময় যা'র গলা কেঁপে কেঁপে উঠতো।

আত্রেয়ী শুতে এলো। রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

কয়েকটা দিন কেটে গেলো।

সুহৃদ ওর নতুন চাকরী আরম্ভ করেছে। মানসিক অবস্থা ভালোই। প্রায়ই অফিস থেকে ও একবার শ্বশুরালয় ঘুরে আসে। বোনেরা জানে, দাদার অনেক কাজ, বাড়ী ফিরতে তাই রাত্রি হয়। শর্মিলা ওকে থাকবার জন্যে অনুরোধ করে। অনুরোধ করেন ওর মা এবং বাবা। কিন্তু সুহৃদ থাকতে পারে না।

—চক্ষুলজ্জা একেবারে বিসর্জন দিতে পারি না; জানো? সুহৃদ শর্মিলাকে একদিন বললে: এখানে তো থাকতে বলছো। কিন্তু নিজের বাড়ী কি নেই আমার? ওরাই বা কি ভাববে?

—কি? শর্মিলা প্রশ্ন করলে।

—বলবে, ভেড়া; বৌ ভেড়া বানিয়েছে। সুহৃদ না হেসে পারলে না।

—সে-কথা শুনতে তো তোমাদের ভালোই লাগে। শর্মিলা পরিহাস-কণ্ঠে বললে।

—সবাইর আত্ম-সম্মান-বোধ তো আর সমান নয়।

—শ্বশুরবাড়ী কয়েক দিন থাকলে আত্মসম্মান এমন কিছু ক্ষুণ্ণ হ'বে না।

—সে তুমি বুঝবে কি? গরীব হ'লেও সম্ভ্রম খোয়াতে পারিনে।

—অতো সম্ভ্রম আবার কিসের? এবার শর্মিলা দংশন করবার সুযোগ ত্যাগ করতে পারলে না: নিজে একটা চাকরী পর্যন্ত তো জোটাতে পারো নি। বোনগুলো মুখভার ক'রে ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে।

—সুখী হ'লাম তোমার মনস্তত্ত্ব-বিদ্যার পরিচয় পেয়ে। বিয়ে না হ'লে যদি মেয়েরা মুখ ভার ক'রে থাকে, তো তুমিও বেশ দীর্ঘ দিনই মুখ ভার ক'রে কাটিয়েছো বুঝতে হবে। সাবালিকা তুমিও বহুপূর্বেই হ'য়েছো। কিন্তু মুখ ভার ক'রে না থেকে সে সময়টা একটু লেখা পড়া-করলে পারতে; মনটা ভদ্র হ'তো।

সুহৃদ সেদিন রাগ ক'রে চ'লে এসেছিলো। সপ্তাহ-খানেক আর ও-পথে পা বাড়ায় নি। কে জানে, হয়তো শর্মিলা ওকে একখানা চিঠিও লিখতে পারে। এমন কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু চিঠি শর্মিলা লেখে নি। চিঠি লিখলেন রাজশেখরবাবু শর্মিলার বাবাকে, ওকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানিয়ে। তবু শর্মিলা এলো না, অথবা ওর বাবা ওকে পাঠালেন না। টাকাটার কথা রাজশেখরবাবু আর উল্লেখ করেন নি। টাকা যে পাওয়া যাবে না, এটা তিনি নিশ্চিত জানতেন। অনর্থক বিরোধ বাধিয়ে লাভ নেই আত্মীয়-কুটুম্বের সংগে।

কিন্তু আসল কথা এই যে, শর্মিলাকে ওঁরা পাঠালেন না। রাজশেখরবাবু আশ্চর্য হ'লেন; সুহৃদ বিস্মিত হ'লো। সুহৃদও মনে মনে ত্যাগ করলে সমস্ত সংস্রব; আহ্বান না এলে ও আর মুখ ফেরাচ্ছে না। দিন কাটতে লাগলো। সাড়া-শব্দ নেই কোনো পক্ষে। অবশেষে সুহৃদই একদিন অফিস-ফের্তা পা টিপে টিপে স্ত্রী-সন্দর্শনে উপস্থিত হ'লো। শর্মিলা এ অবেলায়ও ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ দেখে মনে হয় আকৃতি কিঞ্চিৎ স্থূল হ'য়েছে। চিবুকের নীচে মাংসাধিক্যটা আকর্ষণীয়। কিন্তু খোলা চুলে

ওকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। কপালে মুক্তোর মতো কয়েক বিন্দু ঘাম। সুহৃদ কী করবে বুঝতে না পেরে কয়েক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। এ অসময়ে বাড়ীতে নেই কেউ। মেয়েদের নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রা ভাঙতে এখনো কিছু দেরী। সুহৃদ দেখতে লাগলো শর্মিলাকে অভিভূত দৃষ্টিতে, আত্মবিস্মৃত হ'য়ে। ও যেন আজই প্রথম দেখছে তা'কে। দেখছে; মানে উপভোগ করছে দৃষ্টি দিয়ে। সুহৃদ অসংযত হ'য়ে উঠলো। নিদ্রারতার আরক্ত ঠোঁট দুটোকে ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে লোভাতুর হৃদয়ের সেই আবহমানকালের নিবেদন রেখে দিলে সেখানে। শর্মিলার ঘুম ভেঙে গেলো। সমস্ত শরীরে শ্লথ আলস্য নিয়ে ও উঠে বসলো। ঠোঁটের বাম কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে বললে : কী? রাগ কমলো?

—রা···গ? করেছিলাম না কি? সুহৃদ রহস্য করলে

শর্মিলা গুছিয়ে নিলে বুকের কাপড়টা। বললে মিষ্টি ক'রে : বেশ নির্ভাবনায় ছিলে এতো দিন; না?

—একটি মাত্র ভাবনা ছিলো, কেমন ক'রে তোমায় কাছে, আনবো। শেষে বাবা চিঠি লিখলেন। তুমি গেলে না। আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে কি তোমার মন টেঁকে না? সত্যি ক'রে বলো।

—আশ্চর্য! শর্মিলা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে : তুমি এ কথা ভাবতে পারো? যেখানে তুমি, আমার স্বর্গ সেইখানেই কিন্তু ভা-রী কষ্ট হয় মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে। জানি, তোমার কাছেই আমায় যেতে হবে। যতো দিন পারি এঁদের কাছে থেকে নিই। তুমি পুরুষ মানুষ; যখন খুসী আসতে পারো আমার কাছে। আমি তো আর তা' পারবো না; যতোই মন কেমন করুক মা-বাবার জন্যে। ঘটনা এই। আর এরই জন্যে তুমি আমায় ত্যাগ ক'রেছিলে?

—ত্যাগ ? তোমাকে ? কেউ পারবে এ পৃথিবীতে ? স্ত্রীর মনোরঞ্জন করলে সুহৃদ।

শর্মিলার অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো কথাই খুঁজে পেলে না সুহৃদ। ঠিকই তো বলেছে শর্মিলা। ওকেই যদি বলা হ'তো নিজের বাড়ী ছেড়ে অন্যের বাড়ীতে থাকতে, ওই কি পারতো ? পারতো না কখনো। তবু তো শর্মিলা ওর কাছেই যাবে; ওর সংগেই বরণ করবে দারিদ্র্য এবং অভাব; দুঃখ আর গ্লানি। ও শর্মিলাকে দু'হাতে কুড়িয়ে নিলে বুকের মধ্যে। ততোক্ষণে শর্মিলার চোখ থেকে ঘুম গেছে হারিয়ে।

সুহৃদকে এ-যাত্রা থাকতে হ'লো কিছু দিন। যেতে ও পারলে না। ওখান থেকেই অফিস করে। দু' দিনের বদলে কাটলো চার দিন, আট দিন। সেদিন অকস্মাৎ লজ্জিত হ'য়ে বাড়ী ফিরলে ও। বোনেরা করলে ঠাট্টা। কিন্তু রাজশেখরবাবু সন্ধ্যার সময়ে ওকে দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না; বললেন: সম্মান-বোধটা নিজের ভালোভাবেই হারিয়েছো দেখছি। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট্ ক'রে শ্বশুরবাড়ী কাটিয়ে এলে সাত দিন।

যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে সুহৃদ বললে: ওর শক্ত অসুখ। ডাক্তাররা প্রায় একরকম আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। এ ক'দিন খুব বাড়াবাড়ি গেছে। বিশ্রীভাবে আট্‌কে পড়েছিলাম; তাই সংবাদ দিতে পারি নি।

—বলিস কি ? রাজশেখরবাবু চমকে উঠলেন: এতো সব ব্যাপার ইতিমধ্যে হ'য়ে গেলো, অথচ কিছুই জানলাম না আমরা ?

—ঘটনাটা খুবই আকস্মিক। আমাকে খবর দিয়েছিলো অফিসে। গিয়ে দেখি, সব প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। নাড়ি পাওয়া যাচ্ছিলো না তখন।

—এখন কেমন আছে ? আশংকাটা কেটেছে কি না ? ডাক্তারেরা কি বলেন ?

—হ্যাঁ, ধাক্কাটা সামলেছে, মনে হয়।

—দেখো দেখি, বাপু। আমার তো একবার দেখে আসা উচিত। প্রায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন রাজশেখরবাবু।

এ দিকটা ভেবে দেখে নি সুহৃদ। তিনি যে দেখতে যেতে পারেন সে-কথা ওর মনে হয় নি একবারো।

—হ্যাঁ, না হ্যাঁ, তা' যাবেন। কিন্তু এতো তাড়া কিসের ? অফিস-ফের্‌তা একবার ঘুরে এলেই হবে। যেন আশ্রয় খুঁজতে লাগলো সুহৃদ।

—তাই যাবো। বললেন রাজশেখরবাবু।

সুহৃদ দুপুরে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। পাড়ার আরো কয়েকটা মেয়ের সংগে শর্মিলা তাস খেলছিলো।

—সর্বনাশ হ'য়েছে। তা'কে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুহৃদ বললেঃ এখানে কয়েক দিনই ছিলাম বাড়ীতে কোনো খবর না দিয়ে। পাছে অপ্রীতিকর কিছু কথা ওঠে, তাই ব'লে ফেলেছি, তোমার ভীষণ অসুখ, সুতরাং কয়েক দিন থেকে যেতে হ'য়েছে। শুনেই বাবা বললেন, আজ অফিস-ফের্‌তা তোমায় দেখতে আসবেন।

—এ-ই ? হেসে বললে শর্মিলাঃ তোমায় অতো ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি সব ঠিক ক'রে নেবো।

সুহৃদ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে এলো।

রাজশেখরবাবু অফিস-ফের্‌তা শর্মিলাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন সন্ধ্যা ছ'টা। প্রতাপবাবু তখনো বাড়ী ফেরেন নি। অবশ্য সেজন্যে কিছু আটকালো না। রাজশেখরবাবুকে সরাসরি শর্মিলার ঘরে নিয়ে আসা হ'লো। রোগী

তখন ঘুমোচ্ছিলো মশারীর ভেতর। সংবাদ নিয়ে উনি জানতে পারলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই; ডাক্তার আশা দিয়ে গেছে, দু'এক দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে।

সুতরাং রাজশেখরবাবু নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ী ফিরলেন। সুহৃদ অনেক আগেই এসেছে। ওকে তিনি সংবাদ দিলেন: এখন অনেকটা ভালো; জ্বর কম; শান্ত হ'য়ে ঘুমোচ্ছে।

—তুই যা' না একবার। সুহৃদকে বললেন রাজশেখরবাবু: না যাওয়াটা ভালো দেখায় না।

—দেখি। সুহৃদ প্রায় নিস্পৃহের মতো জবাব দিলে।

শর্মিলার অসুখ সম্বন্ধে সন্দেহ হ'য়েছিলো আত্রেয়ীর। কিন্তু রাজশেখরবাবু যখন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, তখন আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে?

সুহৃদ রাত্রে গেলো। রইলো সেখানেই। সকালে বাড়ী এসে আহারাদি সেরে গেলো অফিসে। সন্ধ্যার পর পুনরায় গেলো শর্মিলার কাছে।

বৈচিত্র্যহীন দিন এমনিভাবেই কেটে যেতে লাগলো সহজ গতিতে। আত্রেয়ীর সমস্ত দেহ-মনে ক্লান্তি নেমে আসতে লাগলো। কিছুই করবার নেই ওর। বিকেলে ও চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে পশ্চিমাকাশের দিকে। কী অপূর্ব মরণের রাঙিন্য—ও ভাবে মনে মনে। ভাবে ব'সে ব'সে; যে-সব ভাবনার সূত্র অবলম্বন ক'রে ও চ'লে যায় ওর পরিধির বাইরে, ওর আবেষ্টনের বাইরে। নিজেকে মনে হয় অনাবশ্যক; কোনো কাজ নেই; করবার নেই কিছু। সময়-সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মতো ভাসমান ওর অবস্থা; নিঃসংগ, নিরবলম্ব, নিরর্থক। সংসারের নানা কাজে ও নিজেকে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করে; আঁকড়ে ধরে সমস্ত খুঁটিনাটি। মন বসে না; লঘু পক্ষ মেলে উড়ে যায় আকাশে ভাসমান পাখীর মতো—যে-

পাখী জানে না ডানা গুটোতে ; যে-পাখীর ডানা গুটোবার ক্ষমতা নেই। নিজেকে ওর অসহায় বোধ হয়। কেন, তা' বুঝতে পারে না। নিঃসংগতার কথা ভেবে এক এক সময় ওর সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। পৃথিবীতে সবাই কি এমনি নিঃসংগ, একাকী? আত্রেয়ী জানে না।

—বাবা, আমাকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দাও ; পড়বো। ও একদিন বললে।

রাজশেখরবাবু এক কথাতেই রাজী হ'য়ে গেলেন। সুহৃদের তো সম্মতি ছিলোই। আত্রেয়ী আবার মনের আনন্দে ঝল্‌মল ক'রে উঠলো। ওর সব-চেয়ে বড়ো তৃপ্তি, দিনগুলো আর এমনি বর্ণহীন, ক্লান্তিকর মনে হবে না।

সুহৃদের সংগে গিয়ে ও কলেজে নাম লিখিয়ে এলো। সুহৃদ বই কিনে দিলে ; কিনে দিলে শাড়ী। আত্রেয়ী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এতোদিনে ও কিছু করবার পেলো। কলেজের ছেলেরা পেলো নতুন নেশা। লক্ষ্মণের হাতের বই কিছু বাড়লো। তপতীকে স্কুলে রেখে ও আত্রেয়ীকে নিয়ে যায় কলেজে। ফেরবার সময় ঠিক থাকে না ব'লে আত্রেয়ীকে একাকীই আসতে হয়। কলেজে কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর সংগে দেখা হ'লো। দিনগুলো ওর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। কলেজ-লাইব্রেরী থেকে নতুন কতো বই নিয়ে এসে আত্রেয়ী পড়ে। রঙীন আর ঝক্‌ঝকে মলাটের বইগুলো ওর কাছে এক পরম বিস্ময়। ও প্রায়ই আদর ক'রে বইগুলোকে বারবার বুকের কাছে তুলে ধরে। বিদেশী উপন্যাস হু হু ক'রে ও কয়েকখানা প'ড়ে ফেললে। কতক বুঝলো ; কতক বুঝলো না। না-বুঝতে পারা অংশগুলোর ওপর চড়ালো কল্পনার রঙ ; অপরূপ ক'রে তুললো সেই বিশেষ অংশগুলোকে।

এ দিকে সুহৃদ ধীরে ধীরে নিজেদের বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন

হ'য়ে যেতে লাগলো। প্রথম প্রথম মাসে দশদিন ও কাটাতো শ্বশুর-বাড়ীতে। তারপর হ'লো পনেরো; এখন দাঁড়িয়েছে উনত্রিশে। কদাচিৎ কখনো ও আসে নিজেদের বাড়ী; কিন্তু রাজশেখরবাবুর যে সময়টা বাড়ী থাকার সম্ভাবনা কম, আসে সেই সময়েই। তবু একদিন ও সাম্‌না-সাম্‌নি প'ড়ে গেলো।

—কী? ব্যাপার কী বলোতো? রাজশেখরবাবু সরাসরি জিগ্‌গেস করলেন।

—কিসের ব্যাপার? বোকার মতো সুহৃদ প্রশ্ন করলে।

—নিজেদের বাড়ী কি ত্যাগ করলে না কি?

—ন্‌-না; তা' কেন?

—তবে কি গরীবিয়ানা চালে থাকতে তোমার কষ্ট হয়? এ রকম তো তুমি ছিলে না কখনো? বিয়ে ক'রে উন্নতি হ'য়েছে দেখছি।

আত্রেয়ী দাঁড়িয়েছিলো পাশেই। একবার ভাবলে, গিয়ে বারণ করে বাবাকে। আবার ভাবলে, থাক। ব্যবহার অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং। আর চুপ ক'রে থাকা যায় না।

—দরিদ্র হ'লেও নিজের সম্ভ্রমের কথা ভুলে যেয়ো না। রাজশেখরবাবু বললেন: স্ত্রীকে নিয়ে এসো এখানে; সহজ ভাবে থাকো।

রাজশেখরবাবু চ'লে গেলেন ছেলের সমুখ থেকে।

কিন্তু সুহৃদের দোষ নেই বিশেষ। শর্মিলাকে ও বলেছে অনেক, বুঝিয়েছে প্রচুর। তবু এখানে সে আসবে না কিছুতেই। সুহৃদ রাগ করেছে, অভিমান করেছে, বকেছে, আর কোনোদিন আসবে না ব'লে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু নোয়াতে পারে নি শর্মিলাকে। প্রতাপবাবুকেও ও এ বিষয়ে বলেছিলো।

—থাক্ না আরো কিছুদিন। প্রতাপবাবু বলেছিলেন:

এখনো ছেলে-মানুষ। নইলে স্বামীর ঘর করবে না তো করবে কি? আর এতো তাড়াই বা কিসের, সুহৃদ? তোমাদের বাড়ীতে লোকের তো অভাব নেই? তোমার বাবার সেবা তো তোমার দু' বোনেই করতে পারে।

—আজ্ঞে না; বাবার সেবার জন্যে ওকে যেতে বলছি না। সুহৃদ বলেছিলো: ব্যাপারটা বড়ো বিসদৃশ ঠেকছে। লোকেও সমালোচনা সুরু ক'রে দিয়েছে। তা' ছাড়া ওর তো কোনো অসুবিধে হয় না সেখানে। ঘরের শক্ত কোনো কাজই ওকে করতে হয় না। আমি জানি, ও কী ভাবে বড়ো হ'য়েছে; আর সম্ভবমতো সেইভাবেই ও থাকবেও।

—বেশ তো যাক্। প্রতাপবাবু বলেছিলেন। বুদ্ধিমান লোক তিনি। জামাতার আত্মসম্মানে যে ঘা লেগেছে এটা বুঝতে পেরে তিনি চেপে গেলেন। বিশেষ তর্ক ক'রে লাভ নেই। সুহৃদের গলার স্বর আর কথা বলবার ভংগী দেখেই প্রতাপবাবু আঁচ ক'রে নিয়েছেন সব।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর এ বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। সুহৃদ অবাক হ'য়ে গেলো। কেউ আর শর্মিলার যাওয়ার সম্বন্ধে কোনো কথা বলে না। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ও শুধু সংকোচ নয় রীতিমতো অপমান বোধ করতে লাগলো। ফলে ও শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত সাময়িকভাবে বন্ধ করতে চাইলে। শর্মিলা কেঁদে খুন। অদ্ভুত জিনিষ এই চোখের জল। সুহৃদের সমস্ত সংকল্প এবং ইচ্ছা রূপসী স্ত্রীর অজস্র অশ্রু-ধারায় গেলো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ভেসে।

—কেঁদো না। সুহৃদ ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিলো: আচ্ছা ছেলেমানুষ তুমি! ছিঃ, কাঁদছো কেন? কাঁদবার কী হ'য়েছে? বেশ, তোমাকে যেতে হবে না কোথাও লক্ষ্মীটি, আর কেঁদো না।

সুহৃদ বুঝতে পারে যে ওদের দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ, যা'র জন্যে শর্মিলা স্বামী-গৃহে থাকতে নারাজ। সম্পত্তিবান পরিবারের সর্বাংগীন স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে সম্ভব নয়; বন্ধু কিংবা আত্মীয় কাউকে সেখানে নিয়ে যেতে লজ্জা করে; সহরের প্রায়-প্রান্তে দরিদ্র পরিবারের সামান্য বাসস্থান সেটা; আর তারি পরিচয় কি না, শর্মিলার শ্বশুরবাড়ী। শর্মিলার মন বিষিয়ে ওঠে ওখানে যাওয়ার নাম-মাত্রেই। নতুবা সুহৃদকে ও ভালোই বাসে। ভালোবাসে তা'র দারিদ্র্যটুকু বাদ দিয়ে। সুহৃদ ওর স্বামী।

সুহৃদের মনের মধ্যে যখনি শর্মিলার শ্বশুরবাড়ী না যাওয়ার একমাত্র কারণটা জেগে ওঠে, লজ্জায় আর অপমানে ও একেবারে কালো হ'য়ে যায়। কিন্তু শর্মিলার মুখোমুখি হওয়া মাত্রেই ওর সমস্ত অপমান-বোধ যায় লুপ্ত হ'য়ে। শর্মিলাকে ও ভালোবাসে। ভালোবাসে স্ত্রীকে সবাই। উপরন্তু প্রতাপবাবু দিয়েছেন ওকে চাকুরী আর শর্মিলা রূপবতী।

আত্রেয়ী এতোখানির জন্য প্রস্তুত ছিলো না। দাদা যে ওদের ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে, বৌয়ের আঁচল-তলায় প'ড়ে থাকবে—এ কথা ও কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। ও ভেবেছিলো, দাদাকে বোঝাবে, দাদার সংগে ঝগড়া করবে। কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না আর। কেন, দাদা কি বোঝে না, এতে শুধু তা'রই অপমান নয়; সমস্ত পরিবারের অপমান? সুহৃদের সম্বন্ধে ও হতাশ হ'য়ে পড়লো। পুরুষদের সম্বন্ধে যে-ধারণা ওর মনে রূপায়িত হ'লো, সে ধারণার কখনো পরিবর্তন হবে কি না কে জানে?

সুহৃদ অবশেষে আস্তানাটাই বদলে নিলে। আজকাল আর ও বাড়ীতে আসেই না। "প্রতাপ-ভবনে" ওর জন্যে আলাদা ঘর নির্বাচিত হ'য়েছে। প্রথম প্রথম নিজের পরিবর্তনটা

ও অনুভব করতো এক আধ বার। ইদানীং কিন্তু তা'র ব্যবহারে ও আর কোনো ভাবান্তর দেখতে পায় না। নিজের পরিণতি ওকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'য়েছে। না নিয়ে কোনো উপায়ও ছিলো না ওর। জীবনকে স্ত্রীর আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে পারে না এমনি অপৌরুষ পুরুষদেরই একজন সুহৃদ। স্বাতন্ত্র্যকে উপহার দিলে ও মায়াময়ী পত্নীর পায়ে।

আর এ-দিকে রাজশেখরবাবুকে মেনে নিতে হ'য়েছে অদৃষ্ট। না মেনে উপায় নেই। অদৃষ্ট ছাড়া এ ঘটনাকে আর কীই বা বলা যেতে পারে। যে সন্তানকে জীবন দিয়ে মানুষ করলেন, নিজের সর্বস্ব বিনিময়ে তা'কে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দিলেন, সেই সন্তান যে তাঁকে ত্যাগ করতে পারে, নিজেরি জীবনে না ঘটলে এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। মেনে নিলেন তিনি এই পরিবর্তনকে ; গ্রহণ করলেন শান্ত-ভাবে। অবশ্যম্ভাবীর বিরুদ্ধে উতলা হ'য়ে লাভ নেই ; রাগান্বিত হ'লে নিজেরই অস্বস্তি।

সংসারের আবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে ওরা চলতে লাগলো। অবসাদ আর ক্লান্তিকে পশ্চাতে রেখে, ধীর শান্ত পদক্ষেপে ওরা এগিয়ে আসছে। রাজশেখরবাবু তেমনি দাওয়ায় ব'সে ব'সে গড়গড়া টানেন ; কখন তামাক যায় পুড়ে ; তিনি উঠোনে কামরাঙা গাছটার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকেন। আত্রেয়ী রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনকে বিশ্লেষণ করে। তপতী স্কুল থেকে এসে পাড়ার মেয়েদের সংগে যায় আড্ডা দিতে। লক্ষ্মণ বাসন মাজবার সংগে সংগে গুন গুন ক'রে গান ধরে। মন্থর গতিতে শেষ হয় দিনের পর দিন।

রাজশেখরবাবু অফিস থেকে এলেন একদিন জ্বর নিয়ে ; হু হু ক'রে কাঁপতে কাঁপতে। পড়লেন বিছানায় ; গায়ের কাঁপুনি আর থামে না। কাঁথা আর কম্বল অনেকগুলো গায়ে

চাপিয়েও ওঁকে আর গরম করা গেলো না। জ্বর বেড়ে চললো একশো, একশো এক, দুই, তিন, চার, সাড়ে চার, পাঁচ। সবাই গেলো ভয় পেয়ে। তপতী বাবার হিম-শীতল পায়ে দিতে লাগলো গরম জলের সেঁক; আত্রেয়ী চেপে ধরলে মাথায় আইস্-ব্যাগ্। রাজশেখরবাবু একেবারে বেহুঁস। আত্রেয়ী কানের ওপর মুখ রেখে ডাকতে লাগলো বাবাকে; সাড়া-শব্দ নেই। শুধু একটা ক্লান্তিকর ভয়াবহ গোঙানীর শব্দ। লক্ষ্মণ ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। তপতী ওকে ব'লে দিলে ডাক্তারের বাড়ী থেকে সোজা গিয়ে যেন শ্বশুরবাড়ী থেকে দাদাকে সংগে ক'রে নিয়ে আসে। লক্ষ্মণ দেরী করলে না এক মুহূর্ত। দ্রুত পায়ে রাস্তায় নেমে এলো ও। রুক্ষ চুলগুলো ওর উড়তে লাগলো বাতাসে।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। আমগাছে বাদুড় ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। রাত্রি গভীরতর হ'য়ে এলো। কারুর দেখা নেই; না লক্ষ্মণের, না সুহৃদের। রাজশেখরবাবু মাঝে একবার চোখ খোলেন; অস্পষ্ট কী কথাও বলেন; কিছু বুঝতে পারা যায় না। আত্রেয়ী থেকে থেকে শংকিত উচ্চ কণ্ঠে ডাকে বাবাকে; কোনো সাড়া পায় না। আত্রেয়ীর ইচ্ছে হ'লো তপতীর সংগে বেশ জোর গলায় কথা ব'লে ব'লে এই অসহ্য নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেয়। বাড়ীতে যে লোক আছে এটা প্রমাণিত হোক্। অথচ আত্রেয়ী ব'সে রইলো পাথরের মূর্তির মতো বর্ণহীন, স্পন্দনহীন।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে অকস্মাৎ আত্রেয়ীর বুক কেঁপে উঠলো। কে এলো? কা'র পায়ের শব্দ? লক্ষ্মণ এলো; সংগে ডাক্তার। সুহৃদ নেই।

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা ক'রে শান্ত কঠিন কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন: বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই?

—আছেন। আত্রেয়ী উত্তর দিলে: আমার দাদা; বাইরে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

—রোগটা খারাপ। যতোটুকু না বললে নয়, ততোটুকুই ডাক্তার বললেন: খুব সাবধানে রাখবেন; রাত্রে জেগে থাকবেন কেউ না কেউ।

আত্রেয়ীর হাত থেকে ভিজিটের টাকা নিয়ে ডাক্তার চ'লে গেলেন। লক্ষ্মণও গেলো ওষুধ আনতে। আত্রেয়ীর বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। কী যে করবে ও কিছুই ভেবে পেলে না। অসাড় হ'য়ে ব'সে রইলো ও বাবার মাথার কাছে। ওর হাতে হাত-পাখাটা যন্ত্রের মতো নড়ছে। পায়ের দিকে ব'সে তন্দ্রাচ্ছন্না তপতী বারবার ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

রাত্রি হ'লো আরো গভীর, বাইরে নিস্তব্ধ। দু একখানা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির একটানা আর্তনাদ। লক্ষ্মণ এলো ওষুধ নিয়ে; সংগে এলো সুহৃদ। একপাশে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, পলতেটা নামিয়ে দেয়া। তা'র স্তিমিত আলোতে সুহৃদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে, ঘরের মধ্যে একটা শংকিত নিস্তব্ধতার জমাট স্তূপ। অস্পন্দ রাজশেখরবাবু খাটের ওপর শুয়ে। ক্ষীণ আলোতে ওঁর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ওঁর পায়ের ওপরেই মাথা রেখে তপতী নিদ্রা দিচ্ছে; আর আত্রেয়ী শিয়রে ব'সে বাতাস করছে। আস্তে আস্তে পাখাটা রেখে দিয়ে আত্রেয়ী বাইরে এলো সুহৃদকে নিয়ে।

—আমার বড়ো ভালো বোধ হ'চ্ছে না, দাদা। আত্রেয়ী বললে।

—কি হ'য়েছে?

—জ্বর। এখন একশো চার। অফিস থেকে এলেন জ্বর

নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে। সেই যে পড়লেন, আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এতোক্ষণ যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছিলেন। মাত্র মিনিট কয়েক আগে চুপ করেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুহৃদ জিগ্‌গেস করলে: লক্ষ্মণ ওষুধ নিয়ে এলো কোথা থেকে?

—ডাক্তার এসেছিলো। আমি ডাকিয়েছিলাম।

—কি বললেন?

—বললেন, রোগ ভালো নয়। সাবধানে রাখতে হবে।

—কি অসুখ, জিগ্‌গেস করেছিলি?

—বললেন না কিছু।

—কি খেতে দিবি?

—মুখই খুলছেন না; খাবেন কী?

কয়েক মিনিট কাটলো। হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন রাজশেখরবাবু। ওরা দু'জনে ছুটে গেলো ঘরের ভেতরে। সুহৃদ বসলে বিছানায়; ডাকলো: বাবা, বাবা!

কোনো উত্তর নেই। শুধু মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠছেন তিনি।

—বাবা, আমি; আমি সুহৃদ। কি কষ্ট হ'চ্ছে তোমার বলো না। কী কষ্ট হ'চ্ছে, বাবা?

কোনো উত্তর নেই; সেই অবিশ্রান্ত গোঁ গোঁ শব্দ।

—লণ্ঠনটা নিয়ে আয়। সুহৃদ বললে আত্রেয়ীকে।

পলতেটা একটু বাড়িয়ে ও লণ্ঠনটা নিয়ে এলো কাছে। রাজশেখরবাবুর মুখের ওপর প্রতিফলিত হ'লো আলো। যন্ত্রণায় বিকৃত সে মুখ; কপালে কয়েকটি স্পষ্ট রেখা। বেশ জোর গলায় সুহৃদ ডাকলে: বাবা, বাবা! তাঁর বুকের ওপর হাতটা রেখে কোমল ক'রে নাড়া দিলে। কোনো সাড়া নেই। এ

আহ্বান যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন না ; যেন তিনি এদের নাগালের বাইরে চ'লে গেছেন।

আত্রেয়ী ছোটো গ্লাসে ওষুধ ঢেলে নিয়ে এসে বাবার মুখের কাছে তুলে ধ'রে বললে : ওষুধটা খেয়ে ফেলো বাবা ; খুব ভালো ওষুধ ; এখুনি সমস্ত যন্ত্রণা সেরে যাবে।

রাজশেখরবাবুর মাথাটা ঈষৎ ন'ড়ে উঠলো। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক ক'রে আত্রেয়ী ওষুধটা ঢেলে দিলে তাঁর মুখে। সমস্তটাই ঠোঁটের পাশ দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়লো।

—গোড়া থেকেই এই রকম নাকি ? ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে সুহৃদ।

—হুঁ।

লণ্ঠনটা ছোটো ক'রে যথাস্থানে রাখা হ'লো। লক্ষ্মণ ওদের খাবার জন্যে ডেকে ডেকে ফিরে গেলো। ও ব'লেছিলো, এক এক ক'রে খেয়ে গেলে সুবিধে হ'তো। সবাই এক সংগে উপোস করলেই কিছু রোগী সেরে উঠবে না। কিন্তু ওর কথা শুনবে কে ? স্তিমিত আলোকে রোগীকে ঘিরে তিনটি ভাই বোন ম্লান মুখে ব'সে রইলো। আত্রেয়ীর হাতে পাখা চলছেই। ওদিকে রান্না-ঘরে তালা পড়লো। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে অভুক্ত লক্ষ্মণ পড়লো এলিয়ে।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। কারও চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে রাত্রির কুকুর। উঠোনে অনেকক্ষণ একটা বেড়াল-ছানা বিরক্তিকর চীৎকার করছে। সেই চীৎকারে লক্ষ্মণের সবে-আসা-তন্দ্রা ভেঙে গেলো। উঠে টুঁটি চেপে ধ'রে গৃহ-সীমানার বাঁশের বেড়ার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ও বেড়ালটাকে। একটা রাতপাখী উড়ে গেলো সজিনা গাছটার শাখা ছুঁয়ে।

আকাশে তারাগুলোও তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়ছে। চারিদিকে

অন্ধকারের গাঢ় সমুদ্র। মুহূর্তগুলো অতীত হ'চ্ছে মন্থর গতিতে। অকস্মাৎ রাজশেখরবাবু ভীষণ এক চীৎকার ক'রে উঠলেন। তিন জনে একসংগেই চমকে উঠলো। বুকের রক্ত ওদের ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে; হৃৎপিণ্ডের চলাচল হ'য়েছে অস্বাভাবিক। রাজশেখরবাবুর নিশ্বাস অসংযত হ'য়ে উঠলো। বোঝা যায়, নিশ্বাস নিতে তাঁর রীতিমতো কষ্ট হ'চ্ছে। নিশ্বাস টানবার সময় শরীরটা উঠছে বারবার দুলে। সুহৃদ নাড়ীটা অনুভব ক'রে আরো ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো; অত্যন্ত অস্পষ্ট, ক্ষীণ।

সুহৃদ বললে: বোস্ তোরা, আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

সুহৃদ বেরিয়ে গেলো ঝড়ের মতো। আত্রেয়ী যেন এক অপরিচিত জগতে ভেসে বেড়াচ্ছে; অচেনা পরিস্থিতি, অজানা পথ। ওর যেন সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। ও হৃদয়ংগম করতে পারছে না কিছুই। আত্রেয়ীর চোখের সামনে সমস্ত ঘটনার স্রোত স্বপ্নের মতো ব'য়ে যাচ্ছে। নীরবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওর আর কিছু করবার নেই।

রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

নিশ্বাসের সংগে রাজশেখরবাবুর সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে উঠছে। গলার ভেতর একটা ঘড়্-ঘড়্ শব্দ যেন কোনো সর্বনাশের আগমন-বার্তা ঘোষণা করছে। বাইরের দাওয়া থেকে উঠে এসে লক্ষ্মণ ঘরের এক কোণে চুপচাপ ব'সে রইলো।

ব'সে রইলো তিনজন। করবার ওদের নেই কিছু। জীবনে এতো অসহায় ওরা কেউই এর আগে কখনো বোধ করেনি। কে আছে ওদের? কা'কে ওরা ডাকবে এ সময়ে? আত্মীয়ের মধ্যে আছেন দূর-সম্পর্কের এক কাকা; কলকাতায় থাকেন।

বড়োলোক, সুতরাং এদের সংগে প্রায় কোনো সম্বন্ধই নেই তবুও……কিন্তু এতো রাত্রে টেলিগ্রাম করবারও যে উপায় নেই।

সময় অতিবাহিত হ'তে লাগলো অসম্ভব মৃদু গতিতে। সজীব মুহূর্তগুলো অন্ধকারের নিথর দেহে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো; ওদের শেষ নেই আজ। শেষ নেই আজকের এই রাত্রির সমস্ত সৃষ্টির আয়ু আজ এই রাত্রির স্তিমিত দুটি প্রহর। আকাশের কালিমা বুঝি আর কোনো দিন ঘুচবে না। অন্ধকারের সমুদ্র অতিক্রম ক'রে আর বুঝি কখনো দেখা দেবে না আলোর কূল।

হঠাৎ শোনা গেলো বাইরে জুতোর শব্দ। চমকে উঠলো তিন জনেরই বুক। ডাক্তারকে নিয়ে সুহৃদ ঘরের মধ্যে এলো। ঝুঁকে প'ড়ে দেখলেন তিনি। আত্রেয়ী লণ্ঠনটা তুলে ধরলে নিস্পন্দ রোগীর মুখের কাছে; চোখ বন্ধ, নিশ্বাসের সংগে তেমনি ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দ।

—এ রকমভাবে কতোক্ষণ আছেন? নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে ডাক্তার জিগ্‌গেস করলেন।

—ঘণ্টাখানেক। আত্রেয়ী জবাব দিলে।

—ওষুধটা খাওয়াতে পেরেছেন?

—না, মুখ খুলতে পারি নি।

ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ আর ওষুধ বা'র ক'রে ডাক্তার একটা ইন্‌জেক্‌শ্যন্‌ দিলেন রাজশেখরবাবুর বাঁ হাতটায়। কিন্তু কোনো ভাবান্তর ঘটলো না তাঁর; কপালে পড়লো না আর একটিও রেখা।

ভিজিটের টাকাটা দিতে গিয়ে সুহৃদ জিগ্‌গেস করলে: কেমন বুঝছেন, ডাক্তারবাবু? মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুস্থ লোক এমন হ'য়ে পড়লেন কেন?

—হুঁ··· দেখুন, কেস্ খুবই সিরিয়স্। এতো চট্ ক'রে এমন সাংঘাতিক টার্ণ্ নেবে এটা বিয়ণ্ড্ ওয়াইল্‌ডেস্‌ট্ কন্‌সেপ্‌শ্যন্। মেডিকেল সায়ান্‌স্, দেখুন, এ ক্ষেত্রে ফেলিয়োর্। আচ্ছা—

ডাক্তার নিষ্ক্রান্ত হ'লেন। অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো তাঁর পায়ের শব্দ।

সুহৃদের আর ইচ্ছে হ'লো না ঘরের মধ্যে যায়। নিঃশব্দে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে ও বাঁচতো; অন্ধকারে, পৃথিবীর প্রান্ত সীমানায়। কিন্তু গেলো ও ঘরের মধ্যে। তপতী লণ্ঠনটা তুলে ধরেছে। রাজশেখরবাবু কী যেন বলতে চাইছেন, পারছেন না। শব্দ যাচ্ছে জড়িয়ে, আসছে অস্পষ্ট হ'য়ে।

—কি বাবা? কি? জল খাবে? আত্রেয়ী কোনো রকমে উচ্চারণ করলে। কান্নায় ওর গলা বন্ধ হ'য়ে আসছে।

রাজশেখরবাবু যা' বলতে চাইছেন, তা' যদি বলতে পারতেন কোনো রকমে। চারটে লোকের বুকের মধ্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠছে কান্নার সমুদ্র।

আত্রেয়ী চামচে ক'রে জল তাঁর মুখে ঢেলে দিলে। অনেক কষ্টে তিনি গিল্‌তে পারলেন খানিকটা; খানিকটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। তারপরই হঠাৎ ওঁর মাথাটা বালিসের এক ধারে কাৎ হ'য়ে পড়লো; বর্ণহীন, স্পন্দনহীন। সমস্ত দেহে এলো মৃত্যুর শীতলতা।

বাইরে কামরাঙা গাছের কোনো শাখায় ডানা ঝাপ্‌টে উঠলো একটা কাক্। অনেকগুলো পাতা ঝরঝর ক'রে খ'সে পড়লো।

পাঁচ

মাসখানেক পরে আত্রেয়ী একদিন সুহৃদকে বললে : দাদা, বৌদিকে আনিয়ে নাও ; সংসারে শ্রী আসুক। তা' ছাড়া দিনগুলো ভয়ানক অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। কি বলে বৌদি? আসতে চায় না কেন? ওকে তো কোনো কাজ করতে হয় না।

—হুঁ, যাবো। নিয়ে আসবো এবার। সুহৃদ বললে।

তপতী যথারীতি স্কুলে যাচ্ছে ; আত্রেয়ী যাচ্ছে কলেজে ; আর সুহৃদ অফিসে। অফিস থেকে সরাসরি ও বাড়ী ফেরে ; অন্য কোথাও আর যায় না। ব'সে থাকে চুপচাপ। আত্রেয়ী হয়তো বলে একবার বেড়িয়ে আসতে বাইরে ; সুহৃদ নড়ে না। রাজশেখরবাবু দাওয়ায় যেখানে মাদুর বিছিয়ে ব'সে থাকতেন, ও-ও চুপ ক'রে ব'সে থাকে সেখানে। ভাবতে চেষ্টা করে অনেক কিছু ; ভাবেও ; কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরাজয় এইখানেই! তবু মানুষ যুগ যুগ ধ'রে এমনি ক'রেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যায়। তর্কের তন্তুতে নিজেকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ফেলে, কিন্তু পারে না সমাধান আনতে ; পায় না মুক্তি।

প্রতাপবাবু ও তাঁর স্ত্রী একদিন এলেন এক সন্ধ্যায়। আত্রেয়ীকে একবার ও তপতীকে একবার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রতাপবাবুর স্ত্রী অশ্রুবৃষ্টি করলেন ; বর্ষিত করলেন অনেক সান্ত্বনা ও তত্ত্বকথা। সুহৃদকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন যাবার জন্যে ; শর্মিলা নাকি খুব কাঁদছে।

সুহৃদ কথাটা সবার সামনেই বললে : ওকে পাঠিয়ে দিন না এবার। এখন তো ওর আসা দরকার এবং উচিত। বললে সুহৃদ দ্বিধাহীন, সংকোচহীন হ'য়ে।

—তা' বৈ কি। প্রতাপবাবু সমর্থন করলেন : নিশ্চয়ই আসবে। তুমিই গিয়ে নিয়ে এসো।

ওঁরা চ'লে গেলেন।

পরদিন অফিস-ফের্‌তা সুহৃদ শ্বশুরালয়ে গেলো।

—চলো এবার। ও বললে শর্মিলাকে : কবে যাবে? কাল?

—কোথায়? ভয়ার্ত হ'য়ে প্রশ্ন করলে শর্মিলা।

—কোথায় আবার? সুহৃদ কঠিন কণ্ঠে বললে : তোমার যাবার একটি মাত্রই জায়গা আছে, সেটা আমার বাড়ী।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে শর্মিলা একটু বিস্মিত হ'লো। বললে : এতো তাড়া কিসের?

—তাড়া? তোমার জীবনে বোধহয় কোনোদিনই আসবে না। একটু থেমে থেকে আবার বললে ও : চলো শর্মিলা। সংসার তোমার। সংসারের দায়িত্ব তুমি নাও। তোমার স্নেহের আড়ালে আমরা কয়েক জন শান্তি পাবো একটু। তুমি না গেলে আর চলছে না।

—আমি গিয়ে সেখানে কি করবো?

—কিছু না, কিছু না মিলি, কোনো কাজ নয়। শুধু তোমার উপস্থিতির আনন্দ। মেয়ে দুটো তবু একটু কথা ব'লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

—আমার সংগে তো ওরা কথা বলে না।

—কি?

—কথা বলে কই আমার সংগে? আমি গেলেও যা', না গেলেও তাই।

—কথা বলতো না? কে? কই আমায় তো কোনো-দিন বলো নি তুমি?

—তুমি যদি এখন চোখ থাকতেও দেখতে না পাও।

—দেখো শর্মিলা, বিধাতা তোমাকে শুধু পরিষ্কার রঙটাই দিয়েছেন। সেই তুলনায় অন্তরটাও পরিষ্কার দিলে সুখী হ'তাম। কিন্তু যাক্‌, তোমার সংগে ঝগড়া করতে আমি আসিনি। ভালোভাবেই নিয়ে যেতে এসেছিলাম। স্বামী-গৃহের ওপর তোমার এ অকারণ বিতৃষ্ণা অন্ততঃ বাঙালী মেয়ের শোভা পায় না।

সুহৃদ চ'লে যাচ্ছিলো। শর্মিলা এগিয়ে এসে পথ রোধ ক'রে বললে : দাঁড়াও, শুনে যাও।

সুহৃদ ফিরে দাঁড়ালো।

—কথায় কথায় অমন রাগ করো কেন? শর্মিলা বললে।

—এ ছাড়া আর কিছু বলবার আছে? প্রশ্ন করলে সুহৃদ।

—কবে নিয়ে যাবে আমায়?

—আজ, কাল, পরশু ; যে দিন তুমি যাবে।

—পরশু।

—বেশ।

—আজ থেকে যাও। শর্মিলা বললে।

—না।

—না কেন?

—কেন? একা দুটো মেয়ে গোটা বাড়ীতে।

এর পর আর কোনো কথা হ'লো না। সুহৃদ বাড়ী ফিরলো।

অবশেষে শর্মিলা এলো। সংগে একজন পরিচারিকা।

—একটা ঝি আবার সংগে কেন? সুহৃদ জিগ্‌গেস করলে।

—কি হ'য়েছে তাতে? কাজ করবে।

—আমাদের সংসারের কাজের জন্যে চাকর আছে

সেই তোমারো কাজ করতে পারবে। তোমার এমন বিশেষ কোনো কাজ থাকতে পারে না, যার জন্যে সংগে দাস-দাসী নিয়ে আসার প্রয়োজন হ'তে পারে।

—কিন্তু তোমারই বা এতো আপত্তি কেন এতে? রুক্ষভাবে বললে শর্মিলা।

—তোমার বড়লোকি চালটা না দেখালেই ভালো হ'তো।

সুহৃদ স্থান ত্যাগ করলে।

তপতী নিয়মিত স্কুলে যায়। আত্রেয়ী কোনো কোনো দিন যায় না কলেজে, শর্মিলা বাড়ীতে একা থাকে ব'লে। শর্মিলার সংগে ও গল্প করে; গান শোনায়, হাসায়।

দিন কেটে যায়।

কিন্তু কতোদিন আর আত্রেয়ী কলেজ কামাই করবে? নিয়মিত করলে ও কলেজে যাওয়া। শর্মিলা দুপুরে ঘণ্টা-খানেক ঘুমোয়; তারপর ছট্‌ফট্‌ করে। সময় ওর কাটতে চায় না। নিজেদের বাড়ীতে অনেক লোক, ভাই-বোন, রেডিও, গ্রামোফোন; আর প্রায়ই বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়ে তাস-খেলা, খাওয়া-দাওয়া, হৈ চৈ ·····সময়টা বেশ কাটতো। কিন্তু এখানে দিন ওর অসহ্য হ'য়ে উঠলো। সন্ধ্যায় অফিস থেকে কাজ-কর্মের পর ফিরে এসে সুহৃদ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে আজকাল; স্ত্রীর সংগে অবান্তর চপলতা করবার স্পৃহা ওর থাকে না। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত সুহৃদ চুপচাপই থাকে। তারপর কোন সময়ে পড়ে ঘুমিয়ে। শর্মিলার মনে হ'লো, স্বামীকে এ আবেষ্টনীর মধ্যে ও পরিপূর্ণ ভাবে পাচ্ছে না। এখানে সে ওর নাগালের বাইরে থাকে; তা'র মন স্পর্শ করতে ও পায় না। স্বামী ওর একান্ত ক'রে ওরি কথা ভাবতে পায় না। সংসারের প্রাচীরের অন্তরালে ও যেন স্বামীর দৃষ্টির বাইরে প'ড়ে গেছে। স্বামীর এই নিস্পৃহতা

ওর মনে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো। অথচ সুহৃদের ব্যবহারে অসামঞ্জস্য নেই কোনো। শর্মিলার সংগে ও কথা বলে ; তার কথায় ও হাসে ; জিগ্‌গেস করে, তা'র কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে কি না। শর্মিলা গম্ভীর হ'য়ে থাকে ; ভালো ক'রে উত্তরও দেয় না ; চেঁচিয়ে হাসে না ; স্পষ্ট শোনা যায় না ওর কথা। কিন্তু সুহৃদের মনোযোগ নেই সেদিকে। ও ব্যস্ত থাকে ; বাইরের পৃথিবী ওকে আঁকড়ে ধরে। সকালে ছাত্র পড়ায় ; দুপুরে অফিস করে ; বিকেলে আর এক ছাত্র পড়িয়ে সন্ধ্যেয় বাড়ী ফেরে। তারপর আছে তপতীর পড়া ব'লে দেয়া ; আছে আত্রেয়ীর সংগে সংসারের নানা আলোচনা। অবশেষে নিশীথ রাত্রে আর স্ত্রীর সংগে প্রেমালাপ করবার ধৈর্য ওর থাকে না। শর্মিলা বুঝতে পারে না কী উপায়ে স্বামীকে আরো একান্ত ক'রে পাওয়া যায়। কোনো পথই ও খুঁজে পায় না। বৃহত্তর সংসার ওর স্বামীর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

একদিন অফিস থেকে এসে সুহৃদ ঈজিচেয়ারটায় চুপ ক'রে পড়েছিলো। শর্মিলা পাশে এসে বললে ঃ আমি বাপের বাড়ী যাবো। এখানে আমার ভালো লাগছে না।

—ভালো লাগছে না ? কেন ?

—সময় কাটে না একা একা।

—অনেক গল্প-উপন্যাসের বই আছে, মাসিক পত্রিকা আছে, পড়লেই তো পারো। দুপুরের ক'টা ঘণ্টা বই তো নয় ? আমি হ'লে তো ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতাম। বাস্তবিক, দুপুরে ঘুমুতে যে কী আরাম। শেষের দিকে সুহৃদ কথাটা হাল্কা ক'রে আনবার চেষ্টা করলে।

—একা একা আমার ভালো লাগে না।

—সব সময়েই তো আর একা থাকতে হয় না। চব্বিশ

ঘণ্টার মতো তোমার জন্যে আর লোক কোথা পাবো বলো? তা' ছাড়া কিছুক্ষণ একা থাকা তো মানুষের জীবনে দরকার। মনও তাই চায়। সমস্ত কথা-বার্তা, গোলমাল, হাসি-ঠাট্টা থেকে মানুষ খানিকটা সময় স'রে থাকতে চায়। ভালোবাসে চুপ ক'রে একা থাকতে। এই একা সময়টুকু নির্জনে সে কতো কথা ভাবতে পারে, যা' অন্য সময়ে দশজনের মাঝে একেবারেই সম্ভব নয়। তোমার ওই খানিকক্ষণও একা থাকতে ইচ্ছে করে না? আশ্চর্য তো।

—তোমার যদি করে তো বিয়ে করলে কেন? শর্মিলা বললে: বেশ তো একা ছিলে।

ওর কণ্ঠে এতোখানি উষ্মা সুহৃদ আশা করে নি। বললে: মেয়েদের মাথায় আর কতোটুকু বুদ্ধি থাকবে।

—তবু তো তা'দের না হ'লে তোমাদের চলে না।

—তা'তে প্রমাণ হয় না, তা'দের মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু আছে।

কোনো মীমাংসা হ'লো না। মন ভারী ক'রে রইলো দু'জনেই। তবু সুহৃদের মন হাল্কা হ'তে বেশী সময় লাগলো না। মুস্কিল হ'লো শর্মিলার। একেই সহজে ও কারও সংগে কথা বলে না।. তা'য় সুহৃদ দিলে এই ইন্ধন জুগিয়ে। ফলে শর্মিলার দিন কাটতে লাগলো অসহ্য কষ্টে। কিন্তু একদিন ও বেশ কঠিন কণ্ঠেই বললে: আমাকে তুমি যেতে দেবে কি না শুনতে চাই।

—নিশ্চয়ই। সুহৃদ বললে: যেখানে যেতে চাও।

—বিশেষ কোথাও যেতে চাই নি, যে বাড়ী থেকে বিয়ে ক'রে এনেছিলে সেই বাড়ীতেই।

—স্বচ্ছন্দে। কবে যাবে?

—কাল।

—কাল আমার সময় হবে না।

—কেন ?

—অফিস আছে।

—কিন্তু সকালে ? শর্মিলা বললে।

—সকালে পড়ানো।

—একদিন পড়াতে না গেলে এমন বিশেষ কিছুই এসে যাবে না।

—একদিন পরে বাপের বাড়ী গেলেও লক্ষ টাকার ক্ষতি হবে না ।

—কাল যাবে না তুমি ?

—বুঝতে পারো নি ?

—বেশ, আমি একাই যাবো।

—স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু শর্মিলা গেলো না ; যেতে ও পারলে না একা। বিশ্রী একটা গোলমাল তা'তে। আর মা বাবাও এতে ভালো বলবেন না।

শনিবার বিকেলে সুহৃদ বললে : যাবে আজ ? সময় আছে।

—যাবো।

—আর একবার ভেবে দেখো শর্মিলা। সুহৃদ বললে : যেখানে যাচ্ছো সেটা পরের বাড়ী ; আর যেখান থেকে যাচ্ছো সেটা তোমার নিজের বাড়ী। চিরকাল তোমাকে কাটাতে হবে সেখানেই, আজীবন। ভেবে দেখেছো ?

—দেখেছি। আমি তো আর চিরকালের জন্যে বিদেয় হ'চ্ছি না। এ সব কথা বলবার মানে কি ?

—মানে আর কি ? উপদেশ ; বিয়ের পর এই বোধহয় তোমাকে প্রথম উপদেশ দিচ্ছি, না ?

শর্মিলা কোনো উত্তর দিলে না।

সুহৃদ নিয়ে গেলো শর্মিলাকে। প্রতাপবাবু জিগ্‌গেস করলেন: কি ব্যাপার কি ? বলা-কওয়া নেই ?

উত্তর দিলে সুহৃদ: ওর নাকি মন কেমন করছিলো আপনাদের জন্যে। তা'র ওপর কাল রাতে কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উতলা হ'য়ে পড়েছে। হ্যাঁ, সব ভালো তো এখানে ?

—হ্যাঁ, সব ভালোই তো। তা' কাল তো রবিবার; আজকের দিনটা থেকেই যাও না।

—আজ্ঞে না; ওখানে ওরা একা রয়েছে।

শর্মিলাকে রেখে সুহৃদ ফিরে এলো। কোনো রকম অনুরোধ করবার সুযোগ তা'কে ও দিলে না।

দিন কাটতে লাগলো তেমনি শান্ত নিস্তরংগ নদীর মতো; দুর্যোগহীন আকাশের মতো। আকাশে যেমন ক'রে ভেসে যায় শ্বেত মেঘ নির্বাধ গতিতে, তেমনি ভাবে।

মাস দুই কেটে গেলো।

তপতীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা এগিয়ে এলো। আত্রেয়ীরও শেষ হ'য়ে এলো প্রথম বর্ষ। দিনের বেশীর ভাগ সময় ওরা পড়া-শোনায় ব্যস্ত থাকে। লক্ষ্মণ দেখে সংসার; দু'বেলা রান্না করে; বাসন মাজে; সংসারের যা কিছু কাজ সমস্তই করে।

সুহৃদ ইতিমধ্যে দু'বার গিয়েছিলো শ্বশুরবাড়ী। শর্মিলার সমস্ত প্রচেষ্টাও ওকে পারে নি ধ'রে রাখতে। একদিন নানা কথার পর সুহৃদ বললে: চলি এবার; ইস্... বড্ডো দেরী হ'য়ে গেলো।

—আজ রাত্তিরটা থেকে যাও না।

—কেন থাকবো ? আমার কথা শুনেছিলে তুমি ?

সুহৃদ থাকে নি।

শর্মিলা একদিন চিঠি লিখলো। সুহৃদকে যেতে অনুরোধ করেছে ও ; মিনতি জানিয়েছে।

সুহৃদ গেলো। শর্মিলা তখন বিছানায় শুয়ে

—কি হ'য়েছে ? সুহৃদ জিগ্‌গেস করলে।

—জ্বর।

—ক' দিন ?

—কাল থেকেই। তবু আমার ভাগ্যি যে তুমি এলে।

—ভেবেছিলাম, আসবো না। সুহৃদ বললে

—এলে যে তবে ?

—মিনতিকে উপেক্ষা করা চলে না। হ্যাঁ, জ্বর কতো ?

—সামান্য।

—ঠাণ্ডা লাগিয়েছিলে ? প্রশ্ন করলে সুহৃদ।

—কি জানি। লেগেছিলো হয়তো।

—ওষুধ খাচ্ছো ?

—না।

—কেন ?

—কি হবে ওষুধ খেয়ে ?

—সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি।

—তা'তেই বা আর এমন কি লাভ ? তুমি তো আর কাছে থাকছো না।

—তুমি গেলেই তো পারো।

শর্মিলা উত্তর দিলে না। চুপ ক'রে রইলো। কয়েক মিনিট পরে বললে : আমার বিছানায় এসে বসলে তোমার অপমান হবে কি ?

সুহৃদ চেয়ার ছেড়ে শর্মিলার মাথার কাছে এসে বসলো। শর্মিলা টেনে নিলে ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে। বললে : আমার ওপর রাগ করেছো ?

—না, রাগ করবো কেন ?

—এই এক মাসের মধ্যে তুমি একবারো আমার খবর নেয়ার সময় পেলে না। যদি চিঠি না লিখতাম, হয়তো কখনোই আসতে না তুমি।

হঠাৎ শর্মিলার চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

—ও কি ? শুধু শুধু কাঁদছো কেন ?

শর্মিলার শরীরটা দুলে উঠলো।

—ছিঃ, কাঁদতে নেই ; চুপ করো।

আরো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শর্মিলা।

—তাহ'লে এই আমি চললাম ; তুমি শুয়ে শুয়ে কাঁদো।

শর্মিলা থামলো। কয়েক মিনিট পরে বললে : আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না গো।

সুহৃদ ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

—আমি ভালো হ'য়ে উঠলে তুমি আমায় নিয়ে যেয়ো।

—নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। সুহৃদ সোৎসাহে বললে।

—আজ থাকবে না তুমি আমার কাছে ? অদ্ভুত কণ্ঠে শর্মিলা বললে : চ'লে যাবে আমায় ছেড়ে ?

সুহৃদ মুস্কিলে পড়লো। কি বলবে ও ? যদি না যায় তাহ'লে অভিভাবকহীনা বোনেরা কি ভাব্‌বে ? ওরা জানে না যে, শর্মিলা অসুস্থ। আর যদি চ'লে যায় তাহ'লে শর্মিলাকে দেয়া হবে অকারণে কঠিন আঘাত।

—বলো না, আমাকে ছেড়ে আজো বুঝি চ'লে যাবে তুমি ? থাকবে না ? ওর কণ্ঠে রয়েছে করুণ আবেদন।

—না মিলি ; আজ আর যাবো না। অভিভূতের মতো ব'লে ফেললে সুহৃদ : তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো।

সে রাত্রে সুহৃদের আর বাড়ী আসা হ'লো না। লক্ষ্মণ এসেছিলো অধিক রাত্রে সংবাদ নিতে। তখন সুহৃদের একবার অদম্য ইচ্ছে হয়েছিলো যে বাড়ী যায়। কিন্তু শর্মিলাকে ফেলে ও যেতে পারলে না। বললে লক্ষ্মণকে: আত্রেয়ীকে বলিস, তা'র বৌদির হঠাৎ খুব অসুখ করেছে। বোধহয় রাত্রিটা আজ আমায় থেকে যেতে হবে। ওরা যেন খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। আর তুই খুব সাবধানে থাকবি; বুঝলি?

লক্ষ্মণ সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। আত্রেয়ী চিন্তিত হ'লো। কে জানে হয়তো বাস্তবিকই অসুখ করেছে।

পরদিন ভোরবেলা সুহৃদ আস্‌লে আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলো: হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ কী হ'লো বৌদির? কেমন আছে?

—জ্বর; খুব বেশী রকমেরই। শেষ অবধি আর তাই আসা হ'য়ে উঠলো না কাল। সকালে যখন এলুম, একটু শান্ত হ'য়ে ঘুমোচ্ছিলো।

অফিস-ফের্‌তা পুনরায় একবার না গিয়ে সুহৃদ পারলে না। তবে ফিরে এলো অনেক রাত্রে।

আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে: গিয়েছিলে ওখানে?

— না, আজ আর যেতে পারি নি রে। আজ অফিসের এক ভদ্রলোক টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর ছেলের জন্মদিন কিছুতেই ছাড়লেন না। কতকগুলো খাইয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ, তোরা খেয়েছিস তো?

—খেয়েছি। কিন্তু তুমি একবার হ'য়ে এলে পারতে।

—কাল যাওয়া যাবে।

ওখানে যাওয়ার জন্যে সুহৃদকে আর বলতে হয় না। আজকাল নিজের তাগাদাতেই ও প্রায় রোজই যায় ওখানে; এবং মাঝে মাঝে রাত্রিবাসও করে। এ বিষয়ে বোনেদের

সংগে আর ওর কোনো কথাবার্তা হয় না। বোনেরা জানে যে বৌদি ভালো হ'য়ে গেছে।

সুহৃদ প্রায় দিনই অফিস-ফেরতা যায় এবং পরদিন ভোরবেলা বাড়ী আসে। আগে ও মাঝে মাঝে দু' একটা অজুহাত দিতো। আজকাল আর সে-সব প্রয়োজন বোধ করে না। ও বুঝে নিয়েছে, লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে বোনেরা নিরাপদেই থাকবে। সুতরাং আশংকার কোনো কারণ নেই।

তপতীর ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা শেষ হ'লো। ও শুধু গল্পের বই পড়ে আর ঘুমোয়। আত্রেয়ীর আর কোনো দিকে মন দেয়ার সময় নেই। একেই ও কয়েক মাস পরে কলেজে ভর্তি হয়েছে; তাছাড়া পরীক্ষার সময়ে ওর এমনিতেই নাওয়া, খাওয়া, ঘুমোনোর দিকে নজর থাকে না। লক্ষ্মণ নিজের কাজ ক'রে যায়। যখন যা' আনতে হবে, তপতী ওকে বলে; ও এনে দেয়। আত্রেয়ী এক ফাঁকে এসে তপতীকে ব'লে দেয় কী রান্না হবে আর কুট্‌তে হবে কি কি। তরকারী কাটা শেষ ক'রে রান্না-ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তপতী। বলেঃ লক্ষ্মণদা, তোমার অন্য যা' যা' কাজ আছে করোগে যাও। আমি রাঁধছি।

—আমার কোনো কাজ নেই। আমিই রাঁধছি; তুমি যাও।

—আছে তোমার কাজ। ধোপাটাকে একবার খবর দিয়ে এসো। এগারো দিন হ'য়ে গেলো আসেনি। যা'চ্ছে তাই নোঙ্‌রা হ'য়েছে সব।

লক্ষ্মণ উঠে যায়। তপতী রাঁধে। দিদির কাছে ও শিখেছে সব। বেশ পরিপাটি ভাবেই ও সব সেরে ফেললে।

খেতে ব'সে তপতী জিগ্‌গেস করলেঃ কি রকম হ'য়েছে লক্ষ্মণদা?

—চমৎকার। খেতে খেতে লক্ষ্মণ বললেঃ হাত পুড়োও নি?

—এই দেখো। তপতী হাতখানা এপিঠ ওপিঠ দেখালে।

লক্ষ্মণ হেসে উঠলো।

সুহৃদ আসে কোনোদিন ; কোনোদিন আসেনা।

পাড়ার হিতৈষীরা অনেকদিন কিছু বলবার সুযোগ পায় নি। এবার তা'রা সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করলে : বাড়ীতে দুই সোমত্ত মেয়ে একা ; আর কেউ থাকে না ; এক জোয়ান চাকর। এ সব চালচলন ভালো নয়। পা হড়কাতে সময় লাগে না বেশীক্ষণ ; আর হড়কেইছে কি না কে জানে ? পাড়ার অনেকেই দেখেছে, মেয়ে দুটো জোয়ান চাকরের সংগে আড্ডা দিচ্ছে ; গল্প করছে ; হাসি-ঠাট্টা……আরো কতো কি। কেন রে বাপু, অতো কিসের ? হ'লোই বা মা-বাবার আমলের বিশ বছরের পুরোনো চাকর ; তবু চাকরই তো। তা' নয়, লক্ষ্মণদা। আর ও-বেটাও চাকরের মতো থাক ; তা' না বাড়ীর মেয়েদের সংগে তোর অতো ফষ্টি-নষ্টি কেন ?

এ সব কথা আত্রেয়ীর কাণে যায় ; লক্ষ্মণও শোনে। আত্রেয়ী চুপ ক'রে থাকে। লক্ষ্মণ কখনো কখনো মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলে : দেবো একদিন সব ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে।

—না না ; কি দরকার লক্ষ্মণ ? কথায় কিছু কারও গায়ে ফোস্কা পড়ে না। ওরা বলবেই। এতোদিন শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছিলো। ওদের এই কুৎসা রটানোর মধ্যে যে ফন্দী, যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সে গুলোকে ব্যর্থ করতে হ'লে এই নীরব উপেক্ষাই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়।

—আপনারা যে স্কুল কলেজে যান, এ ওরা কিছুতেই সইতে পারে না।

—পারবে না, লক্ষ্মণ। সহরের শেষ সীমানায়, বিশেষ ক'রে আমাদের এই দরিদ্র পাড়ার কোনো পরিবারের কোনো মেয়েই দিনের আলোয় জুতো পায়ে পথ চলতে পারে না।

কলেজ আর ইংরাজী লেখা-পড়া তো দূরের কথা, বাঙলা অক্ষর পরিচয়ও হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমাদের তা'রা সইতে পারবে না; স্বাভাবিক। সহরের মধ্যের কোনো ভদ্র পাড়ায় হ'লে এতোটা বাড়াবাড়ি হ'তো না।

অতএব বাড়াবাড়ি বজায় রইলো।

ইতিমধ্যে কাটলো আরো দু' মাস। সাংসারিক সমস্ত ব্যবস্থা এখন নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সুহৃদ মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন থাকে শ্বশুরবাড়ী। তা'র অনুপস্থিতিই শেষ পর্যন্ত বোনেদের মেনে নিতে হ'য়েছে। আর মেনে নিয়েছে অদৃষ্টকে। এ ছাড়া অবশ্য কোনো পথও ছিলো না। ওরা করে ঘরের কাজ; লক্ষ্মণ বাইরের। প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশী ও বাইরে থাকে না। রাত্রে আত্রেয়ী আর তপতী যে ঘরে শোয়, লক্ষ্মণ থাকে তা'র পাশেরি ঘরে; থাকে মোটামুটি সজাগ হ'য়ে। লক্ষ্মণের ওপর নির্ভর ক'রেই দুটি বোনের দিন কেটে যায়। পাড়ার হিতৈষীরা এ বিষয়ে হতাশ হ'য়ে পড়েছে। কা'কে আর শোনাবে তা'রা তা'দের নালিস? উপকৃত করবে বিনামূল্যে উপদেশ দান ক'রে? তা'দের এ তিক্ত সমালোচনা হয়তো শেষ অবধি অভিযুক্তদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়ই না। উদ্যোগী পুরুষ কেউ কেউ আরো একটু এগিয়ে যায়; অর্থাৎ যায় লক্ষ্মণকে দু' একটা কথা বলতে। লক্ষ্মণ বলে, কুত্তা লেলিয়ে দেবে; কিম্বা দেবে মাথায় বসিয়ে বাঁশের বাড়ি। লক্ষ্মণের নিষ্ঠুর দৃষ্টি আর কঠিন মুখের পানে চেয়ে ওরা ঢোক গিলে নিয়ে পেছিয়ে যায়।

ম্যাট্রিক্ পরীক্ষার ফল বেরুলো; তপতী পাস করেছে। আত্রেয়ী ওঁকে বুকের মধ্যে টেনে এনে বললে: আজ যদি বাবা থাকতেন?

দু’ বোনেরই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দুঃখে, আনন্দে।

হঠাৎ একদিন সুহৃদ এসে বললে: তপতীর বিয়ের ঠিক করেছি আত্রেয়ী।

—বেশ তো। আত্রেয়ী বললে: কি করে ছেলে?

—কলকাতায় আইন পড়ে।

—পড়ে? বৌকে খাওয়াতে পারবে তো?

—সে ভাবনা নেই। পয়সা আছে ওদের।

—বয়েস কতো ছেলের?

—বছর পঁচিশ; স্বাস্থ্যবান; সুপুরুষ।

—বেশ তো। চমৎকার হয় তাহ’লে।

তপতী হঠাৎ কোথা থেকে এসে বললে: আমি বিয়ে এখন করবো না।

চিরকালই মুখফোঁড় হ’লেও তপতীর কাছ থেকে এতোটা আশা করে নি সুহৃদ। ও বললে: বিয়ে করবি না তো করবি কি?

—পড়বো; দিদির মতো। আমার বেলায় অতো তাড়া কেন?

ইংগিতটা বুঝলো আত্রেয়ী; বুঝলে সুহৃদও। আত্রেয়ী মুখ নামিয়ে নিলে। সুহৃদ চাপা দিয়ে বললে: ভালো পাত্র; পয়সা কড়ির দাবী নেই। ব’সে তো আর থাকবে না তোর জন্যে।

—না থাকে তো অন্য অনেক মেয়ে আছে তা’র জন্যে। আমি এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে করবো না।

—তাড়াতাড়ি মানে? সুহৃদ বিরক্ত হ’য়ে বললে: খুকি আছিস না কি এখনো?

—আছিই তো। তপতী হেসে বললে: আজো ষোলো পার হই নি; সে হিসেব রাখো?

—রাখি। যতো শিগ্‌গির বিয়ে হয় মেয়েদের ততোই ভালো। বয়েস বাড়্‌লে ভালো পাত্র পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়ায়।

—কেন? পুরুষরা কি বয়েস বাড়লে কন্দর্প হ'য়ে ওঠে না কি?

—ফাজ্‌লামি করিস না তপতী। এটা সত্যিই একটা সীরিয়াস্‌ সমস্যা।

—সেই জন্যেই তো এস্‌ট্যাব্‌লিশ্‌ করতে চাইছি, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করবো না।

—উদ্দেশ্য? কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সুহৃদ।

গম্ভীর হ'য়ে জবাব দিলে তপতী: ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে রাজী নই।

—তোর পাকামি অসহ্য হ'য়ে উঠছে তপতী। রীতিমতো রেগে উঠে সুহৃদ বললে।

—তবু কিন্তু ওই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

তপতী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলো।

আত্রেয়ী এতোক্ষণ কথা বলে নি; চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলো। ওকে উদ্দেশ্য ক'রে সুহৃদ বললে: এ বোধহয় তোমার শিক্ষা। সুহৃদের কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে।

—মানে? আত্রেয়ী শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো।

—এমন ক'রে কথা বলতে ও তো জানতো না; আর এতো অবাধ্যও কখনো ছিলো না।

—না; এতে অবাধ্যতা কিছুই করেনি ও। ওর যদি ভালো না লাগে বিয়ে করতে, তুমি সেটাকে অবাধ্যতা বলবে কেন?

—ভালো লাগা না-লাগাটা চট্ ক'রে ওর গজালো কি ক'রে ? এর গুরু কি তুমিই ?

—এ তুমি রাগের কথা বলছো দাদা। তুমি আজ ঝগড়াই করছো কেবল।

—আর যতো ভালোমানুষি করছো তোমরা ; না ?

—কি পাগলের মতো বক্‌ছো ?

সুহৃদ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগলো। খানিক চুপ থাকার পর ও আপন মনেই ব'লে চলেছে : না, এ অসহ্য। এ রীতিমতো আমাকে অপমান করা।

আত্রেয়ী কোনো উত্তর না দিয়ে সেস্থান ত্যাগ করলো।

সুহৃদ সেই যে গেলো, আর ওর দেখা নেই। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো ও আর কোনো সংবাদ দেয় না, নেয়ও না। আত্রেয়ী ও তপতীর দিন অতিবাহিত হ'তে লাগলো দুঃখে আর হতাশায়। দাদার ওপর প্রচণ্ড ছিলো ওদের ভরসা। বাবা মারা যাওয়ার পর সমস্ত আশা ওরা ন্যস্ত করেছিলো সুহৃদের ওপর। আর সেই সুহৃদ আজ ভুল ক'রেও কোনো খবর নেয় না ওদের।

—যাবো নাকি একবার দাদার কাছে ? লক্ষ্মণ একদিন জিগ্‌গেস করলে ?

—না ; দরকার নেই। আত্রেয়ী জবাব দিলে : সে যদি নিজের কর্তব্য না করে আর সেজন্যে যদি নিজের কাছে কোনোদিন তা'র জবাবদিহি করতে হয়, করুক্। কিন্তু এমন ভাবে ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে তা'র কাছে দাঁড়াতে আত্মসম্মানে ঘা লাগে লক্ষ্মণ।

—কিন্তু, তিনি তো আপনাদের বড়ো ভাই। লক্ষ্মণ মাথা চুলকালো।

—সেই জন্যেই তো এতো প্রশ্ন ওঠে। আত্রেয়ী বললে : মা নেই; বাবাও চ'লে গেলেন; অভিভাবক বলতে কেউ নেই। একা মেয়ে দু'জন আমরা তা'রি ছোটো বোন; অথচ···

আত্রেয়ীর গলার কাছটা ব্যথা ক'রে উঠলো; চোখ দুটো উঠলো ছলছলিয়ে।

লক্ষ্মণ কোনো উত্তর দিলে না।

কিন্তু দিন নির্বিবাদে অতীত হয় না কখনো। অবশেষে ওদের জাহাজ চড়ায় ঠেক্‌লো; আর চলতে চায় না। সমস্ত দুরবস্থা মানুষ অবহেলা করতে পারে; চেষ্টা করলে এড়িয়েও চলতে পারে হয়তো। কিন্তু সে কথা খাটে না আর্থিক দুরবস্থার ক্ষেত্রে। মানুষকে এমন ভয়ংকর কুৎসিৎ ও নগ্ন ক'রে আর অন্য কিছু অপরের চোখের সামনে উপস্থিত করে না। আত্রেয়ীকে আবার পথে বেরুতে হ'লো মানুষের কদর্থ কুতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে। কিন্তু এবার আর সংকুচিত ভাবে নয়; প্রগাঢ় অহংকার আর আত্মশ্লাঘা নিয়ে। চরণে ওর সরম নেই; আছে জয়-যাত্রার ধ্বনি। দৃষ্টিতে নেই কুণ্ঠা; আছে ঔদ্ধত্য। ওর কলেজের মাষ্টারদের খোসামোদ ক'রে নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নিলে। ইচ্ছে ছিলো না ওর; কিন্তু উপায় নেই। সুহৃদ নিজেও আসে না; আর অনিয়মিত ভাবে কখনো সখনো যে টাকা সে অবহেলাভরে পাঠায় তা'তে তিনটে প্রাণীর জীবনযাত্রা অচল। আত্রেয়ী ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু মাথা নীচু করে না। যখন ও দেখলো টাকার অবশ্যম্ভাবী দরকার, তখন আর ঘরে ব'সে থাকা সম্ভব রইলো না।

তবু আজ ও যেন অনেক শান্তি পায়। সারা দিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে ওর সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি আহার শেষ ক'রে ও বিছানায় এলিয়ে দেয় শ্রান্ত

দেহটাকে। অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও ভাবে, যুদ্ধ যখন আরম্ভ হ'য়েছে তখন জয়লাভ ওকে করতেই হবে। কিন্তু কি লাভ মফঃস্বলের এই অখ্যাত এক সহরে এই সামান্য মাষ্টারী-জীবন-যাপনে? কি লাভ এই বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন বিদ্যমানতায়? কি লাভ এই ফাঁকা সৎনামের বোঝা ব'য়ে? লোকের কাছে বৃথা ভালো হওয়ার চেষ্টায় সার্থকতা কোথায়? এ তো ও ক্রমশঃ নিজেকে নিঃশেষের পথে নিয়ে চলেছে? এর চেয়ে অধঃপতন, আত্মহত্যার চেয়ে বড়ো পাপ আর কি আছে পৃথিবীতে?

আত্রেয়ীর ঘুম এলো না। অন্ধকারের সমুদ্রে ও ভেসে ভেসে চললো। ভেসে চললো একাকিনী; নিরুদ্দেশ। কোনো দিক থেকে এলো না কোনো শব্দ, কোনো আহ্বান। পৃথিবীর এই সীমাহীন অন্ধকার-সমুদ্রে মানুষ এমনি ক'রে ফেনার মতো ভেসে চলেছে উদ্দেশ্যহীন, ক্লান্তিহীন।

জীবনকে আত্রেয়ী এমনিভাবে মোমবাতির মতো পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিতে চায় না। চায় না এমনি ক'রে অনর্থক ভেসে যেতে। ও চায় দাঁড়াতে শক্ত হ'য়ে কঠিন মৃত্তিকার ওপর। চোখ মেলে দেখতে চায় পৃথিবীর পরিধি।

—লক্ষ্মণ! আত্রেয়ী পরদিন অপরাহ্নে ডাকলে।

—কি বলছেন?

—আর এমন ক'রে দিন কাটানো যায় না। অসহ্য রকমের বিশ্রী; নয় কি?

—কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর উপায় নেই বড়দি; সুদিন যতোদিন না আসে আমাদের জীবনে।

—না; আর আমার ধৈর্য নেই, লক্ষ্মণ। জীবনের মেয়াদই বা আর কতোটুকু?

—এর মধ্যেই অস্থির হ'য়ে উঠলে তো চলবে না বড়দি।

মেয়েদের জীবনে ধৈর্য ধ'রে থাকা ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে কি ?

লক্ষ্মণের মুখে এসব কথা আত্রেয়ীর কানে নতুন ঠেকলো না। ও ভালো ক'রেই জানে, লক্ষ্মণের যা' কিছু শিক্ষা ওরই মায়ের কাছে। আশৈশবই বলতে হয়, লক্ষ্মণকে মানুষ ক'রে গেছেন আত্রেয়ীরই মা।

—আমি পারবো না লক্ষ্মণ, এমন ভাবে জীবন কাটাতে। আমার পথ আমিই খুঁজে নিয়েছি। আর আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি না। তা' ছাড়া চল্‌বেও তো না এমন ক'রে ? টাকা কই ? আমি যা রোজকার করি তা'তে সংসার চলা সম্ভব নয়। আর দাদার কাছে কতোদিন তুমি পাঁচবার ফিরে এসে পঁচিশটা টাকা আনতে যাবে ? এ উঞ্ছোবৃত্তি অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমার।

লক্ষ্মণ চুপ ক'রে রইলো।

—আমি কলকাতা যাবো লক্ষ্মণ। হঠাৎ আত্রেয়ী বললে।

—কলকাতায় ? কার সংগে ? চম্‌কে উঠলো লক্ষ্মণ।

—একা, ছোড়্‌দিকে নিয়ে।

—কেন ?

—ভালো জীবন কাটাবো ; শিক্ষাও এখনো শেষ হয় নি ; আর দূর করতে হবে এই নিদারুণ অভাব।

—কিন্তু তা' কি ক'রে সম্ভব হবে ?

—হবে লক্ষ্মণ ; হ'তেই হবে।

আত্রেয়ীর ঠোঁট দুটো হ'য়ে উঠলো কঠিন ; কপালে ফুটে উঠলো কয়েকটা রেখা ; আর দৃষ্টিতে ঝল্‌সে উঠলো এক অদ্ভুত প্রখরতা।

—কোথায় থাকবেন সেখানে ? অনুসন্ধান করতে চাইলে লক্ষ্মণ।

—দূর সম্পর্কের এক কাকা আছেন। মাত্র পরিচয় সম্বল ক'রে গিয়ে উঠলেও কি আর তিনি তাড়িয়ে দিতে পারবেন ?

—কিন্তু সেখানে থাকতে পারবেন কি ক'রে ? সে পরের বাড়ী। কোনোদিন দেখা-শোনা কি খোঁজ-খবর নেয়া অবধি নেই। সেখানে কি আদর বা সম্মান পাবেন ?

—নাই পেলাম ; তবু সেখানে একটা আশা আছে লক্ষ্মণ। অনাদর আর অবহেলা এতো অসহ্য মনে হবে না। কিন্তু এখানে যে কোনো আশা নেই ; অন্ধকারে কালো ভবিষ্যৎ। এখানে এভাবে প'ড়ে থাকা মানে তিলে তিলে মৃত্যু।

গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো আত্রেয়ী। নীরবে কেটে গেলো খানিকটা সময়। লক্ষ্মণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বললে : আমিও যাবো তো আপনাদের সংগে ?

—তাহ'লে বাড়ী দেখবে কে লক্ষ্মণ ?

—আপনারাই যদি চ'লে যান তো দেখবার আমার কি থাকবে ?

—থাকবে বৈ কি লক্ষ্মণ ; অনেক কিছু থাকবে। এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ছোটো খাটো জিনিষের সংগে জড়িয়ে আছে আমাদের মায়ের স্মৃতি ; আমাদের বাবার স্মৃতি।

একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এলো আত্রেয়ীর। অন্তর ওর হারিয়ে গেলো পুরোনো দিনের পরিধিতে। মনে পড়লো, ওর কিশোর বয়সের স্বপ্ন একদিন এই ঘরে বাসা বেঁধেছিলো। ও বললে : এমনি কি ফেলে চ'লে যাওয়া যায় এ ঘর দুয়োর ?

—একা ব'সে ব'সে আমি কি শুধু এই ইটকাঠগুলোকে আগ্‌লাবো না কি ? বললে লক্ষ্মণ।

—আমাদের আগলানোর চাইতে সে কাজ অনেক বড়ো লক্ষ্মণ। এটা জেনো যে আমরা আশ্রয় ক'রে নেবোই।

তারপর তুমি তো রইলেই। প্রয়োজন হ'লেই ডাকবো। তখন দেখা যাবে, সব ছেড়ে তুমি যেতে পারো কি না।

লক্ষ্মণ ম্লান হাসলো।

অবসর।

লক্ষ্মণ বললে: দাদাকে তো এ বিষয়ে…

—না; জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওর অসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে আত্রেয়ী: তা'র কাছ থেকে কোনো সাহায্যই আমরা পাবো না। বরঞ্চ সে আমাদের বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

—কিন্তু আপনারা চ'লে যাওয়ার পর তো এর জন্যে আমাকেই জবাবদিহি হ'তে হবে।

—সে জন্যে ভেবো না লক্ষ্মণ। তখন কি করতে হবে না হবে আমি তোমায় ব'লে দিয়ে যাবো।

পরদিন রাত্রে ওরা তৈরী। নিঃশব্দে যাওয়ার আয়োজন শেষ হ'লো। প্রতিপক্ষের কেউ তা' জানলে না। বিছানাপত্র বেঁধে দিলে লক্ষ্মণ। যা' কিছু প্রয়োজনীয়, সমস্ত ওরা ট্রাংকে ভ'রে নিলে। তপতীর একজোড়া ছেঁড়া জুতো পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে সেলাই করিয়ে নেবে।

ওরা প্রস্তুত। যাত্রার সময় হ'য়ে এসেছে।

—গাড়ী একখানা ডাকো লক্ষ্মণ। আত্রেয়ী বললে।

গাড়ী এলো। সমস্ত জিনিষপত্র লক্ষ্মণ নীরবে তুলে দিলে।

—বাবার পূজোর জায়গায় রোজ সন্ধ্যেবাতি দিতে ভুলো না, আর মা বাবার ছবিতে ধুনো গংগাজল…

আত্রেয়ীর গলার স্বর কেঁপে উঠলো।

ষ্টেশ্যান্। একে একে ঘোড়া-গাড়ী থেকে নামলে তপতী, আত্রেয়ী ও লক্ষ্মণ। দু'খানা কলকাতার টিকিট কেনা হ'লো। ট্রেইন আসতে তখনো প্রায় পনেরো মিনিট দেরী।

অবশেষে গাড়ী এলো। দু' বোনে কামরায় প্রবেশ করলে। মেয়েদের গাড়ী। ভিড় নেই মোটেও। দুটো বিছানা ওরা চট্ ক'রে পেতে নিলে। গার্ড নীল লণ্ঠন হাতে প্ল্যাট্‌ফর্মে পায়চারী করছিলো। দু' একজন ক'রে প্যাসেঞ্জার উঠছে। গাড়ী ছাড়বার সময় হ'লো।

জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আত্রেয়ী বললে : হ্যাঁ, লক্ষ্মণ, এবার তুমি যাও। দাদাকে গিয়ে বলো যে মোট ঘাট নিয়ে আমরা কোথায় চ'লে গেছি। তুমি তখন ঘরে ছিলে না; ফিরে এসে আর আমাদের দেখতে পাও নি। যাও, দেরী কোরো না। আর যে ঠিকানাটা তোমায় দিয়েছি, ভালো ক'রে রেখো, হয়তো কাজে লাগতে পারে। না, না; ছি, নমস্কার করতে হবে না। কতো বড়ো তুমি আমাদের চেয়ে। আচ্ছা এসো।

লক্ষ্ণণ তৎক্ষণাৎ চ'লে গেলো না। দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কামরাটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও। হুইশ্লের শব্দ কেঁপে কেঁপে উঠলো। ট্রেইন নড়ছে। লক্ষ্মণ তেমনি অস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। ক্রমশঃ ওর চোখের সামনে ট্রেইনের লাল আলোটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো দিগন্তে।

লক্ষ্মণ যখন সুহৃদের শ্বশুরবাড়ী এসে পৌঁছুলো, তখন রাত্রি প্রায় দশটা।

—কি ব্যাপার? এতো রাত্রে? সুহৃদ প্রশ্ন করলে।

লক্ষ্মণ বললে : বিপদ হ'য়েছে। বড়দি আর ছোটদিকে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ীতে।

—কি বলছো লক্ষ্মণ? বিস্মিত প্রশ্ন করলে সুহৃদ।

—হ্যাঁ। লক্ষ্মণ বললে : অদ্ভুত; কতোটুকুই বা ছিলাম বাইরে? ফিরে দেখি, ওঁরা নেই। ওঁদের জিনিষপত্র নেই, সব ফাঁকা।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর সুহৃদ বললে : চলো, যাচ্ছি আমি।

সেই অবস্থায়ই সুহৃদ লক্ষ্মণের সংগে এলো নিজেদের বাড়ীতে। দরজার পাশে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছিলো। তা'রি স্তিমিত আলোতে সুহৃদ তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে; কোনো দিক থেকে সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না। ভয়ানক নিস্তব্ধ। রাত্রি প্রায় এগারোটা হবে। চারিদিকে তন্নতন্ন ক'রে দেখলে সুহৃদ, কোনো চিঠি পাওয়া যায় কি না; পাওয়া যায় কি না কোনো সন্ধান। কিন্তু ওর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। সুহৃদের মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করতে লাগলো; শরীরের মধ্যে ব'য়ে যেতে লাগলো ঠাণ্ডা একটা স্রোত।

—কি করা যায়? অনুগ্র স্বরে বললে সুহৃদ।

—বুঝতে পারছি না। লক্ষ্মণ জবাব দিলে। কোনো উত্তাপ নেই ওর কণ্ঠে।

দাওয়ায় চেয়ার পাতা ছিলো। সুহৃদ ব'সে পড়লো। বললে : পুলিশে খবর দেবো?

—লাভ কি তা'তে? লক্ষ্মণ বললে : শুধু শুধু হাংগামা বাড়বে। হয়তো ওরা পুলিশের নজরে প'ড়ে যাবে।

—হুঁ।

অবসর।

—ওরা কেন এমন করলে লক্ষ্মণ? হতাশ কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে সুহৃদ।

সুযোগটা লক্ষ্মণ ছাড়লে না।

—কী করবে এখানে থেকে? ও বললে : আপনি তো আর তা'দের দেখা-শোনা করতেন না। কতোদিন বড়দি বলেছে, আশ্চর্য মানুষ এমন বদ্‌লে যায়। অথচ আপনি ছাড়া ওদের কে-ই বা ছিলো?

—যদি সে কথাই ওরা জানতো, সুহৃদ বললে : তবে এমন ক'রে আমার মুখে কালি দিয়ে ওরা পালালো কেন? আমি এখানে মুখ দেখাবো কেমন ক'রে? এতোই যদি স'য়েছিলো তো এটুকু ভাবতে পারলো না কেন?

বোনেদের ওপর সুহৃদের অকারণ এই দোষারোপ সইতে পারলে না লক্ষ্মণ। ও বললে শান্তকণ্ঠে তা'দের পক্ষ সমর্থন ক'রে : ভেবেছিলো। কিন্তু উপায় ছিলো না হয়তো। বড়দি যা' রোজকার করতেন, তা'তে কোনো রকমেও সংসার চলতো না। আপনার কাছে টাকা আনতে গিয়ে বারবার ফিরে এসেছি। এ-কথাই বড়দি বারবার বলতো। আপনি ওদের দেখাশোনা না করেন, সে আলাদা কথা। কিন্তু সংসারে মাত্র বেঁচে থাকতে হ'লে যে টাকার দরকার, এ কথাও আপনি ভুলে গিয়েছিলেন।

—এখন কি আর কোনো উপায় নেই লক্ষ্মণ?

—এতো রাত্তিরে কী আর করা সম্ভব?

সুহৃদ ব'সে রইলো চেয়ারে চুপ ক'রে। লক্ষ্মণ গেলো স্থানান্তরে। রাত্রি গভীর হ'লো। সুহৃদের মনে পড়তে লাগলো অনেক কথা, যে সব কাহিনীর ওপর জমেছিলো বিস্মৃতির ধূলো। ওদের তিনটি ভাই বোনের সম্মিলিত ইতিহাস। আজ ধূলোর আবর্জনা সরিয়ে সুহৃদ একে একে সেই বিগত দিনের কাহিনীগুলো চোখের সামনে মেলে ধরলে। দু'হাতে ভীড় ঠেলে ঠেলে সুহৃদ এগিয়ে চলতে লাগলো ঘটনারাশি ভেদ ক'রে। রাত্রি গভীরতর হ'য়ে আসছে।

ছন্দ

পাশাপাশি দুটো লোহার লাইন জন্মকাল থেকে প্রতিদিন রাত্রে এমনি ক'রে কেঁপে ওঠে যখন সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ, নিথর। ট্রেইনের চাকার নিষ্পেষণে আজো সমান্তরালবর্তী লাইনগুলো কেঁপে উঠছে। একখণ্ড চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশের এক প্রান্তে। ট্রেইন যখন বহুদূরে তখন এই লাইন চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ট্রেইন তখন কোথায়? আর যাত্রীরা কি করবে কে জানে?

তপতী ঘুমোচ্ছে। আত্রেয়ী জানলায় হেলান দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে। সমস্ত শরীরে ওর চাঁদের মতো ক্লান্তি। রাত্রির প্রান্তর থেকে ভেসে আসা বাতাস আত্রেয়ীর স্খলিত কবরী থেকে খুচরো চুলগুলোকে বারবার উড়িয়ে আনছে ওর চোখে, মুখে, কপালে। আত্রেয়ী শূন্য দৃষ্টি মেলে ব'সে রইলো।

মেয়ে-কামরার বাকি যাত্রীরা সব গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। ট্রেইন ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। মুহূর্তের সাগরে অগণিত ঢেউ ব'য়ে যায়।

আত্রেয়ী যা' পশ্চাতে ফেলে এসেছে আজ আর সে-সব ভাবতে চায় না। তা'রা প'ড়ে থাক পেছনে, বহুদূরে। তা'রা মুছে যাক্ আত্রেয়ীর জীবন থেকে; সময়ের স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্ সে স্মৃতি। আত্রেয়ীর জীবনে ফুরিয়ে এসেছে তা'দের প্রয়োজন! তা'রা যেন কোনোদিন ওর উদ্দাম গতিকে মন্থর না ক'রে দেয়; কোনোদিন যেন ঠেলে না ধরে পশ্চাৎ থেকে। আত্রেয়ী তা'দের ফেলে এসেছে দৃষ্টির অন্তরালে,

অনুভূতির বাইরে। সম্মুখে যতোদূর ওর দৃষ্টি যায় সব নতুন, সব বিস্ময়কর। আশ্চর্য! পুরাতনের ক্ষীণতম চিহ্নও সেখানে নেই। যে নতুনের মধ্যে স্ফুলিংগের মতো বারবার ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে; উঠবে অপরূপ এক কামনার মতো প্রখর হ'য়ে; অপূর্ব এক উদ্দীপনার মতো ঝংকৃত হ'য়ে। নতুন আলোকের নির্মল প্রভাতে ও ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠবে; সেতারের মতো উঠবে বেজে; গাছের নতুন সবুজ পাতার মতো উঠবে মর্মর ক'রে। আজ এই তারাভরা রাত্রিতে ওর নবজন্ম হ'লো। ও অভিনন্দন জানালে রাত্রির এই অন্ধকারকে, অরণ্যের ওই গভীরতাকে। আত্রেয়ী জানলায় হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।

ইঞ্জিনের ধাক্কায় যখন ওর ঘুম ভাঙলো তখন শেষ রাত্রি। এখান থেকে ষ্টীমার ধরতে হবে। দূর থেকে ভেসে আসছে পদ্মার জোলো হাওয়া।

তপতীও উঠে বসলো ধড়মড় ক'রে। বিছানা নিলে গুছিয়ে। কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে ওরা এলো ষ্টীমারে। কল্পনাতীত ভীড়। চারিদিকে অসম্ভব ব্যস্ততা, গোলমাল, চীৎকার। নীচের ডেকে যাত্রী আর মালপত্র সব এক সংগে একাকার হ'য়ে গেছে। তপতীর হাত ধ'রে আত্রেয়ী রেলিঙের পাশে স'রে দাঁড়ালো। জেটির দিক থেকে মানুষের ঢেউএর এক একটা ধাক্কা আসছে আর ওরা নিজেদের আরো বেশী সংকুচিত ক'রে নিচ্ছে। না; তবুও সামলানো অসম্ভব।

—কুলি দুটোকে আর দেখেছিলে? তপতী কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—গেছে নিশ্চয়ই ওপরে। আত্রেয়ী বললে: সিঁড়িতে ওকে যেন দেখলুম।

—যদি পালায়?

—না; পালাবে কোথায়?

ওরা দাঁড়িয়ে রইলো তেমনিই। অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো যাত্রীদের এই ঠেলাঠেলি। ওই ভীড়ের মধ্যে একটা কুলির সংগে এক ভদ্রলোকের প্রচণ্ড বচসা শোনা গেলো। অকস্মাৎ ভদ্রলোকটি প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে কুলিটাকে ডেকের ওপর ফেলে দিলে। পাগড়ী সামলাতে সামলাতে কুলিটা উঠে দাঁড়ালো; ধরলো ভদ্রলোকটির কোটের কলার চেপে। ও সাহায্যদাতা হ'য়ে এগিয়ে এলো আরো দু' একজন কুলি। ভদ্রলোকেরও সাহায্যের অভাব হ'লো না। আরম্ভ হ'লো রীতিমতো এক খণ্ডযুদ্ধ। কিছু আর দেখা যায় না; শুধু মানুষ-কণ্ঠ ক্রোটের একটা চাপ, দুলছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ধাক্কা খেয়ে এক জন স্ত্রীলোক হঠাৎ ছিট্‌কে পড়লো একদিকে। তাঁকে মেঝে থেকে তোলবার জন্যে গেলো আর দু'জন ছুটে। একটা কুলির মাথায় ছিলো প্রকাণ্ড দুটো ট্র্যাংক্; ও টাল্ সামলাতে পারলে না। ট্র্যাংক্ দুটো ছিট্‌কে পড়লো মেঝের ওপর। সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেলো। মারামারিটা ক্রমশঃ আত্রেয়ী আর তপতী যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেইদিকে এগিয়ে আসছে। ওরা ওখান থেকে স্থানান্তরে যাবার চেষ্টা করলে দু'বার; কিন্তু কৃতকার্য হ'লো না। জন চার পাঁচ লোক আত্রেয়ীর গায়ের ওপর এসে পড়লো। ঠিক সেই সময় কে একজন বলিষ্ঠ হাতে আত্রেয়ী আর তপতীকে প্রচণ্ড বেগে টান দিয়ে সেই উত্তেজিত জনতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো ডেকের অন্য প্রান্তে। আত্রেয়ী প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত সময় পেলে না; শুধু লোকটার একখানা সবল হাতের দৃঢ় চাপ ও অনুভব করলে নিজের সমস্ত শরীরে; সোনার দু'গাছা চুড়ি বেঁকে ব'সে গেলো ওর হাতের নরম মাংসের মধ্যে।

লোকটি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললে: আর একটু হ'লেই

মারা পড়েছিলেন। আপনাদের সংগের লোকেরা সব কোথায় ?

লোকটি এখনও হাঁপাচ্ছে। এদের ছ' বোনের মুখেই কোনো উত্তর এলো না। লোকটিই বললেঃ অমন জায়গায় দাঁড়াতে আছে কখনো ?

আত্রেয়ী তাকালে এবার বক্তার মুখের দিকে ; বয়েস বছর ছাব্বিশ সাতাশ : চওড়া কাঁধ : সিল্কের সার্টের আস্তিন গোটানো ; একরাশি অবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। মূল্যবান কোট্‌টা বাঁ দিকের কাঁধে ঝুলছে ; দীর্ঘদেহে স্বাস্থ্যের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস।

—কই ? আপনাদের জিনিষপত্র ? সংগের লোক ? দেখেছেন একবার কাণ্ডখানা ; কয়েকটা খুন না হ'য়ে যাবে না। দেখি একবার দাঁড়ান।

ও আবার মিশে গেলো ভিড়ের মধ্যে। আত্রেয়ী দৃষ্টি-শক্তিকে প্রখর ক'রেও আর ওকে দেখতে পেলে না। তবুও ওর চোখ অনুসন্ধান করতে লাগলো ভীড়ের মধ্যে।

ষ্টীম্যারের হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠলো। কুলিগুলো সব একে একে তীরের দিকে ছুটতে সুরু করলে।

—পয়সা দিয়ে দিন জলদি।

আত্রেয়ী তাকিয়ে দেখলে, ওদেরি কুলি।

—মাল কোথায় রেখেছো ?

—ওপরে।

—চলো, দেখিয়ে দেবে।

আত্রেয়ী সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ডেকে উঠলো।

ইন্‌ট্যারের এক ধারে ওদের ছুটো ট্র্যাংক্‌ আর একটা বিছানা প'ড়ে আছে। কুলিকে বিদায় দিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রইলো। বসবার বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। থার্ড্‌, ইণ্ট্যর্‌, কাম্‌রা, ডেক্‌,

পুরুষ, মেয়ে সব একাকার হ'য়ে গেছে।

শেষ হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে ষ্টীম্যর ছাড়লো।

আত্রেয়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠছে। অনেকেই তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। অনেকের মধ্যেই শিভাল্‌রি বারবার মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। তথাপি যা'রা বসেছিলো তা'রা উঠলো না; যা'রা দাঁড়িয়েছিলো তা'রা দাঁড়িয়েই রইলো।

—এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? জায়গা পান নি? আপনাদের সংগের লোক কই? হ্যাঁ, যা' ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। নীচে বেশ কয়েকজন ঘায়েল হ'য়েছে; একজন মহিলা ফেইণ্ট্‌ হ'য়ে পড়েছিলেন; এখন মূর্চ্ছা ভেঙেছে। কিন্তু আশ্চর্য দেখুন, আমার সুট্‌কেইস্‌ আর বিছানাটি যে কোথায় গেলো কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। এখানেই কোথায় রেখে গিয়েছিলাম। আচ্ছা আর একবার দেখে আসি দাঁড়ান।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ও এগিয়ে চললো।

তপতী হাসছে।

—কী রে! হাসছিস যে? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—লোকটা পাগল।

—দূর; পাগল হবে কেন? কিন্তু দৈত্য একটি। দেখ, আমার হাতের চুড়ির কি অবস্থা করেছে ও। দু'খানা চুড়ি একেবারে বেঁকে গেছে।

ষ্টীম্যর বেশ জোরে চলছে। দূরে জেটির আলোগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে এলো। পদ্মার কালো জলে ষ্টীম্যরের স্যর্চ্‌লাইট্‌টা প্রতিফলিত হ'চ্ছে। তা'রি তীব্র আলোতে উড়ে আসছে অসংখ্য সাদা পোকা; আলোয় চোখ ঝলসে পড়ছে তা'রা জলে আর ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সংগে। মাঝে মাঝে স্যর্চ্‌লাইটের গণ্ডীতে পড়ছে সাদা পাল-তোলা নৌকা।

ক্রমশঃ পূবের আকাশে দেখা দিলো আলোর রেখা।

ভোরের আর দেরী নেই। যাত্রারা সব গুছিয়ে নিয়েছে এতোক্ষণে। ভোরের জন্যে সকলেই অপেক্ষমান। চায়ের দোকানটায় ইতিমধ্যে চা-খোরদের ভীড় জমে' গেছে।

—দাঁড়িয়ে আছেন তো এখনো ? সেই লোকটি ঘুরে এসে বললেঃ বাব্বা, যা ভীড়। যাক্, জিনিষ-পত্রগুলো পাওয়া গেলো। গণ্ডগোলে কিছু কি আর ঠিক থাকবার উপায় আছে ?

ওর হাতে একটা সতরঞ্চি ; কোট্টা কাঁধের ওপর তেমনিই ঝোলানো ; পকেটে গোল সিগারেটের টিনটা ফুলে রয়েছে, এদিক সেদিক তাকিয়ে ও পুনরায় বললেঃ চলুন যাই। স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে তো আর থাকা যায় না। ঐদিকে বরং জায়গা হ'তে পারে। আসুন আমার সংগে সংগে। হ্যাঁ, আপনারা কি একাই আছেন ? সংগে নেই কেউ ?

উত্তর না-দেয়াটা ভালো দেখায় না। আত্রেয়ী ঘাড় নেড়ে জানালে যে ওরা একাই যাচ্ছে ; সংগে কেউ নেই।

—আসুন আমার পেছনে পেছনে ; জায়গা ঠিক পাবো।

ও আর তাকালে না পশ্চাতে। লোকের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগলো। প্রায় স্বগতঃ ব'লে চলেছে ওঃ বুঝলেন, এতো ভীড় আমি কখনো দেখি নি ; ছেলেবেলা থেকেই তো যাতায়াত করছি। আপনারাও দেখেন নি নিশ্চয়। আর একেবারে একা যাওয়াটা মহা অসুবিধে ; হাংগামা তো কম নয় ; আপনারা—

বাধা দিয়ে তপতী পেছন থেকে বললেঃ কই আপনার জায়গা ? লোক ডিঙিয়ে আর কতোদূর যেতে হবে ?

ওর চমক ভাঙ্‌লো ; অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেঃ ওই দেখুন, ভুলেই গিয়েছিলুম জায়গার কথা। এই যে, আসুন।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ও ঘুমন্ত একটা লোককে প্রচণ্ড

একটা ধাক্কা দিয়ে বললে : ওহে, উঠে পড়ো চট্‌পট্। কতোক্ষণ আর ঘুমোবে ? ভোর হ'য়ে গেলো যে।

ধাক্কা খেয়েই লোকটা উঠে বসলো ; মনে করেছিলো, টিকিট-চেক্যর্। পকেট থেকে টিকিটটা বা'র ক'রে দিলে ওর হাতে। গম্ভীর হ'য়ে টিকিটটা বার দুই উল্টেপাল্টে দেখে ও বললে : কই ? কোথাও তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবার কথা লেখা নেই। দিব্বি তিন জনের জায়গা জুড়ে নাক ডাকাচ্ছো ? নাও, রাখো টিকিট ; বিছানাটা গুটিয়ে ফেলো দিকি।

ও নিজেই নীচু হ'য়ে তা'র বিছানাটা এক পাশে সরিয়ে দিয়ে নিজের সতরঞ্চিখানা পেতে আত্রেয়ীকে ডেকে বললে : আসুন, বসবেন আসুন।

আত্রেয়ী ও তপতী গিয়ে ব'সে পড়লো। বেশ জায়গাটা ; রেলিঙের ধারেই। পাশেই দেখা যায় পদ্মার কালো জল। তপতী লোকটির গতিবিধি দেখে কেবলি হাসছে। আত্রেয়ী ধমক দিয়ে বললে : ওকি ? চুপ কর।

সদ্যজাগরিত লোকটার সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ংগম করতে কয়েক মিনিট লাগলো। এবার ও রাগতকণ্ঠে বললে : বেশ তো ভদ্রলোক মশাই আপনি ? দিব্যি ঠেলে তুলে দিয়ে ফালাও হ'য়ে বসলেন। এখন আমাকেই গুটিয়ে থাকতে হ'চ্ছে।

অত্যাচারী যুবক কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। কাঁধে ঝোলানো কোটের পকেটে হাত দিয়ে ও বললে : আপনি তো বিড়ি তামাক খান মনে হ'চ্ছে ; দেশলাইটা একবার দিন না।

—না, দেবো না। মেঘমন্দ্র স্বরে অত্যাচারিত লোকটি উত্তর দিলে।

অপরপক্ষ তখনও হাসছিলো। ডান পকেট থেকে

দেশলাইটা বার ক'রে সিগারেট ধরিয়ে ও একটা টান দিলে।

—কই? আপনি বসলেন না? বললে আত্রেয়ী: অনেক তো জায়গা রয়েছে।

—এই যে, বসছি। না ব'সে আর উপায় কি?

বসলে ও, নিজেদের মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে; বললে: দেখুন দেখুন, সকাল হ'চ্ছে কী চমৎকার। পদ্মার সকাল, বুঝলেন, অদ্ভুত। আমার ইচ্ছে আছে একবার একখানা মাষ্ট্যর-পিস্ আঁকবো; এই হবে আমার স্যবজেক্ট্।

—আপনি ছবি আঁকেন বুঝি? আত্রেয়ী না জিগ্‌গেস ক'রে পারলো না। সাহায্য নিয়ে যাবো অথচ কথা বলবো না, এটা ভারী বিশ্রী দেখায়।

—না, ঠিক আঁকি না; তবে বিদ্যেটা সামান্য জানা আছে।

আর কোনো কথা নেই, কোনো পক্ষে। পদ্মায় তখন ভোর হ'চ্ছে। তীর ঘেঁসে চ'লেছে ষ্টীম্যর। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ছ' একখানা কুঁড়ে ঘর। শরতের শেষ; পদ্মার জল শান্ত, স্থির। বনের প্রান্ত ভেসে যাচ্ছে তীরে; নারকেল আর সুপুরি গাছের সারি। পূর্ব আকাশ সূর্য-প্রসব-ব্যথায় রক্তাক্ত। আত্রেয়ী তাকিয়ে দেখলে ওই জ্বলন্ত সূর্যের দিকে। ওর সমস্ত রন্ধ্রে ঝল্‌মল্ ক'রে উঠলো সূর্যের আলো। আশ্চর্য, এই সূর্যকে ও আজকের মতো ক'রে এর আগে আর কখনো দেখে নি বা জানে নি। আজই প্রথম ও দেখলে সূর্যকে। লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে ও মনে মনে বারবার বলতে লাগলো: সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর।

—কফি খান? ওদের নতুন সংগী প্রশ্ন করলে।

আত্রেয়ী ঘাড় নেড়ে জানালে যে ও-জাতীয় কোনো পানীয়ই ওরা খায় না

—খান না ; অর্থাৎ কখনো দরকার হয় নি ; এই তো ? ও বললে : আচ্ছা, দেখুন এক বাটি খেয়ে। সমস্ত জড়তা আর ক্লান্তি দূর হ'য়ে যাবে। এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার, বুঝলেন ? এই কফি। শরীর ভালো নেই, খান কফি, মন ভালো নেই, খান কফি ; কোনো কিছু করবার নেই, খান কফি। কথা বলবার লোক নেই, খান এক বাটি ; কিংবা কথা বলতে বলতে হয়রান হ'য়েছেন, খান দু' বাটি ; দুশ্চিন্তায় বুকের ভেতরটা প্যাল্পিটেট্ করছে, খান তিন বাটি।

তপতী ওর কথা বলবার এমন নিস্পৃহ ভংগী দেখে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। আত্রেয়ীও মৃদু মৃদু হাসছে। হঠাৎ সটান হ'য়ে দাঁড়িয়ে বক্তা বললে : যাই, ব'লে আসি চার বাটি। আমার আবার দু'টোর কমে চলে না। ততোক্ষণে আপনারা ওই ওধারে সেকেণ্ড ক্লাসের বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। যান যান, ও কেউ কিছু বলবে না।

ও গেলো কফির অর্ডার দিতে। চার বাটি পাঠিয়ে দিতে ব'লে দোকান থেকে ও নেমে এলো নীচের ডেকে ; ঘুরে বেড়ালে চার দিকে ; রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট ; শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা দিলে জলে ফেলে ; পকেট থেকে আর একটা ব'র ক'রে ঠোঁটের ফাঁকে রাখলো চেপে। তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। আত্রেয়ী ও তপতী ততোক্ষণে যথাস্থানে ফিরে এসেছে।

—এখনো দিয়ে যায় নি, না ? ও বললে। গেলো পুনরায় তাগাদা দিতে।

অবশেষে কফি এলো।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ও বললে : দেখুন, দোকানে যা খাবার আছে, তা'তে শরীর সুস্থ থাকবে ব'লে মনে হ'লো

না। তা' আপনাদের সংগে যদি কিছু খাবার থাকে, খেতে পারেন।

আত্রেয়ী লজ্জিত হ'লো। মৃদু কণ্ঠে বললে: না, সংগে তো কিছু নেই। তাড়াতাড়িতে কিছু আনা হ'য়ে ওঠে নি।

—তাহ'লে ধরুন না যদি ডিম আর রুটী খাওয়া যায়? যদি কেন? ঠিক! সেই ভালো। একটু অপেক্ষা করুন; আমি আনতে ব'লে আসি।

ও গেলো বাবুর্চির ঘরে। ব'লে এলো, ডিম আর রুটি মাখন নিয়ে আসতে। কয়েক মিনিট পরেই তক্‌মা-আঁটা বাবুর্চি ট্রে ক'রে নিয়ে এলো খাদ্য।

—ট্রে রেখে যাও। খানিক পরে নিয়ে যেয়ো।

বাবুর্চি চ'লে গেলো। পাশের সেই অত্যাচারিত ভদ্রলোক এবং অন্যান্য যাত্রীরা বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

—নিন্; আরম্ভ ক'রে দিন। ও তুলে নিলে এক টুক্‌রো রুটি।

তপতী কফির পেয়ালায় চুমুক দিলে; আত্রেয়ীও।

—কই? আপনারা খাচ্ছেন না তো? এতো তাহ'লে কা'র জন্যে আনা হ'লো? না, না, এ রীতিমতো অন্যায়। তা' ছাড়া, এ বুঝছেন না, আমিই সব খেয়ে যাবো, সে ভালো দেখায় না। সুতরাং খেতে আপনাদের হবেই।

তপতী আবারো হাসলো। আত্রেয়ী রুটির টুকরো মুখে দিলে।

বেলা বাড়তে লাগলো।

—ঘন্টা দেড়েক হ'য়ে গেলো, ভদ্রলোকের তো পাত্তাই নেই। তপতী বললে।

—হুঁ। আত্রেয়ী শুধু শব্দ করলে।

অবসর।

—এই যে! সংগী আবার উপস্থিত। বললে: দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। প্রায় এগারোটা বাজে; খাবার সময়; কিছু খেলে হয় না?

আত্রেয়ী তাকালে বক্তার মুখের দিকে। দীর্ঘ দেহে বাঁ কাঁধ থেকে কোট্টা ঝুলছে; প্রশস্ত কাঁধ; মুখে যৌবনের দীপ্তি, বালকের সারল্য। কোটের পকেটে একখানা ইংরেজী বই; খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে।

—এখানে কী আর খাবো? আত্রেয়ী মৃদুকণ্ঠে বললে: সেই একেবারে ষ্টেশ্যনে উঠে।

—আর ততোক্ষণ উপোস?

—কতোক্ষণ আর?

ও-ও আর অনুরোধ করলে না। প্রথমে ব'সে পড়লো; তারপর অর্ধশয়ন। পকেট থেকে বইখানা বা'র ক'রে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। সময় ব'য়ে চলেছে; ব'য়ে চলেছে পদ্মার ঢেউ; ভেসে চলেছে ষ্টীম্যর। পৃথিবীতে বইএর কয়েকখানা পাতা ব্যতীত লোকটির কাছে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই আপাততঃ।

আত্রেয়ী ভাবছিলো, সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে ওদের পরিচয় জিগ্‌গেস করা তা'র উচিৎ ছিলো। কিন্তু সে বিষয়ে তো লোকটি কোনো প্রশ্নই করলে না; ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উৎসাহই দেখালে না সে।

—দেখুন!

আত্রেয়ী ওর গলার শব্দ শুনে চমকে উঠলো; তাকালে বক্তার মুখের দিকে।

—নাঃ, ভুলে গেছি, যা' ব'লতে যাচ্ছিলাম। বললে লোকটি।

কিন্তু আত্রেয়ী জানে, ও ভোলে নি। সুতরাং জিগ্‌গেস করলেঃ বলুন না, কী বলছিলেন?

সংকোচ-বোধ আত্রেয়ীর বেশ ক'মে এসেছে। ও বুঝতে পেরেছে, লোকটার কাছে অন্ততঃ সংকোচ করবার কিছু নেই। সুতরাং সহজ হ'য়েছে ও।

—আপনাদের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য। ওদের সংগী জবাব দিলেঃ আপনারা দুই সহোদরা নিশ্চয়?

কিন্তু এ কথা ও বলতে চায় নি। যা' বলতে চেয়েছিলো, তা' চেপে গেলো কেন? বিস্ময় বোধ করলে আত্রেয়ী। তবু ও চুপ ক'রে রইলো; কারণ, অকারণ অনুসন্ধিৎসাটা অশোভন লাগতে পারে।

—ঐ দেখা যাচ্ছে গোয়ালন্দ; আর বেশী দেরী নেই।

—ট্রেইনে খুব ভীড় হবে? তপতী প্রশ্ন করলে।

—অসম্ভব। হাসলে লোকটি।

—তাহ'লে? তপতী চিন্তিত হ'য়ে উঠলো। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ও বহুদিন ভুলবে না।

—তাহ'লেও জায়গা আমাদের পেতেই হবে।

এবার আত্রেয়ীও হাসলো।

আধ ঘণ্টা পরেই ষ্টীম্যর ঘাটে এসে দাঁড়ালো।

আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই চীৎকার, ছুটোছুটি এবং উত্তেজনা।

—চলুন, এগিয়ে যাই যেখানে আপনাদের জিনিষপত্রগুলো আছে। আস্তে আস্তে আসুন; তাড়া করবার কোনো দরকার নেই।

ও নিজের প্রকাণ্ড চামড়ার সুট্‌কেইসটা তুলে নিলে;

নিলে সতরঞ্চিখানা হাতের নীচে চেপে। কাঁধে তেমনিই ঝুলছে কোট্‌টা। ও এগিয়ে চললো।

আত্রেয়ী ও তপতী আসছে ওর পশ্চাতে।

যাত্রীরা ট্রেইনের প্রায় সমস্ত কামরাগুলোই ইতিমধ্যে অধিকার ক'রে ফেলেচে। মেয়েদের গাড়ীতেও বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। ট্রেইনের দুই প্রান্ত পর্যন্তই ওরা ঘুরে ঘুরে দেখলে।

—তাহ'লে কী করা যায়? লোকটি বললে।

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না। এ সব বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই ওর। ও তো এতো যাত্রীর ঠেলাঠেলি দেখে বিব্রত বোধ করছে নিজেকে। সংগে যদি এই ভদ্রলোক না থাকতেন, তাহ'লে রীতিমতো বিপদে পড়তো ওরা।

—আসুন, ওঠা যাক্।

একটা ইণ্ট্যর-ক্লাসের দরজা ঠেলে ও উঠে পড়লো। পুরুষদের কামরা; তবু মধ্যম-শ্রেণী ব'লে ভীড়টা কিছু হাল্কাই ছিলো।

—কিন্তু এটা যে ইণ্ট্যর-ক্লাস। আত্রেয়ী বিস্ময় মিশিয়ে বললে।

—তা' হোক্; যেতে হবে তো। এই নিন, সতরঞ্চিখানা ওপাশে বিছিয়ে ফেলুন। আমি জিনিষগুলো সব ঠিকঠাক ক'রে রাখছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুছিয়ে নিলে ওরা। ট্রেইন্ ছাড়বারো দেরী নেই আর।

—আর উপোস করা যায় না; কি বলেন? ও গেলো খাবার আনতে।

—এতো চা, খাবার, দেখাশোনা···আমার ভারি লজ্জা করছে। আত্রেয়ী বললে।

—নেহাৎ কপাল-জোর, তাই জুটেছে। নইলে দুর্গতির সীমা থাকতো না। হেসে জবাব দিলে তপতী।

খাবার এনে ও বললে : খান।

—নিন টাকাটা। আত্রেয়ী একটা টাকা দেয়ার জন্যে হাত বাড়ালে।

—নেবো ; খেয়ে নিন আগে।

খাওয়ার পর আত্রেয়ী বললে : এবার রাখুন টাকাটা।

—টাকা কেন ?

—দাম।

—এক টাকা তো নয় ; বারো আনা তিন পয়সা। তা'র মধ্যে আপনাদের ভাগে পড়েছে সাড়ে আট আনা। দিন টাকা।

ও টাকাটা তুলে নিলে আত্রেয়ীর হাত থেকে।

—না, না ; আর দিতে হবে না আমায়। টাকাটা আপনিই রাখুন। বললে আত্রেয়ী।

—বাঃ, তা' কেন রাখবো ? এই নিন আপনার সাড়ে সাত আনা পয়সা।

পয়সা না নিয়ে আত্রেয়ী পারলে না। কয়েক মিনিট পরে অবশ্য ওর মনে হ'য়েছিলো কফির দাম-বাবদ কিছু দেয়া হয় নি তখন। কিন্তু আর বলা যায় না সে-কথা ; অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।

গাড়ী ছাড়লো।

গাড়ী যখন শিয়ালদহ ষ্টেশ্যনে এসে পৌঁছুলো তখন রাত্রি নয়টা।

ওরা নেমে পড়লো।

ট্রেইণের মধ্যে সেই বইখানা নিয়ে আত্রেয়ী একবার জিগ্‌গেস করেছিলো ঃ বইটা আপনার ?

—হুঁ ; কেন ? পড়বেন ? বলেছিলো ওদের সংগী লোকটি।

—না ; এমনি জিগ্‌গেস করছি।

আত্রেয়ী দেখেছিলো, বইএর প্রথম পৃষ্ঠায় অনমিত্র সেন নাম লেখা।

—দেখুন অনমিত্র বাবু ! আত্রেয়ী ডাকলে।

—বাঃ, ব্ল্যাক্‌-আর্ট কিছু জানা আছে না কি ?

—না ; হেসে বললে আত্রেয়ী ঃ বইয়ে লেখা রয়েছে দেখলুম।

—কি নাম ? অনমিত্র প্রশ্ন করলে।

—যা' লেখা আছে। জবাব দিলে আত্রেয়ী ঃ চলুন, প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ থেকে বেরুনো যাক।

—চলুন। একটু থেমে আবার বললে অনমিত্র ঃ কোথায় যাবেন ?

—তালতলা ; জোড়া গীর্জার কাছে।

—কে থাকেন সেখানে ? আপনাদের বাড়ী ?

—কাকার বাড়ী।

—কই ? কেউ তো নিতে এলেন না আপনাদের ?

—আসার কিছু ঠিক ছিলো না আগে থেকে।

—আচ্ছা, চলুন তাহ'লে। অনমিত্র বললে ঃ এই কুলি, মাল উঠাও। হ্যাঁ, কিসে যাবেন আপনারা ? ঘোড়ার গাড়ী না ট্যাক্সি ?

—কিন্তু আমরা তো বাড়ী চিনি না। সেই ছেলেবেলায় এসেছিলাম ; কিছুই মনে নেই। কুণ্ঠা মিশিয়ে বললে আত্রেয়ী।

—অতএব পৌঁছে দিতে বলছেন তো? অনমিত্রের প্রশ্নগুলো ভয়ানক সোজা এবং স্পষ্ট।

—আপনার কি খুব বেশী অসুবিধে হবে? আরো নরম ক'রে আত্রেয়ী বললে।

—কই? তেমন কাজ তো কিছু নেই। চলুন।

ওরা তিন জনেই উঠে বসলে ট্যাক্সিতে। গাড়ী ষ্টার্ট নিলো।

—আপনাদের বাবা নেই? অকস্মাৎ অনমিত্র জিগ্‌গেস করলে। ওর চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। নীচে আর সামনের সীটে মালপত্রগুলো বোঝাই হ'য়ে রয়েছে। ওরা তিন জনেই পাশাপাশি বসে'।

—না।

অবসর।

—তালতলায় কোথায় কাকার বাড়ী? অনমিত্র জিগ্‌গেস করলে।

—ডক্‌টরস্‌ লেইন।

আবার কয়েকটা মুহূর্তের ছেদ।

—আপনি কোথায় থাকেন? এতোক্ষণে প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী। ওর এবং অনমিত্রের ব্যক্তির মাঝে কোনো ব্যবধান নেই।

—টালিগঞ্জ।

—আমাদের ওখান থেকে কতোদূর?

—অনেক। একেবারে শহরের শেষ সীমানায়।

তপতী নীরবে দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি ক'রে চলেছে কলকাতা শহরকে।

বাড়ীর নম্বর দেখে দেখে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার সামনে ট্যাক্‌সি থামলো।

অনমিত্র নেমে এসে ওদের জিনিষগুলো দরজার সামনে নামিয়ে রাখলে।

—আচ্ছা; চললাম।

সশব্দে ট্যাক্‌সির দরজাটা টেনে দিলে অনমিত্র। গাড়ী আবার ঘুরে চলতে লাগলো।

বাইরে বৈঠকখানায় আলো জ্বলছিলো; কিন্তু দরজা বন্ধ। দরজার পাশে দুটো ট্র্যাংক্ এবং বিছানা; কোণ ঘেঁসে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে। বাড়ীর আর কারো নাম আত্রেয়ীর মনে নেই। এখন কী ব'লে ও ডাকে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনেই ঘামতে লাগলো। দরজায় একটা কড়াও নেই যে নাড়ে। কপাল ঠুকে ওরা দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট; যদিই কেউ দৈবক্রমে এসে পড়ে। কিন্তু দেখা নেই কারও।

আর না ডেকে থাকা যায় না। রাস্তার লোকগুলো ওদের অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছিলো। প্রবল কণ্ঠে তপতী ডাকলে: কাকাবাবু!

চাকর এলো। প্রশ্ন করলে: কা'কে চান আপনারা?

তপতী জবাব দিলে: বসন্ত বাবু আছেন?

লোকটা বিস্মিত হ'য়ে বললে: আছেন। আসুন আপনারা ভেতরে।

—তুমি আগে গিয়ে খবর দাও। আত্রেয়ী বললে।

চাকর ছুটে গেলো ভেতরে। ওরা তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে। ভেতরে প্রবেশ করবার সাহস ওদের নেই।

কয়েক মিনিট পরে বসন্তবাবুকে দেখা গেলো। রোগা লোক; প্রথমেই চোখে পড়ে ধারালো নাকটা; দীর্ঘ

গোঁফ ; গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া। তিনি জিগ্যেস করলেন : কে ?

—আমরা কাকাবাবু, আমরা। ভয়ে ভয়ে আত্রেয়ী বললে : আমি আত্রেয়ী আর তপতী

বসন্ত বাবু অবাক হ'য়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। অনুচ্চ স্বরে তিনি বললেন : ও, তোমরা ? এসো এসো, ভেতরে এসো। ওরে ! মালগুলো নিয়ে যা ওপরে। তারপর ? কী খবর তোমাদের ?

আত্রেয়ী ও তপতী বসন্ত বাবুর পায়ের ধূলো নিলে। আর কিছু যেন বলতে পারছে না ওরা।

—কা'র সংগে এলে তোমরা ? বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন : কই, সংগে তো কেউ নেই ?

মাথা নীচু রেখেই আত্রেয়ী ব'লে চললো : দাদার এক বন্ধু এলেন ; তাঁরি সংগে এলাম। এই তো গেলেন, এই মাত্র। দাদা ছুটি পেলেন না ; অথচ অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। হ্যাঁ, কাকীমা কেমন আছেন ?

—ভালোই। চলো, ওপরে

বসন্ত বাবুর পেছনে পেছনে ওরা দোতলায় এলো। শব্দ শুনে বসন্ত বাবুর স্ত্রী সুরবালা বাইরে এলেন। বললেন : ওমা ! তোমরা কোত্থেকে ?

অভ্যর্থনা নেই ওঁর স্বরে।

ওঁর পায়ের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে মৃদু কণ্ঠে আত্রেয়ী বললে : এলাম কাকীমা, আপনাদেরি কাছে

সাত

আত্রেয়ী ও তপতীর জন্যে একটা নির্দিষ্ট ঘর নির্বাচিত ক'রে দিয়েছেন ওদের কাকীমা। নিজেদের জিনিষপত্রগুলো ওরা গুছিয়ে নিয়েছে সেই পরিধিটুকুর মধ্যে। দু'খানা তক্তাপোষ, একটা আল্‌না। ঘরে কোনো তাক্ নেই। বই, খাতা থেকে সুরু ক'রে চুলের কাঁটা চিরুণী পর্যন্ত সমস্ত ট্রাংক্‌টার ওপর সাজিয়ে রাখতে হ'য়েছে। কাকীমার কাছে একখানা টেব্‌ল্ চেয়েছিলো। বলেছেন, পরে দেখা যাবে।

কয়েকদিন নির্বাধে কেটে গেলো।

সুরবালা বলছিলেন : কোনো খবর দেয়া নেই কিচ্ছু না, হঠাৎ এমনি এসে পড়লে ?

তিনি তখন তরকারী কুটছিলেন একতলার ঘরে। খানিক আগেই চা-পর্ব শেষ হ'য়েছে। এই সময়টায় খাবার ঘরে বাড়ীর সমস্ত ছেলে-মেয়ে একত্রিত হয়। দু' টুক্‌রো ক'রে রুটী আর এক পেয়ালা চা, এই ওদের সকাল বেলার খাদ্য। বয়েস যা'দের অল্প তা'রা পায় এক টুক্‌রো রুটী আর এক পেয়ালা দুধ। বসন্তবাবুরা দুই ভাই। ছোটো ভাই হেমন্ত। বসন্তবাবুর পাঁচ সন্তান। বড়ো ছেলের বয়েস একুশ ; কলেজে পড়ে ; নাম অমরেশ। হেমন্তবাবুর সাতটি ছেলে মেয়ে ; সবাই স্কুলে পড়ে। আত্রেয়ী এই বসন্তবাবুকেই চিনতো। হেমন্তবাবুকে ও দেখেনি কখনো।

—এখানে পড়বো, কাকীমা। বিনীত কণ্ঠে আত্রেয়ী বললে : আপনারা ছাড়া আর তো আমাদের কেউ নেই। কা'র কাছে যাবো ?

সুরবালা জিগ্‌গেস করলেন : কোন ক্লাসে পড়ো তোমরা ?

আত্রেয়ীর বলতে লজ্জা হচ্ছিলো যে ও কলেজে পড়ে এবং তপতীও কলেজেই ভর্তি হবে। কয়েক মিনিট নীরব রইলো ও।

—কলেজে পড়বো। কোনো রকমে ব'লে ফেল্‌লে ও শেষ অবধি : স্কুলের পড়া শেষ করেছি দু'জনেই।

—মেয়েদের, বুঝলে ? এতো পড়া ভালো নয়। সুরবালা বললেন : কী হবে অতো প'ড়ে ? তা'রা তো আর ডেপুটীগিরি করতে যাবে না ; আর শেষ অবধি সেই সন্তানও পেটে ধরতে হবে।

আত্রেয়ীর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো।

নীরবতা।

—আপনাদের কতো অসুবিধা করলাম। আত্রেয়ী নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রে বললে।

সুরবালা উত্তর দিলেন : এসে যখন পড়েইছো, তখন তাড়িয়ে তো আর দিতে পারবো না। ওসব কথা ব'লে আর লাভ কি ?

সামান্য আলাপেই কণ্ঠে এতোখানি ঝাঁঝ আত্রেয়ী আশা করে নি। সামলে নিয়ে ও বললে : কিছু মনে করবেন না, কাকীমা ; আমি তো কিছু ভেবে বলি নি।

—কিন্তু ভেবে বলবার বয়েস তো হ'য়েছে বাছা। শ্লেষ করলেন সুরবালা।

চেপে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। আত্রেয়ী চুপ করলে। কলেজে ভর্তি হওয়ার কথাটা ও বলবে ভেবেছিলো। কিন্তু আর ভরসা হ'লো না। যদিও ভর্তি হওয়ার টাকাটা ওর নিজেরই আছে, তথাপি সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপন করার সাহস উপস্থিত ওর নেই।

অপরাহ্নে কাছারী থেকে ফেরবার পর বসন্তবাবুকে সুরবালা বললেন: দেখো বাপু, আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না। এই বেলা বিদেয় ক'রে দাও বলছি, নইলে ভীষণ মুস্কিলে পড়বে।

—মুস্কিল আর কি? স্বভাব মতো শান্ত স্বরে বললেন বসন্তবাবু: কয়েকটা টাকা অতিরিক্ত খরচ হওয়ার ভয়; এই তো? তা' যদি হয়ই তো হোক্। দু'টো মেয়ে কলেজে পড়তে চাইছে, এ যে কতো ভালো কারণ, সেটাও ভেবে দেখো।

—অতো সৎকাজে দরকার নেই। নিজের সুপরামর্শে সমর্থন না পেয়ে ফেটে পড়লেন সুরবালা বারুদের মতো: টাকাও অতো সস্তা নয়; আর বড়ো ধর্ম-কর্মই করবে? টাকা দিতে পারবে না তো টিকিট খরচা ক'রে কলকাতায় আসা কেন? পড়তে? অতো ফিরিংগী চালের কি দরকার? তুমি ওদের ব'লে দাও, বাড়ী ফিরে যাক। দু' দুটো ধিংগি মেয়েকে খেতে পরতে দিয়ে কলেজে পড়ানোর খরচা কতো, হুঁস রাখো? তুমি না পারো আমিই ব'লে দিচ্ছি।

বিব্রত বোধ করলেন বসন্তবাবু। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্তি ওঁর হয় না; নোঙরামিকে ওঁর নোঙরাই লাগে। কিন্তু নিরীহ শান্ত মন ওঁর অপরিহারণীয়ার উগ্রবৃত্তির কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেয়া ছাড়া পথ খুঁজে পায় না। অনর্থকে উনি এড়িয়েই যেতে চান; তা'য় স্ত্রী; উপরন্তু উগ্র বৃত্তির।

—এখন তুমি কিছু বোলো না। বসন্তবাবু অনুচ্চ কণ্ঠেই বললেন: এসেছে; কিছু দিন থাক। যেতে বলতে হয়, আমিই বলবো।

সন্ধ্যার সময় সুরবালা গেলেন বেড়াতে। বসন্তবাবু ডেকে

পাঠালেন আত্রেয়ীকে। ওরা দুই বোন তিনতলার একটা ঘরে থাকে।

—কি করছিলে, মা? বসন্তবাবু জিগ্‌গেস করলেন।

—বই পড়ছিলাম একখানা।

—বে…শ।

কয়েক মিনিটের ছেদ।

—কোথায় পড়বে ঠিক করেছো? কোন কলেজে? পুনরায় প্রশ্ন হ'লো।

ঢোক গিলে নিয়ে আত্রেয়ী জবাব দিলে: কই, কিছু তো ঠিক করি নি। আপনি যা' ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

—তপতীও কি ম্যাট্রিক্ পাশ করেছে?

—হ্যাঁ, এই বছরেই।

অবসর।

—দু'জনেই পড়ো বেথুনে। মনে মনে স্থির ক'রে নিয়ে বললেন বসন্তবাবু: অমরেশকে বলবো, কালই তোমাদের নিয়ে গিয়ে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসবে। আর টাকা…

—টাকা আপাততঃ আমাদের কাছে যা' আছে, আত্রেয়ী বাধা দিয়ে বললে: তা'তেই কোনো রকমে চলে' যাবে। পরে তো দরকার হবেই তখন নেবো।

—সে টাকাটা সরিয়ে রেখে দাও, সময়ে অসময়ে দরকার হ'তে পারে। বসন্তবাবু বললেন: উপস্থিত এই ক'টা রাখো। তোমার কাকীমা জানতে না পারেন।

এক গোছা নোট তিনি আত্রেয়ীর হাতে দিলেন। ওর সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়লো বসন্তবাবুর পায়ে। কী ভাবে ও প্রকাশ করবে সে কৃতজ্ঞতা বুঝে পেলে না। অব্যক্ত ভাবাবেগে ও অস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নীচে শোনা গেলো সুরবালার কণ্ঠস্বর।

—যাও মা, শিগ্‌গির তোমাদের ঘরে চলে' যাও। ব্যস্ত হ'য়ে বসন্তবাবু বললেন: আর, হ্যাঁ, কথা উঠলে বোলো, তোমার কাছে টাকা ছিলো।

আত্রেয়ী প্রায় পালিয়ে গেলো সেখান থেকে।

সুরবালা এলে বসন্তবাবু বললেন: দেখো, আত্রেয়ী বলছিলো, কালই কলেজে ভর্তি হ'তে চায়। তা' তুমি কি বলো?

—আগে তুমি কি বললে, তাই শুনি। প্রায় গর্জে উঠলেন সুরবালা।

—আমি বলেছি, তোমাকে জিগ্‌গেস করতে। বললেন বসন্তবাবু। দেবতারা সন্তুষ্ট ভক্তিতে আর শ্রীমতীরা খোসামদে। মনের কোণে ওঁর ঈষৎ হাসিও খেলে গেলো।

সুরবালার অন্তরে স্বামী-শ্রদ্ধা দ্বিগুণিত হ'লো।

—কাল হ'য়তো টাকা চাইতে পারে তোমার কাছে। বসন্তবাবু বললেন: তখন বলবে কী?

—সে বলবো আমি ঠিকই; দেখো না। সুরবালা প্রস্থান করলেন।

পরদিন আত্রেয়ী কথাটা তুললো: ব'সে থেকে আর কী হবে, কাকীমা? এবার কলেজে ভর্তি হওয়া যাক।

সুরবালা নিমেষে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি; কিন্তু সংগে সংগেই আত্রেয়ী বললে: আপাততঃ টাকা আমার কাছে যা' আছে তা'তে আমাদের দু'জনেরই ভর্তি হওয়া, বই কেনা, কলেজের মাইনে ইত্যাদি সব হ'য়ে যাবে। আর দাদা প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাবেন কথা আছে।

সুরবালা এতোখানি আশা করেন নি। তিনি রীতিমতো আহ্লাদিত হ'য়ে উঠলেন। অবশ্য বাইরে তা' প্রকাশ পেলো

না। তিনি বললেন : কতো আর পড়বে, মা ? সংসার করবার বয়েস কি তোমাদের হয় নি ?

এটা যে খোসমেজাজের কথা তা' বুঝতে আত্রেয়ীর সময় লাগলো না। ও বললে : সে হবে এখন।

সুরবালা কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। কিন্তু তবু বলা যায় না কিছু, তিনি ভাবলেন, কোনো মাসে হয়তো বলবে, এমাসে টাকা পাঠান নি দাদা, কলেজের মাইনেটা আপনাকেই ব্যবস্থা করতে হবে—তখন তিনি কেমন ক'রে 'না' বলবেন, সে-কথাটাই ভেবে স্থির করতে পারলেন না।

দুই বোনে কলেজে ভর্তি হ'য়ে এলো। অমরেশ নিয়ে গিয়েছিলো ওদের। বেশ সপ্রতিভ ছেলে ; বুদ্ধিমান। আলাপ ক'রে আত্রেয়ী হতাশ হ'লো না। তপতী ফার্স্ট ইয়্যর এবং আত্রেয়ী একটা পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ইয়্যরে ভর্তি হ'লো।

প্রথম কিছুদিন অমরেশের সংগে এবং পরে ওরা দুই বোন কোনো সংগী না নিয়েই ট্রামে ক'রে কলেজ যাতায়াত করতে লাগলো। অমরেশও স্কটিশে পড়ে। দৈবক্রমে আত্রেয়ী এবং ওর সাব্জেক্ট্ও একই।

অমরেশ বলেছিলো : অনর্থক পয়সা খরচ ক'রে বই কিনবেন কি না, ভেবে দেখুন। আমাদের যখন একই সাব্জেক্ট্, আর আমার বই আপনি যখন ইচ্ছে প্রয়োজন হ'লেই নিতে পারেন, তখন আর…

—কিন্তু তা'তে আপনার তো পড়ার অসুবিধে হ'তে পারে। আত্রেয়ী জবাব দিয়েছিলো।

—কিছু না, অমরেশ বললে : নিজেদের পড়বার রুটীনটা অদল-বদল ক'রে নিলেই ব্যাপারটা সহজ হ'য়ে যাবে।

সমাধানটা আত্রেয়ীর মাথায় আসে নি। হঠাৎ এতোগুলো টাকা বেঁচে গেলো দেখে রীতিমতো আনন্দ বোধ করলে ও।

দিন কাটতে লাগলো।

আত্রেয়ী এবং তপতীর জীবন নিয়মাধীন হ'য়ে এলো। বিদ্যা-সমুদ্রে ওরা ডুব দিয়েছে। যখন টাকার দিক দিয়ে কোনো লোকসান হ'চ্ছে না এবং যখন তখন যে কোনো কাজ মেয়ে দু'টোকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়, তখন থাকুক না ওরা একধারে প'ড়ে; ক্ষতি কি? সুরবালা ভাবেন। তাঁর দু'টি শিশু কন্যার দেখা-শোনা করবার জন্যে একজন পরিচারিকা ছিলো। আত্রেয়ী ও তপতী আসার মাস দুই পর থেকে তা'র চাকরী গেলো। দুই বোন সর্বদা কাকীমাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সন্ত্রস্ত হ'য়ে থাকে। শিশু দু'টির সমস্ত পরিচর্যা ওরা নিখুঁতভাবে করে। আরো অনেক কিছু করবার জন্যে ওরা অম্লান-বদনে অপেক্ষা ক'রে রইলো।

—এর মানেটা কি? অমরেশ মাকে জিগ্‌গেস করলে একদিন।

—কিসের মানে? সুরবালা বিস্মিত হ'লেন।

—এই ভদ্রলোকের মেয়ে দু'টোকে খাটাবার জন্যে ঝি ছাড়িয়ে দেয়া? অমরেশ মায়ের মুখের দিকে না তাকিয়েই বললে।

—কি বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি। ঝি-টাকে ছাড়িয়ে দিলে কেন?

—কিসের আর দরকার ঝিয়ের? ওরাই তো সময় ক'রে নিয়ে সামলায় মেয়ে দু'টোকে।

—সময় ক'রে নয়; সময়ের অপব্যবহার ক'রে। অমরেশ তিক্ততা মিশিয়ে বললে: মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা থাকে, তোমার তা'ও নেই, মা।

ও স্থানান্তরে গেলো।

সুরবালা রাগে ফুলতে লাগলেন। গেলেন ওপরে।

আত্রেয়ী তখন ছোটো মেয়েটাকে কাঁধের ওপর ঘুম পাড়াচ্ছিলো।

—দাও ইদিকে।

সুরবালা ওর হাত থেকে নিতান্ত রূঢ়ভাবে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিলেন। আঘাত পেয়ে আচমকা মেয়েটা চীৎকার ক'রে উঠলো। আত্রেয়ী অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো সুরবালার দিকে।

—যথেষ্ট হ'য়েছে। আর দয়া ক'রে রাখতে হবে না ওকে। আমার মেয়ে, আমিই সাম্‌লাবো। দাও ওকে ইদিকে।

হতবুদ্ধি আত্রেয়ী একটা বস্তুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সুরবালা তেমনি অভদ্র এবং কর্কশ কণ্ঠে বললেন: তোমাদের সময়ের অপব্যবহার হয় এতে; তোমাদের আমি ঝিয়ের মতো খাটাই, তাচ্ছিল্য করি। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই আমার। বাড়ীর সবাইর দরদ তোমাদের জন্যে; আর আমিই যতো···

—এসব আপনি কি বলছেন, কাকীমা? বাধা দিয়ে আত্রেয়ী বললে।

—জিগ্‌গেস কোরো অমর এলে। এরই মধ্যে এতো দরদ?

তিনি নেমে গেলেন নীচে। মেয়েটার কান্না তখনো শোনা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর এক ফাঁকে আত্রেয়ী অমরেশকে বললে: আপনি কি এখানে আমাদের থাকতে দেবেন না?

অমরেশ আশা করে নি এটা; বললে: কেন? কি হ'য়েছে কি?

—কী বলেছেন আপনি কাকীমাকে?

—যা' বলা উচিত ছিলো, তাই। অমরেশ জবাব দিলে।

—কিন্তু ওতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কি আর কাজ? দয়া ক'রে ভবিষ্যতে বলবেন না আর কিছু।

অমরেশ কোনো উত্তর দিলে না। অপ্রস্তুত ভংগীতে স্থানত্যাগ করলে ও।

আত্রেয়ীদের ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো। ও সে বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। ওদের সংগে ছোটো একটা জাপানী টেব্‌ল্-ল্যাম্প ছিলো। আজ ক'দিন থেকে তাই দিয়েই ওরা কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

সন্ধ্যার সময় যখন ওরা পড়ছে, দরজার বাইরে থেকে অমরেশ মৃদু কণ্ঠে ডাকলে: দেখুন!

আত্রেয়ী মুখ ফেরালো।

—ঘরের বাতিটা একটু ঠিক ক'রে দেবো। অমরেশ বললে: এখন কি অসুবিধে হবে আপনাদের?

ওর হাতে খানিকটা তার, একটা বাল্‌ব্ এবং আরো কয়েকটা ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি। আত্রেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকলে। অমরেশ এলো ঘরের মধ্যে। কোনো টেব্‌ল্ ছিলো না ও-ঘরে। টেব্‌ল্ ওরা পায় নি। চেয়ার অবশ্য রয়েছে একখানা। ঈষৎ নড়ে; তা' হোক্।

—মাকে ব'লে নীচে থেকে একখানা টেব্‌ল্ আর একখানা চেয়ার আনিয়ে নিলেই তো পারেন। এমন করে' কখনো পড়া যায়?

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না।

—দেখি, বিছানা গুটিয়ে নিন; আলোটা ঠিক ক'রে দিই।

অমরেশ চেয়ারের ওপর ওর জিনিষগুলো রাখলে।

আত্রেয়ীর মুখে কথা নেই [illegible] স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। কোনো উত্তর না পেয়ে অমরেশ একটু আশ্চর্য হ'লো। অবশেষে আত্রেয়ীই বললে: কী হবে ইলেক্‌ট্রিক্-লাইটে?

—কি হবে মানে? অমরেশ বললে: ক্ষতি তো কিছু নেই। পয়েন্ট রয়েইছে; বাতিটা লাগিয়ে দিলেই তো চমৎকার আলো পাওয়া যাবে।

—এতেই যথেষ্ট চমৎকার দেখা যাচ্ছে। আত্রেয়ী বললে।

অমরেশ একটু অপ্রস্তুত হ'লো।

—কই দেখা যাচ্ছে? স্তিমিত কণ্ঠে ও প্রতিবাদ করলে: তা' ছাড়া বাতি যখন জ্বালালেই জ্বালা যায় তখন অসুবিধে সইবার কোনো দরকার আছে কি?

—হ্যাঁ, দরকার আছে। কঠিন কণ্ঠে আত্রেয়ী উত্তর দিলে।

—কি দরকার? অমরেশও রুখে দাঁড়ালো।

—সে আপনি বুঝবেন না।

ব্যস্। এর পর আর কোনো কথা চলে না। আত্রেয়ী দীর্ঘ ছেদ টেনে দিলে। অমরেশ ফিরে গেলো; ওর পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে সিঁড়িতেই মিলিয়ে গেলো।

এর পর অমরেশ আর কথা বলেনি আত্রেয়ার সংগে। হঠাৎ ওর ইংরাজি বইখানার দরকার পড়েছিলো খুব। বই তখন আত্রেয়ীর কাছে। কিন্তু তা'র কাছ থেকে বই ও চায়নি। এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসে কাজ চালিয়ে দিয়েছে।

অকস্মাৎ একদিন সুহৃদ এসে হাজির।

বসন্তবাবু ওকে চিনতেন। অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

—কেমন আছে ওরা? উৎকণ্ঠিত সুহৃদ প্রশ্ন করলে।

প্রশ্নটা আকস্মিক। বসন্তবাবু পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসলেন: কা'রা?

হঠাৎ সুহৃদের বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠলো। তাহ'লে ওরা কি এখানে আসে নি? গেলো কোথায়? কোথায় পথে পথে

ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরি বোনেরা? মুহূর্তের মধ্যেই এই চিন্তাগুলো সুহৃদকে অসহায় ক'রে তুললে।

অবশ্য তখনই বসন্তবাবু বললেন: ও...আত্রেয়ী তপতীর কথা বলছো? কেন? ওরা তো ভালোই আছে। হ্যাঁ, ওদের দু'জনকেই দিয়েছি বেথুনে। বেশ পড়াশুনা করছে; অসুবিধে নেই কিছু। চলো, যাই ওপরে।

ওরা সুহৃদকে আশা করে নি। হঠাৎ একেবারে সামনাসামনি ওকে দেখে দু' বোনেরই অন্তর সাংঘাতিক ভাবে দুলে উঠলো।

সুহৃদও অপ্রস্তুত বোধ করছিলো খানিকটা। সামলে নিয়ে জিগ্‌গেস্ করলে: কেমন আছিস?

ওরা জানালে যে ওরা খুবই ভালো আছে। ক্রমশঃ বিস্তারিত জানালে যে ওদের কোনো অসুবিধে নেই; পড়াশোনাও বেশ ভালোই চলছে। তারপর আত্রেয়ী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এক এক ক'রে সমস্ত সংবাদ জিগ্‌গেস করলে। বাড়ীতে লক্ষ্মণ একা। ভাত রাঁধে, খায়, গান করে। শর্মিলাকে সুহৃদ বহুবার বাড়ীতে আনবার চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু আসতে চায় না সে। আর তা' ছাড়া আত্রেয়ী তপতীও চলে' এসেছে, এখন তো আসা হ'তেই পারে না। আছে শর্মিলা ভালোই। সুহৃদ শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে। মাঝে মাঝে আসে নিজের বাড়ী। কিন্তু কে-ই বা আর আছে সেখানে?

সুহৃদ নিশ্চিন্ত হ'লো। বোনেরা যে ভালোভাবে আছে, কোনো অসুবিধে তা'দের নেই—এ কথা জেনে ও নিশ্চিন্ত হ'লো। নিজেকে ও কিঞ্চিৎ হাল্কা বোধ করতে পারলে। অপরাধের মাত্রা ওর মনে হ'লো কিছু কমেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ও ফিরে এলো কর্মক্ষেত্রে। আসবার সময়ে আত্রেয়ীর হাতে ও কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে এসেছে। আত্রেয়ী

নিতে চায় নি কিছুতেই। শুধু ওর চোখ দুটো ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিলো। সুহৃদ ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলো : এখনো রাগ কমেনি ?

সুতরাং আত্রেয়ী টাকা না নিয়ে পারে নি। দাদাকে দিয়ে ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো সব কিনিয়ে নিয়েছে। কাকীমার জন্যে একখানা দামী কাশী-সিল্কের শাড়ীও। এতোদিন ও এর জন্যে অমরেশকে বলবে ভেবেছিলো ; কিন্তু সে-দিনের সে ঘটনার পর অমরেশ ওর দিকে একবারও তাকায়নি মুখ তুলে।

বিকেলে কলেজ থেকে এসে আত্রেয়ী নতুন কাপড়ের ব্লাউস্ সেলাই করছিলো। তপতী সামনের খোলা ছাদের এক ধারে মাদুর বিছিয়ে বই পড়ছিলো। এমন সময়ে সুরবালা এলেন। তিনতলায় তিনি কদাচিৎ আসেন। মোটা মানুষ ; সিঁড়ি বাইতে কষ্ট হয়। বললেন তিনি : ওকি মা ? নীচে সেলায়ের কল রয়েছে ; তুমি হাতে জামা সেলাই করছো কেন ?

আত্রেয়ী চট্ ক'রে কী উত্তর দেবে ভেবে পেলো না। বললে : সেলাই করতে আমায় খুব ভালো লাগে। কলতো রয়েইছে কাকীমা, দরকার হ'লে—

কল কিন্তু হেমন্তবাবুর স্ত্রী বিরজার ঘরে। তিনি আড়ালে থাকেন ; ঘর থেকে বাইরে আসেন কম। এখনো ভালো ক'রে আত্রেয়ীদের সংগে তাঁর আলাপই হয় নি।

তপতী বই বন্ধ ক'রে মাদুরটা তুলে নিয়ে এসে সুরবালার জন্যে বিছিয়ে দিলে। বসলেন তিনি। আত্রেয়ী সজাগ হ'লো ; ব্যাপার কি ? একেবারে তিন তলায় ?

—কাপড় বুঝি দাদা কিনে দিলে ? তিনি জিগ্‌গেস করলেন।

আত্রেয়ী প্রস্তুত ছিলো। বললে : হ্যাঁ।

—কাপড় আনাবার আগে আমাকে একবার বললে না কেন? কই, আমি তো জানি না তোমাদের জামা নেই।

—না, আছে; তবু কয়েকটা করিয়ে রাখছি। এই সামান্য বিষয় নিয়ে আবার আপনাকে বিরক্ত করবো?

—বিরক্ত আর কি? যখন যা' দরকার হবে বলবে না? ওমা! মেয়ের কথা শোনো।

দুপুরের স্বচ্ছ আকাশে হাল্কা মেঘ ভেসে যায়। ঠিক তেমনিই অতিবাহিত হয় ওদেরো দিন। আত্রেয়ীর মন শান্ত: অন্তর ওর নিস্তরংগ। সংসারের বৈশিষ্ট্যহীন ঘটনাগুলো ওর মনের আকাশে শুধু ভেসে যায়, কোনো রেখা রেখে যায় না।

সেদিন অপরাহ্ণে ওরা দু'বোন ট্রামে বাড়ী ফিরছিলো। গাড়ীর মধ্যে হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকলে: এই যে···

আত্রেয়ী ঘাড় ফেরালে। গ্রীষ্মের সেই অনমিত্রবাবু। কোট্টা তেমনিই কাঁধে ঝুলছে। ভদ্রলোক কি কোট্টা ঠিক ক'রে গায়ে দেবারও সময় পান না, না কি? আত্রেয়ী ভাবলে। ভদ্রলোককে আরেকটু হ'লে ও প্রায় ডেকেই ফেলেছিলো আর কি ওদেরি কাছের একটা সীটে বসতে। কিন্তু সামলে নিলে ও; ডাকলে না শেষ পর্যন্ত। অনমিত্র আপনা থেকেই উঠে এসে বসলো ওদের সামনের খালি সীট্টায়; বসলে ও মুখ ঘুরিয়ে।

—কেমন আছেন? আত্রেয়ী আপ্যায়িত করলে।

—খুব ভালো।

অনমিত্রের চুলগুলো তেমনি বিশৃংখল; সিগারেটটা এখনো ধরায় নি; কতোক্ষণ যে ঠোঁটেই চেপে রেখেছে কে জানে? কোটের পকেটে একখানা ইংরেজী বই। পাশে কোনো লোক

নেই। সুতরাং পকেট থেকে দেশলাই বা'র ক'রে ও এবার সিগারেটটা ধরিয়ে নিলে।

—বেথুনে পড়ছেন বুঝি ? কয়েক মিনিট পরে ও জিগ্‌গেস করলে।

—হুঁ। আত্রেয়ী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে।

ট্রাম বিবেকানন্দ রোড ছাড়িয়ে এসেছে।

এবার আত্রেয়া প্রশ্ন করলে : এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

—আড্ডায়। মাঝে মাঝে আসতে হয়, এই আর কি! অনমিত্র সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে বললে : আরো একদিন দেখেছিলাম আপনারা ট্রামে ফিরছেন। আমি অবশ্য ছিলাম পেছনের একটা সীটে; বই পড়ছিলাম একখানা। ভেবেছিলাম, পাতাটা শেষ ক'রেই আপনাদের কাছে এসে বসা যাবে। কোন্ জায়গাটায় যেন গিয়ে হঠাৎ চোখ তুলেই দেখি, আর আপনারা নেই। কোথা থেকে আপনারা গাড়ী বদ্‌লান ?

—হ্যারিস্‌ন্ রোড।

—ও।

গাড়ী এসে থামলো হ্যারিস্‌ন্ রোড জংশানে। ওরা দু'বোন উঠে দাঁড়ালে; এবার নামতে হবে।

—নামবেন ? প্রশ্ন করলে অনমিত্র।

—আপনি নামবেন না ? আত্রেয়ী অকস্মাৎ অতর্কিত অবস্থায় প্রশ্ন ক'রে বসলো।

—আমি ? আচ্ছা, চলুন।

নামলে তিন জনে। পার্ক সার্কাসের গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা।

গাড়ী আসতে কয়েক মিনিট দেরী হ'চ্ছিলো। অনমিত্র সিগারেটটা ফেলে দিলে। দু'বোন ঘন ঘন পশ্চিম পথে

তাকাচ্ছে ; আর অনমিত্র আপন মনেই স্বল্প পরিধির মধ্যে পায়চারি করছে।

—আপনাকে আবার অনেক দূর ঘুরে যেতে হবে। আত্রেয়ী আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বললে।

ওদের ট্রাম এসে গেছে। উৎকট্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দে আত্রেয়ীর কথা চাপা প'ড়ে গেলো। হয়তো অনমিত্রের কান অবধি গিয়েও পৌছায় নি। তিন জনেই ট্রামে চ'ড়ে পড়লো।

—তারপর ? অনমিত্র জিগ্‌গেস করলে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

—কি ? আত্রেয়ীর কণ্ঠে কৌতুক।

অনমিত্র নির্বাক।

—আপনি কোন দিকে যাবেন ? আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে।

—কি জানি ? যাবো নিশ্চয়ই কোনো রাস্তা দিয়ে। কেন ? পথ নেই না কি ?

—বাঃ, তা' থাকবে না কেন ?

—কি ?

—ওই যে আপনিই বললেন, পথ ? আত্রেয়ী বিস্মিত হ'লো।

—না, নেই। অনমিত্র বললে : সমস্ত পথেই বড়ো বড়ো অক্ষরে কী লেখা আছে জানেন ?

—কি ?

—রোড্ ক্লোজ্‌ড্। অনমিত্র বললে : মানে, জার্নিস্ এণ্ড্।

আত্রেয়ীর বুকটা অকস্মাৎ ছ্যাৎ ক'রে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ও সামলে নিয়ে বললে : কিন্তু আমার জার্নি বিগিন্‌স্। পথের বোধ হয় শেষ নেই। চলতেই হবে।

অনমিত্র কোনো উত্তর দিলে না। পাশের লোকটিকে বললে : আপনার কাছে দেশলাই আছে, মশাই ?

ভদ্রলোক বললেন : না ; দুঃখিত।

অতএব অনমিত্র কোটের পকেট থেকে দেশলাই বা'র ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে।

—পকেটে ওখানা কি বই ? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—একখানা ইংরেজী বই।

—কি বই ?

—দেখে নিন্।

পকেট থেকে বইখানা বা'র ক'রে অনমিত্র আত্রেয়ীর হাতে দিলে।

বইখানা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো ও। বার্ণার্ড্ শ' এর অ্যান্‌সোশ্যল সোশ্যলিষ্ট। বইএর নামটা ও অনেকের মুখেই শুনেছে।

—পড়বেন না কি ? অনমিত্র হঠাৎ জিগ্‌গেস করলে।

গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশ্যনের কাছে এসে পড়েছে।

—না ; আপনার পড়া হয় নি এখনো। তা' ছাড়া···

—তা' ছাড়া কি ?

—আপনাকে বইটা ফেরত দিতে হবে তো ?

—তা'র সংগে পড়ার সম্বন্ধ কি ? ফেরত না দিতে বলছি না কি ?

—কোথায় তখন আপনার দেখা পাবো ?

—ও······তা' অবশ্য কি ক'রে বলি এখন। তা' ব'লে ইচ্ছে আছে, অথচ বইখানা পড়বেন না ? না, ও আপনি নিয়ে যান

বই সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় কথা উত্থাপন করা চলে না।

কয়েক মিনিটের ছেদ।

ট্রাম এগিয়ে চ'লেছে।

—আপনি কোথায় থাকেন ? আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে।

—বালিগঞ্জ।

—বাঃ, সেদিন যে বললেন টালিগঞ্জ ?

—জানেন তো আবার জিগ্‌গেস করছেন কেন ? বেশ জোরে হাসতে লাগলো অনমিত্র।

—প্রথমটায় মনে আসে নি। আত্রেয়ী বললে : তা' অতো হাসবার কি পেলেন ?

—একটা কথা মনে পড়লো।

—কি কথা ?

—হাসি বন্ধ হওয়ার পর আর সে কথা মনে নেই। আপনি আমায় হাসতে দিলেন না কেন ?

—আপনি অদ্ভুত লোক একটি। আত্রেয়ীর কণ্ঠে বিরক্তি।

—বাঃ, তা' কেন ?

ও হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলে।

—আপনার কথায় কোনো সামঞ্জস্য নেই। আত্রেয়ী স্পষ্ট অভিযোগ করলে। পরিহাস নেই ওর কণ্ঠে।

অনমিত্র কোনো উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগলো।

আত্রেয়ী রাগান্বিতা হ'লো।

কয়েক মিনিট পরে অনমিত্র বললে : একটা কথা—

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না ; তাকালো ওর মুখের দিকে। অনমিত্র তাকিয়ে আছে তখন রাস্তার দিকে। এক মিনিটের মধ্যে ও কোনো কথাই বললে না।

—কই ? বললেন না কী কথা ? খোঁজ করলে আত্রেয়ী।

—য়্যাঁ ? অনমিত্র এবার তাকালে সোজা আত্রেয়ীর মুখের ওপর।

আত্রেয়ী স্পষ্ট দেখতে পেলে, ওর চোখের দৃষ্টিতে কোথাও কোনো প্রশ্ন নেই।

ওদের গন্তব্য স্থানে ট্রাম এসে গেছে। আত্রেয়ী ও তপতী উঠে দাঁড়ালো।

—আমরা নামছি। আত্রেয়ী বললে।

—আচ্ছা।

ওরা নেমে পড়লো। গাড়ী পুনরায় চলছে। অনমিত্র সামনের উইণ্ডোটুকু দিয়ে স্বল্পপরিসর আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কয়েক মিনিট পরে যখন ডিপোর গেইটে ট্রামটা প্রবেশ করলো, হঠাৎ অনমিত্রের মনে প'ড়ে গেলো, ওর একখানা চিঠি বইটার মধ্যে র'য়ে গেছে। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় ছিলো না।

আট

মানুষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা বেড়ে চললো। পুরোনো পৃষ্ঠাগুলো এলো বিবর্ণ, মলিন হ'য়ে। গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে আসছে; আয়ু ওদের প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এলো।

নিজের টাকা দিয়ে আত্রেয়ী আস্তে আস্তে কয়েকখানা বই কিনে ফেলেছে। দোকান থেকে কোনো জিনিষপত্র কেনবার প্রয়োজন হ'লে আর কারও সাহায্যের দরকার হয় না। ও একা গিয়েই স্বচ্ছন্দে কিনে নিয়ে আসে। মনের সংকোচ ওর আল্‌গা হ'য়ে গেছে। যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, তখন ওর অন্তর আনন্দে দুলে ওঠে; মনে হয় ও মুক্ত। সমস্ত সংস্কার এবং শাসনের শৃংখল থেকে ও মুক্ত। রাস্তার অনেক লোকের মুখের দিকে ও অসংকোচে বারবার তাকিয়ে দেখে; ওর বিস্ময় লাগে। হয়তো কোনোদিন একটা গোপন ব্যথা ওকে পীড়াও দেয়। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কোনো বন্ধু, কোনো আত্মীয় ওর নেই। কিন্তু তবু ওর ভালো লাগে; অন্তর হ'য়ে ওঠে উল্লসিত। একাকীত্বের গুরুভার আর হঠাৎ ওকে বিচলিত করে না। ওর মনে হয়, ও একা নয়।

—চল, হ্যারিস্যন্ রোড পর্যন্ত হেঁটে যাই। যাবি? কোনোদিন কলেজ-ফেরতা আত্রেয়ী বলে: হাঁটতে পারবি তো?

—খুব। তপতী জবাব দেয়।

ওরা দু'জন বেথুন থেকে মন্থর গতিতে অনেকখানি হেঁটে আসে। আত্রেয়ীর ইচ্ছে করে সমস্ত পথটাই ও হেঁটে যায়। কিন্তু সে-কথা আর তপতীকে বলে না। কোনোদিন যদি ওকে একা ফিরতে হয়, ও হেঁটেই আসে।

অমরেশ এবং ওদের ব্যবহার আবার সহজ হ'য়ে এসেছে। কোনো কোনো দিন অমরেশ গেইটের কাছে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে। এক সংগে নানা গল্প করতে করতে ওরা বাড়ী ফেরে।

কিন্তু বসন্তবাবুর সংসারে ওরা ভয়ানক একা; এমন কি অনাবশ্যক। সংসারের কোনো কাজে আর ওদের ডাক পড়ে না। স্বেচ্ছায় এগিয়ে যেতেও ওরা সংকোচ বোধ করে। বিকেলগুলো অসম্ভব অসহ্য হ'য়ে ওঠে। এক এক বার অদম্য ইচ্ছে হয় দু' বোনেরই রাস্তায় খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু সে ইচ্ছার কণ্ঠরোধ করা ছাড়া ওদের উপায়ান্তর নেই। আত্রেয়ী কলেজ থেকে ইংরাজী, বাঙলা নানারকম বই নিয়ে আসে আর ছাদের ওপর মাদুর বিছিয়ে যতোক্ষণ আলো পায় পড়ে। অনমিত্রের কাছ থেকে যে বইখানা ও এনেছিলো সেটা প্রায় মাস দুই হ'লো শেষ হ'য়ে গিয়ে প'ড়ে আছে। চমৎকার লেখা; অদ্ভুত! এতো ভালো বই যে হ'তে পারে তা' ওর জানা ছিলো না। দেখা হ'লেই অনমিত্রকে ও ধন্যবাদ জানাবে। বইটার মধ্যে একখানা চিঠিতে তা'র ঠিকানা ও দেখেছে। দ্বিতীয়বার পাতা না উল্‌টিয়েই ঠিকানাটা ও আজো ব'লে দিতে পারে। আত্রেয়ী ভাবছিলো, অনমিত্রকে একখানা চিঠি লিখবে বইখানা নিয়ে যেতে। লিখেওছিলো একখানা; কিন্তু শেষ অবধি আর ডাকে দিতে পারে নি। একদিন গেলে হয় অনমিত্র-বাবুর বাড়াতে, আত্রেয়ী ভাবছিলো একা একা; তপতীকে অবশ্য না জানিয়ে। ওঃ, কি রকম অবাক হ'য়ে যাবে অনমিত্র-বাবু? গেলে হয়; ক্ষতি কি একদিন গেলে? সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে' বসে' আত্রেয়ী ভাবছিলো, অনমিত্রবাবুর ওখানে গেলে হয়। তপতী কলেজ থেকে কতোদিন আগে

চলে' আসে ক্লাস হ'য়ে যায় ব'লে। তখন তো স্বচ্ছন্দে আত্রেয়ী যেতে পারে। বলবে, বই দিতে এসেছে। গেলে হয় কিন্তু সেই সাদা সিল্কের শাড়ীখানা পরে'।

কিন্তু অনমিত্রের ওখানে আর আত্রেয়ীর যাওয়া হ'য়ে উঠলো না। বইখানা পড়েই রইলো।

জীবন-নদী নিস্তরংগ নয়।

আত্রেয়ী হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে ওর হাতের টাকা নিঃশেষিত হ'য়ে এসেছে। কলেজের মাইনে, ট্রামভাড়া, প্রত্যেক মাসেই অনেকগুলো খরচ। বসন্তবাবু এ বিষয়ে কোনো কৌতূহল দেখান না বলে' তাঁকে কিছু বলতেও ওর লজ্জা হয়।

সুহৃদকে আত্রেয়ী লিখলে টাকার জন্যে।

টাকা সে পাঠালে; কিন্তু সামান্য। তা'তে এক মাসের খরচ কোনো ক্রমেই চলতে পারে না। অবশ্য সুহৃদ অনেক কৈফিয়ৎ দেখিয়েছে তা'র অল্প টাকা পাঠানোর পক্ষে; দেখিয়েছে অকাট্য যুক্তি।

আত্রেয়ী বসন্তবাবুর শরণাপন্ন হ'লো।

—কি মা? খবর কি?

তিনি কোর্ট থেকে এসে ঈজিচেয়্যরটায় প'ড়ে থেকে যথারীতি ক্লান্তি দূর করছিলেন। পুনরায় বললেন: তোমাদের পড়াশোনা হ'চ্ছে তো নিয়ম মতো?

আত্রেয়ী জানালে পড়াশোনা হ'চ্ছে ঠিক মতোই। কিন্তু কি ক'রে যে টাকার কথাটা উত্থাপন করা যায় তাই ও ভাবছিলো।

—আমায় কি কিছু বলবে? বসন্তবাবুই প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, দেখুন, ঢোক গিলে নিয়ে আত্রেয়ী সুরু করলে:

কিছু টাকার দরকার ; দাদা তো বেশী পাঠাতে পারেন নি। পরে আবার আপনাকে…

—একেবারে ছেলেমানুষ মা তুমি। আচ্ছা বোসো।

তিনি বারান্দা থেকে নিজের ঘরে গেলেন।

এক মিনিট পরেই হঠাৎ কোথা থেকে সুরবালা ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত।

—দেখো বাছা। তিনি বললেন : এই না সেদিন তোমার ভাই টাকা পাঠালো। আবার এরি মধ্যে এসেছো তুমি টাকা চাইতে ?

আত্রেয়ী একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। সমস্ত শরীরে ওর আর বিন্দুমাত্র উত্তাপ নেই। লজ্জায় কুঁক্‌ড়ে ও এতোটুকু হ'য়ে গেছে।

—দাদা পাঠিয়েছেন সামান্য। তা'তে মাইনে, ট্রামভাড়া সব কুলোবে না। তাই কয়েকটা টাকা…

আর কী বলবে ও ভেবে পেলো না। সুরবালা যে নিকটেই কোথাও অদৃশ্য হ'য়ে আছেন এবং ওদের কথাবার্তা শুনতে পারেন, এ-কথা ওর ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি।

—টাকার আমাদের গাছ পোঁতা নেই ; বুঝ্‌লে ? সুরবালা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন। ওঁর চোখের সামনে কর্‌করে টাকাগুলোর অপব্যয় হবে, এ অসহ্য। সুতরাং বিষোদ্গার করলেন : বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতোই তোমাদের আদরে যত্নে রেখেছি ; উপোসও দেয়াচ্ছি না তোমাদের। কই বলুক দেখি কেউ, তোমাদের জন্যে খরচ করছি না কিছু ? বুঝি বাছা, সবই বুঝি।

সুরবালা হাঁপিয়ে উঠেছেন। থামলেন তিনি। সেই ফাঁকে আত্রেয়ী আস্তে আস্তে চ'লে এলো নিজের ঘরে।

তপতী পড়ছিলো লণ্ঠন জ্বালিয়ে।

আত্রেয়ী অন্ধকারে ছাতের একপাশে মাদুরের ওপর এলিয়ে রাখলে ওর ক্লান্ত দেহ। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। আকাশে দেখা যাচ্ছে অনেক তারা। বড়ো রাস্তা থেকে ট্রাম আর মোটরের শব্দ শোনা যায় ; শোনা যায় মানুষের ক্ষীয়মান কোলাহল। দূরে কোথায় কোন্ বাড়ীতে শাঁখ বাজে। সন্ধ্যার সময় রোজই আত্রেয়ী এই শাঁখের শব্দ শোনে ; ওম্‌নি ওর যুগ্ম-হাত আনত কপালে এসে ঠেকে। কখনো ও ভেবে দেখে নি কোন্ দেবতার উদ্দেশে।

আজ আর কোনো কিছু ওর ভাবতে ভালো লাগছে না। চিন্তার সমস্ত সূত্রগুলো এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। কোনো মীমাংসার সিদ্ধান্তে ও আজ পৌছাতে পারছে না। ওরা যে মন্দভাগ্য, এ চেতনা এমন বিশেষ ক'রে আর কোনোদিন ওর মনকে পীড়া দেয় নি। এমন দুঃসহ হতাশা আর কোনোদিন ভারাক্রান্ত করে নি ওর অন্তর। অপমানের তিক্ত বিষ ওর সমস্ত সত্বাকে মলিন ক'রে দিয়েছে। এখনি, এই মুহূর্তে ও এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। এ বাড়ীর হাওয়া ওর শ্বাসরোধ ক'রে দিচ্ছে। অসহ্য ; একেবারে অসহ্য ; কিন্তু তবু··· ও ভাবলে, এখানে একটা আশ্রয় আছে অন্ততঃ দাঁড়াবার ; মাথা গোঁজবার স্থানটুকু আছে। কিন্তু এ আবাসের বাইরে শুধু পথ ; উন্মুক্ত, উদার পথ। এতোটুকু জায়গা নেই, কোথাও এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করবার।

নিজের মনকে ও কঠিন ক'রে আনলে। স্থির হ'য়ে একবার ভাববার চেষ্টা করলো নিজের অবস্থা। অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রেখে ওকে চলতে হবে। হ'তে হবে ওকে বুদ্ধিজীবী। তীক্ষ্ণ, শানিত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত বিপর্যয়কে সহজ ক'রে আনবে। একদিন ও এদের, এই আত্মীয়দের একটা কঠিন আঘাত দেবে। আসবে সে শুভদিন ওর জীবনে ; একদিন

আসবে। শুধু প্রতীক্ষা; দীর্ঘ প্রতীক্ষা; ক্লান্তিকর ধৈর্যের সমুদ্র ওকে অতিক্রম করতে হবে। সুন্দরতর, মহত্তর জীবনের স্বাদ ও পেয়েছে। সেই জীবনক্ষেত্রের উন্মুক্ত রাজপথে সসম্মানে গিয়ে ও দাঁড়াবে, উন্নত মস্তকে, গর্বিতা, দৃপ্তা এক মহীয়সী রাণীর মতো।

—দিদি! তপতী ওর চিন্তাসূত্রে বাধা দিলো।

আত্রেয়ী উঠে ব'সে বললে: কি রে?

—অমরেশদা' এসেছিলেন; তোমার খোঁজ করছিলেন।

—কেন?

—কী একখানা বই দরকার।

—কি বই? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলো।

—কি জানি। বললেন, আবার আসবেন।

—ও।

পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ীশুদ্ধ সবাই গেছে বায়স্কোপ দেখতে। বাড়ীতে একা আত্রেয়ী আর তপতী।

সিনেমায় যাবার আগে অমরেশ হঠাৎ ঘরে এসে বললে: চলুন; একটা ভালো বই আছে দেখে আসবেন।

আত্রেয়ী এমন একান্ত অনুরোধের কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। কিন্তু সে শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে। মন স্থির করতে ওর বেশী সময় লাগলো না। ও জিগ্‌গেস করলে: কে কে যাচ্ছে?

—সবাই; বাড়ী শুদ্ধ সব। উৎসাহিত কণ্ঠে অমরেশ বললে: চলুন; আর বেশী সময় নেই। কাপড় প'রে নিন।

ওকে হতাশ করতে আত্রেয়ীর সংকোচ হ'লো।

—বাঃ, আপনি বললে কেন যাবো? কাকীমারা কেউ বললেন না।

—আমার বলা বুঝি কিছুই নয়? ম্লান কণ্ঠে অমরেশ বললে: কিন্তু তাঁরা তো সবাই যাচ্ছেন। আপনারা দু'জন গেলেই বা ক্ষতি কি?

—ক্ষতি আছে। দৃঢ় স্বরে আত্রেয়ী বললে।

অমরেশ অবাক হ'য়ে গেলো।

এক মিনিট পরে আত্রেয়ী আবার বললে: তা' ছাড়া আমাদের পয়সা নেই।

—পয়সার কথা কে বলছে আপনাদের? অমরেশের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

—হুঁ; তাহ'লে কে দেবে?

—কেন? আমি?

—আপনি একেবারে……নাঃ, আপনারাই যান আজ। বরং আরেকদিন শুধু আপনারি সংগে আমরা যাবো।

আত্রেয়ী ওর প্রতি একটু মমতা অনুভব করলে।

অমরেশ নিঃশব্দে নীচে নেমে গেলো।

লণ্ঠনের পাশে ব'সে দু'বোন পড়াশোনা আরম্ভ ক'রে দিলে। কোথা দিয়ে সাড়ে সাতটা বেজে গেলো। হঠাৎ নীচে দরজার কড়াটা প্রচণ্ড শব্দে ন'ড়ে উঠলো। আত্রেয়ীও শব্দটা শুনতে পেলে; কিন্তু মনোযোগ দিলে না। নীচে ঠাকুর চাকর তো রয়েইছে, তারাই সাড়া দেবে বা খোঁজ নেবে। নিশ্চিন্ত মনে আত্রেয়ী প'ড়ে চলেছে। হঠাৎ আবার কড়াটা ন'ড়ে উঠলো জোরে। বেশ বোঝা যায় কোনো চঞ্চল হাত। আত্রেয়ীর বুক কেঁপে উঠলো; অনমিত্রবাবু নন্ তো?

—দেখি কে এলো? বলতে বলতে ও বইটা বন্ধ ক'রে রেখে নীচে নেমে এলো চক্ষের নিমেষে।

ঠাকুর চাকর কেউই নেই নীচে। বৈঠকখানার বাতি জ্বালিয়ে ও দরজা খুলে দিলে। অনমিত্র নয়; আর একজন

অপরিচিত যুবক, যা'কে ও এর পূর্বে কোনোদিন দেখে নি। দেহের উচ্চতা মাঝারি; পাতলা চেহারা; অসাধারণ ফর্সা; বয়েস পঁচিশের নীচে। পরণে কোঁচানো ধুতি আর ফিনফিনে পাঞ্জাবী। পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব চক্‌চক করছে। পোষাক থেকে আসছে উগ্র এসেন্সের গন্ধ। পরিষ্কার দাড়ি কামানো; সরু একটি পাতলা গোঁফের রেখা; যে গোঁফের পেছনে ব্যয়িত হ'য়েছে অসংখ্য কস্‌রৎ আর প্রচুর ধৈর্য।

—অমরেশ বাড়ী নেই? ও মৃদু এবং মিষ্ট কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে। সুবিভক্তগাত্রাঃ আত্রেয়ার সর্বাংগে ভ্রমণ করছিলো অপরিচিত যুবকের দৃষ্টি। আত্রেয়ী সংকুচিত হ'লো।

—না; তাঁরা সবাই তো বায়স্কোপে গেছেন। জবাব দিলে আত্রেয়ী।

—বায়স্কোপ? আগন্তুক বিস্ময় প্রকাশ করলে: আমার তো আজ আসবার কথা ছিলো। একটু থেমে আবার বললে: আচ্ছা, আপনিই তো অমরেশের সেই বোন না? নতুন এসেছেন দেশ থেকে?

আত্রেয়ী লজ্জায় মুখ নীচু করলে। ঘাড় নেড়ে জানালে, ও-ই অমরেশের সেই বোন।

ওর খুব কাছাকাছি এসে একটা চেয়্যারে ব'সে প'ড়ে অপরিচিত নিজের পরিচয় দিলে: আমার নাম শ্যামলেন্দু কিংবা শ্যামল। অমরেশ ও আমি বন্ধুর চেয়ে অনেক ওপরে। যাক্—বলবেন, শ্যামল এসেছিলো। নামটা মনে থাকবে তো? ও একটু হেসে বললে: মেয়েদের আবার কিছুই মনে থাকে না।

আত্রেয়ী কোনো উত্তর দিলে না।

কয়েক মিনিটের ছেদ।

আত্রেয়ী মুখ তুললেই দেখতে পেতো, শ্যামলের মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টি ওর প্রতিটি অবয়বকে গ্রাস ক'রে ফেলছে।

—আচ্ছা, যাই এবার। নামটা এরি মধ্যে ভুলে যান্ নি তো? ·

আত্রেয়ী শুনতে পেলো অপরের হাসি।

শ্যামল যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়ালো। ও বললে: দেখুন, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? অনেকক্ষণ থেকে তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, কাছে কোথাও একটা সোডা-লিমনেডের দোকান পর্যন্ত নেই। আপনাকে আবার আসতে হবে না; চাকরটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন, তা'হ'লেই হবে।

আত্রেয়ী ভেতরে এলো। চাকরটা কী কিনতে গেছে; ঠাকুরেরও দেখা পেলে না। ও রান্নাঘরে ঢুকলো। উনুনে ভাত ফুটছে; পাত্র বেয়ে ফ্যান্ গড়িয়ে পড়ছে আগুনে; পোড়া গন্ধে সারা ঘরটা রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে।

আত্রেয়ী ভাবলে, অমরেশের বন্ধু। এমনি এক গ্লাস জল দিলে কিছু ভাববে না তো? কিন্তু কী আর আছে বাড়ীতে ওর জানা নেই। তা'কে বসতে ব'লে কিছু খাবার আনিয়ে দেয়া উচিৎ কি না, সেটাও ও বুঝতে পারলে না। অমরেশ্ নিশ্চয়ই কাল জানবে তা'র বন্ধুকে শুধু এক গ্লাস জল দিয়ে বিদায় করা হ'য়েছে। হয়তো সে আত্রেয়ীকে অভদ্রও ভাবতে পারে।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে ও গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখলে। তারপর শুধু হাতেই বাইরে বেরিয়ে এলো। শ্যামল তেমনি দাঁড়িয়েছিলো তা'র তৃষ্ণা নিয়ে।

—একটু বসবেন? আত্রেয়ী বললে: এক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে দেবো!

এতোখানি শ্যামল আশা করে নি। নিমেষে সমস্ত মুখ ওর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। খুশীতে ঝল্‌সে উঠে ও বললে: না, না;

রাত্রি হ'য়ে গেছে ; আপনাকে আর কষ্ট দেবো না। শুধু শুধু অসুবিধে···

—না ; অসুবিধে আর কি ? আপনি পাঁচ মিনিট বসুন। আত্রেয়ী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলো।

অবসর।

—না, না ; এ আপনার ভা-রী অন্যায়। শ্যামল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে : বাস্তবিক আপনাকে কতো কষ্ট দিলাম আজ।

আত্রেয়ী টেব্‌লের ওপর নামিয়ে রাখলে চায়ের পাত্র। কোনো কথা বললে না ও।

—আপনার এ অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলবো না, বুঝলেন ? শ্যামল বললে : অমরেশের মুখে আপনার অজস্র প্রশংসা শুনে মনে মনে আপনার একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যে তা'র চাইতে কতো ওয়াণ্ডারফুল, কতো মিষ্টি, সে কথা আপনাকে না দেখলে কল্পনায়ও আনা যায় না।

আত্রেয়ী বুঝতে পারলে না, ওর কথাগুলো ঠিক অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে কি না। অবশ্য ক'জন লোকের সংগেই বা ও এখানে মিশেছে ?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শ্যামল ব'লে উঠলো : আপনি রিয়েলি গুণী লোক ; এমন চমৎকার চা করতে পারেন !

আত্রেয়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো।

—আপনার সংগে আলাপ ক'রে ভারী আনন্দিত হ'লাম। শ্যামল বললে : আজকের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে।

পেয়ালা নিঃশেষ করতে যতোক্ষণ সময় লাগা দরকার, তা'র দ্বিগুণ সময় শ্যামলের লাগলো। আত্রেয়ী ভাবছিলো,

ভাগ্যে আজ এখনি কারও এসে পড়বার সম্ভাবনা নেই; না হ'লে নিজের পরিণতির কথা ভেবে আত্রেয়ী শিউরে উঠলো।

—আচ্ছা, চললাম। মনে থাকবে আপনার কথা; ভুলবো না কখনো।

চ'লে যেতে যেতে শ্যামল একবার তাকালো পশ্চাতে। ঘর তখন অন্ধকার। বাতি নিভিয়ে আত্রেয়ী উঠে গেছে ওপরে।

পরদিন সকালে আত্রেয়ী অমরেশকে বললে: আপনার এক বন্ধু এসেছিলেন কাল রাত্রে; নাম শ্যামল। তাঁর নাকি আসবার কথা ছিলো। অপনি কি ভুলে গিয়েছিলেন, না কি?

—কই? তা'র আসবার তো কোনো কথা ছিলো না। কালও তো কলেজে দেখা হ'য়েছিলো তা'র সংগে। কিছু বললে নাকি, কেন এসেছিলো?

—না:, আমি জিগ্‌গেস করি নি।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি।

—আপনি কি আমার কথা কিছু বলেছিলেন আপনার বন্ধুকে? আত্রেয়ী অবশেষে প্রশ্নটা ক'রেই ফেললে।

—হ্যাঁ, কথায় কথায় বলেছিলাম। কিন্তু কেন?

—এমনি। আত্রেয়ী নিজের ঘরে এলো।

দিন দুই পরে ট্রামে শ্যামলের সংগে দেখা। তপতী আগেই বাড়ী ফিরে গিয়েছিলো।

—কেমন আছেন? শ্যামল জিগ্‌গেস করতে করতেই ওর গা ঘেঁষে ব'সে পড়লো। লেডিস্ সীটে ওর পাশের জায়গাটা খালি ছিলো। আত্রেয়ী কল্পনাও করতে পারেনি, এমনি ক'রে বিনা আহ্বানে কেউ ওর পাশে এসে বসতে পারে।

—আপনার অসুবিধে হ'চ্ছে নাকি? নিস্তব্ধ আত্রেয়ীকে পুনরায় জিগ্‌গেস করলে শ্যামল।

তথাপি আত্রেয়ী নির্বাক।

—সেদিন হ'তে আপনার কথা আর তাড়াতে পারি নি মন থেকে। বাস্তবিক আপনাকে ভোলা যায় না।

—এসব কথা আমাকে বলবার মানে কি? আত্রেয়ী আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে বললে।

—মানে? পরমাণুমাত্রও অপ্রস্তুত না হ'য়েই শ্যামল বললে: মানে আর কি? আপনার সম্বন্ধে আমি যা' ভাবি, আমার যা' ধারণা, সে-কথা আপনাকে বলবোনা তো কা'কে বলবো? আচ্ছা, রাগ করছেন আপনি?

—তা'তে আপনার কিছু যায় আসে ব'লে তো বোধ হ'চ্ছে না।

—ভীষণ আসে যায়। আপনি রাগ করলে ভারী দুঃখিত হবো। আর তা' ছাড়া ভেবে দেখুন না আপনি। আপনাকে ভালো লাগে, এ-কথা আপনাকে জানানোটা দোষের কি? ভালো লাগাটা কি ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে? আমি ইচ্ছে করলেই আপনাকে ভালো না লাগাতে পারি, এই কি আপনি বিশ্বাস করেন?

—দেখুন, আপনি আমায় ট্রাম থেকে নেমে যেতে বাধ্য করবেন দেখছি।

—নেমে কোথায় যাবেন? শ্যামল তেমনিই হাসিমুখে বললে: বাড়ী যাবেন না?

—যাবো; কিন্তু হেঁটে। আপনার পাশে ব'সে নয়।

—চমৎকার আইডিয়া। চলুন, খানিকটা হাঁটাই যাক। ট্রামের চেয়ে পথ অনেক নিরিবিলি, অনেক উপভোগ্য।

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না। শ্যামল ন'ড়ে চ'ড়ে আরো

নিবিড় হ'য়ে বসলে। ওদের মাঝখানে ব্যবধান মাত্র বস্ত্রের। আত্রেয়ীর চুলের উগ্র গন্ধে শ্যামলের নিশ্বাস সুরভিত হ'য়ে উঠেছে।

—সরুন; আমি নামবো। আত্রেয়ী হঠাৎ বললে।

—এখানে? এখানে কোথায়?

—হ্যাঁ, এখানেই নামবো আমি।

—না; বসুন। আমি সরবো না।

এরপর কী করা যায়, সে-কথা আত্রেয়ী ভেবে ঠিক করতে পারলে না। পেছনে ও তাকিয়ে দেখলে আসনটা খালি। বাঁচা গেছে; ওদের কথা কেউ তাহ'লে শোনে নি। তাহ'লে কিন্তু আত্রেয়ী আর মুখ দেখাতে পারতো না। ইচ্ছে করলেই ও ট্রাম থেকে নেমে যেতে পারে শ্যামলকে ঠেলে। তা'র সাধ্য নেই যে ওকে আটকে রাখে। কিন্তু শক্ত হ'য়ে বসলে ও। কেনই বা নেমে যাবে? যে কোনো মুহূর্তেই ও ট্রামের সমস্ত লোককে চীৎকার ক'রে বলতে পারে শ্যামলের দুরভিসন্ধির কথা। কিন্তু তা' ও বলবে না। একটা লোককে তাড়াবার জন্যে ও নিজেকে হাস্যকর অবস্থায় ফেলতে পারে না। বসুক না সে; কী এসে যায় ওর?

—দেখুন, আপনাকে আমার ভালো লাগে। শ্যামল বললে।

—ও।

আত্রেয়ী রাস্তার দিকেই তাকিয়ে রইলো। ট্রাম তখন াকুলার রোডে এসে পড়েছে।

—আপনাকে আমার খু-ব ভালো লাগে।

—বেশ তো।

অবসর।

—অমরেশের মুখে প্রথম যেদিন আপনার কথা শুনলাম, সেইদিনই মনে হ'লো আপনি অপরূপ।

—আজ বুঝি, টেনে টেনে বললে আত্রেয়ী : তা'রি যাচাই করছেন ?

শ্যামলের মুখ দেখে মনে হয়, কোনো কথাই ওকে স্পর্শ করছে না। তেমনি উৎসাহ নিয়েই ও বললে : আপনি বাস্তবিক অপরূপ।

আত্রেয়ী এবার না হেসে পারলে না। ও বললে : মাঝে মাঝে আবার থামছেন কেন ? সব ব'লে যান না যা' বলবার আছে। আমার তো নামবার সময় হ'য়ে এলো।

—মানুষ কি সব কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে ? শ্যামল বললে।

—কিন্তু আপনার তো কোথাও আটকাচ্ছে ব'লে মনে হ'চ্ছে না। বেশ চমৎকার ব'লে যাচ্ছেন তো।

—না, না ; শতাংশের এক অংশও বলতে পারছি না আপনাকে। এ অবস্থায় কেউ কখনো বলতে পারে না। আমার বুকের মধ্যে যে কী তরংগ…

অসমাপ্ত কথায় রেখা টেনে দিয়ে আত্রেয়ী বিদ্রূপ মিশিয়ে বললে : আ-হা ; কী করুণ…

—আপনি ঠাট্টা করছেন ? শ্যামলের উৎসাহ-উৎস হোঁচট্ খেলো।

—ছিঃ ; কে বললে ?

আত্রেয়ী সব সময়েই তাকিয়েছিলো রাস্তার দিকে।

পুনঃপ্রদীপ্ত শ্যামল ব'লে ফেললে : তাহ'লে…তাহ'লে আপনারো আমাকে ভালো লাগে ?

—ভীষণ। আপনার মতো এতো চমৎকার লোক আমি আর দেখিনি কখনো।

—সত্যি বলছেন ?

—ভয়ানক সত্যি। আত্রেয়ীর মুখে কোনো রেখাই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো না।

শ্যামলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। যে মেয়েরা কথার উত্তর দেয় না, চুপ ক'রে থাকে, তা'দের বোঝা যায়। যা'রা রাগ করে, তা'রাও সহজ। যা'রা আধুনিকতার অভিনয়ে চেঁচামেচি ক'রে দৃশ্যের অবতারণা করে, তা'দের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু যে-সব মেয়ে রাগও করে না, চুপ ক'রেও থাকে না, এমন কি মুখের দিকে পর্যন্ত তাকায় না, সে-সব মেয়েদের সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কথা। তবু কিন্তু শ্যামল ভগ্নোৎসাহ না হ'য়ে পুরোনো হাসিকে টেনে রেখে বললে: তাহ'লে আমাকে আপনি ভালোবাসেন?

—নিদারুণ ভাবে। আত্রেয়ী তেমনি রাস্তার দিকে তাকিয়েই বললে: সেই বৈঠকখানায় যেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম, সেদিনই মনে হ'লো আপনি অপরূপ। এক মিনিট থেমে পুনরাবৃত্তি করলে ও: আপনি বাস্তবিক অপরূপ।

—ঠাট্টা করছেন না কি? শ্যামলের কণ্ঠে প্রকাশ পেলো উষ্মা।

—পাগল হ'য়েছেন? ঠাট্টা? আমার জীবনে আপনি এক রাজপুত্র। সোনার কাঠির স্পর্শে আমার উনিশ বছরের ঘুম ভাঙালেন। পক্ষীরাজ ঘোড়াটাকে রেখে এলেন কোথায়? দেখবেন, আবার অজগরে না গিলে ফেলে?

আত্রেয়ী তাকালে এবার শ্যামলের মুখের দিকে। হাসির উচ্ছ্বাসে ওর নিজের সমস্ত মুখখানা ঝল্‌মল্‌ করছে।

—ও···এসে পড়েছি দেখছি। আচ্ছা; সরুন তো একটু; নামবো। উঠে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ী বললে: আসবেন না কি সংগে?

শ্যামল দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীকে যাবার সুবিধে ক'রে দিলে। পুনরায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী দেখলে, শ্যামলের মুখে আর হাসির রেখা মাত্র নেই।

কিন্তু টাকা।

সংসারে বেঁচে থাকতে হ'লে টাকার প্রয়োজন। বিত্তহীন জীবন-ধারণ অসম্ভব। সন্ধ্যার পর আত্রেয়ী ছাতে পায়চারী করতে করতে ভাবছিলো। ভাবছিলো, কোথায় পাওয়া যায় টাকা? পাওয়া যায় কেমন ক'রে? দাদা ওদের দুরবস্থার কথা বুঝবে না কখনো; বুঝতে চাইবে না। চিঠি লিখলে হয়তো চিঠির উত্তরই দেবে না। কিম্বা পাঠাবে তাদেরি প্রয়োজন আর অনাটনের বিজ্ঞাপন। বিরক্তিতে ওর সমস্ত মন চিন্‌চিনিয়ে উঠলো। পুনরায় সুহৃদের কাছে টাকা চাইতে ওর সমস্ত অন্তঃকরণ সংকুচিত হ'য়ে উঠছে। বসন্তবাবুর ওপর যেটুকু ভরসা ওর ছিলো, সুরবালা সে ভরসা ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার আর সুরবালার অসন্তোষের কারণ ও হ'তে চায় না। তথাপি টাকা চাই।

কিন্তু...

অনাময়ের অস্পষ্ট ছবি অসহায়া আত্রেয়ীর মনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু তাঁকেও তো সব কথা খুলে বলা যায় না। কী ভাববেন কে জানে? কী রকমের যে লোক, তাই বা কে বলবে? স্রেফ্‌ কিছু সাহায্যের জন্যে আবেদন জানালেই পুরুষরা মেয়েদের কাছে আশা করে অনেক; দাবী করে এমন কিছু যা' দেয় নয়। আত্রেয়ী কোনো উপায় দেখলে না। পূজোর ছুটি হবার আর কয়েকদিন মাত্র দেরী আছে। এর মধ্যে কলেজের সব

মাইনে মিটিয়ে দিতে হবে। মিটিয়ে অবশ্যই দিতে হবে; কিন্তু কোথা থেকে? কি উপায়ে? নিজের গলার হারখানা ও বিক্রী করতে পারে; তা'তে কিছু টাকাও আসতে পারে। কিন্তু মাত্র তা'তে কি সমস্যার সমাধান হবে?

তপতী পড়ছিলো ঘরের মধ্যে। রাত্রি ঘনিয়ে এলো। দেবদারু গাছের মাথায় আজ প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে। অনেকদিন পরে আবার আজ সন্ধ্যায় ও চাঁদ দেখলে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো চাঁদের দিকে। মাঝে মাঝে ভেসে যাচ্ছে হাল্কা সাদা মেঘ। আশ্চর্য বোধ করলে আত্রেয়ী; এতোদিন ও চাঁদকে ভুলে ছিলো। আজ আবার নতুন ক'রে চাঁদ ওর মনে বিস্তার করলো রহস্য, স্বপ্ন। চাঁদকে ওর মনে হ'লো একাকী, সংগীহীন। এতো বড়ো আকাশে তা'র বন্ধু নেই কেউ। আর সেই জন্যেই চাঁদকে আত্রেয়ীর আজ এতো ভালো লাগছে। দেবদারু গাছের কম্প্রমান পাতায় চাঁদের আলো চিক্‌চিক্ ক'রে উঠলো। চাঁদের এতো ঐশ্বর্য! পৃথিবীর যে কোনো জিনিষকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারে, অপরূপ ক'রে তুলতে পারে আকাশের ঐ চাঁদ। আর আজ সন্ধ্যায় ঐ একাকী চাঁদ ওর একমাত্র বন্ধু।

আত্রেয়ী ঘরে এলো। অনমিত্রকে হঠাৎ ও একখানা চিঠি লিখে ফেললে। অনেকদিন তা'র বইখানা পড়া হ'য়ে প'ড়ে আছে। সে যেন কোনো উপায়ে বইখানা ওর কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তা'ছাড়া আরো একটা জরুরী ব্যাপার আছে যে জন্যে অনমিত্রের সংগে একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন। মংগলবারদিন তিনটের সময় ওর ছুটি হবে। সেদিন কলেজের বাইরে সে যদি অপেক্ষা করে তো আত্রেয়ীর সংগে তা'র দেখা হ'তে পারে। যদি কোনো কাজের ক্ষতি না হয়, তাহ'লে সে যেন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে।

পরদিন কলেজে যাবার সময়ে আত্রেয়ী চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলে।

অবশেষে মংগলবার এলো। ভোরবেলা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী খানিকটা পুলক অনুভব করলে।

বিকেল তিনটে। কলেজের গেইট্ পেরিয়ে এলো আত্রেয়ী। তপতীর আর এক ঘণ্টা ক্লাস আছে। অন্যদিন হ'লে ও তপতীর জন্যে অপেক্ষা করতো। কিন্তু আজ ও তপতীকে ব'লেই দিয়েছে, শরীর ভালো নেই ; সুতরাং ও বাড়ী চ'লে যাচ্ছে।

কিন্তু গেইটের বাইরে কোথাও অনমিত্র নেই। মাথাটা কেমন ক'রে উঠলো আত্রেয়ীর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ও। দূর থেকে অনেক লোকের চলার ভংগী ও লক্ষ্য করলে। কিন্তু তা'দের মধ্যে কেউ অনমিত্র নয়। অতঃপর ওকে ট্রামে উঠে পড়তে হ'লো। পরের ষ্টপেজে যে লোকটি কাঁধে কোট ঝুলিয়ে ট্রামে চড়লো, তা'কে দেখে আত্রেয়ীর সমস্ত শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো।

অনমিত্র এসে আত্রেয়ীর পাশে বসলে বেশ খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে।

—আমার চিঠি পেয়েছিলেন? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—পেয়েছিলাম।

—কই, আপনি তো আমার জন্যে অপেক্ষা করেন নি।

—কে বলতে পারে? করছিলাম হয়তো। তপতী কলেজে আসে নি?

—ওর ক্লাস এখনো শেষ হয় নি।

কয়েক মিনিটের বিরতি।

আত্রেয়ী ভাবছিলো, অনমিত্র নিশ্চয়ই ওকে জিগ্‌গেস

করবে কিসের জন্যে ও চিঠি লিখেছে। কিন্তু কোনো কথাই অনমিত্র বললে না।

—এই নিন্ আপনার বই।

বইখানা নিয়ে অনমিত্র প্রশ্ন করলে: কেমন লাগলো?

—চমৎকার! এমন বই পড়িনি কখনো। যতোক্ষণ না শেষ করতে পেরেছি ততোক্ষণ কোনো কাজে মন দিতে পারি নি। আপনি বুঝি খুব পড়েন?

—না; খুব নয়। সময় কাটাতে হবে তো? সময় কাটানো একটা মহা সমস্যা। মানুষ যা' কিছু করে, যা' কিছু তা'র আবিষ্কার এবং দান সমস্তই ওই সময় কাটাবার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা; কি বলেন?

আত্রেয়ী একটু বিস্মিত হ'লো। এমন ক'রে অনমিত্রকে ও কথা বলতে দেখেনি কখনো।

—আর তা'ছাড়া মানুষকে কিছু একটা করতে হবে তো? অনমিত্র বললে।

—হ্যাঁ, করতে হবে। আত্রেয়ী বললে: এক তৃতীয়াংশেরো বেশী লোককে কিছু-না-কিছু করতেই হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য কি সবারি এক? বেঁচে থাকবার জন্যে টাকা রোজকার আর অর্থে নির্ভর ক'রেই বেঁচে থাকা। এই নিয়ে মানুষের প্রাণপাত, এতো কষ্ট-স্বীকার, যুদ্ধ এবং মৃত্যু। যা'রা কৃতকার্য হ'লো, তা'রা আশ্রয় পেলো সমাজে; পেলো সম্মান। আর যা'রা পারলো না, তা'রা রইলো হেয় হ'য়ে সমাজের বাইরে; মানুষ তা'দের ঘৃণা করে, করুণা করে; অর্থবান করে অত্যাচার, অপমান; সমাজ করে শোষণ।

আত্রেয়ী কখন যে নিজের অজ্ঞাতেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে তা' ও নিজেও বুঝতে পারে নি। অনমিত্র তাকিয়েছিলো ওর মুখের দিকে। লজ্জিত আত্রেয়ী মাথাটা নীচু ক'রে নিলে।

—হ্যারিসন্ রোড এসে পড়লাম। আপনি তো এবার গাড়ী বদলাবেন।

—হুঁ। আত্রেয়ী বললে।

—বসুন। গাড়ীটা ঘুরে আবার এই হ্যারিসনের জংশনে আসুক; তারপর বদলাবেন।

আত্রেয়ী ব'সে রইলো। গাড়ী এগিয়ে চললো।

—দেখুন, আত্রেয়ী বললে: একটা কথা আছে।

—বলুন। সিগারেটে টান দিয়ে অনমিত্র জবাব দিলে।

—আমার কিছু টাকার দরকার। সংকোচ কাটিয়ে আত্রেয়ী বললে।

—কতো টাকা?

অনমিত্র তেমনিই সিগারেট টানতে লাগলো। একবারও ফিরে তাকালে না সংগিনীর মুখের দিকে।

—পঁচাত্তর।

—বেশ; কাল দেবো। অনমিত্র বললে।

মেডিকেল কলেজের সামনে এসে পড়েছে ট্রাম।

—কাল বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত আমার ছুটি; সে সময়ে আপনাকে পাবো?

—পাবেন।

কয়েক মিনিট অতিবাহিত হ'লো।

—কি ভাবছেন? আত্রেয়া জিগ্গেস করলে।

—কিছুই না।

—হাত পাতুন।

অনমিত্র প্রসারিত করলো নিজের হাত। প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে আত্রেয়ী। ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া সোনার হারগাছা অনমিত্রের হাতে রেখে বললে: এটা আপনি রাখুন। যদি টাকা দিতে না পারি সময় মতো, এটা রইলো।

মোড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় চিক্‌চিক্‌ করছে আত্রেয়ীর হারটা। ওর আভরণহীন গলার দিকে একবার তাকালে অনমিত্র। চিরদিনের মতো আজো টেনে জড়ানো রয়েছে খদ্দরের শাড়ীর ছাপা পাড়টা। কয়েক মিনিট পরে মৃদু কণ্ঠে ও বললে : পোদ্দারি কারবার আমার নেই। ওটা রেখে দিন। টাকা যখন পারেন দেবেন।

ওর কণ্ঠস্বরে আত্রেয়ী বিস্মিত হ'লো। দ্বিতীয় কোনো কথা বলতে ও সাহস করলে না। হারগাছা নিয়ে রাখলে।

—আচ্ছা, ওটা আপনি আমায় দিলেন কি ক'রে? ঈষৎ হেসে বললে অনমিত্র।

—অন্যায় হ'য়েছে? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—কি জানি।

পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বা'র ক'রে মুখে রাখলে অনমিত্র। অনেকক্ষণ ওদের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা হ'লো না।

হঠাৎ অনমিত্র প্রশ্ন করলে : আপনাদের বাবা নেই?

—না।

—মাও নেই ; না?

—না। কেমন ক'রে জানলেন?

—এমনি ; আন্দাজ।

ওয়েলিংটন ছাড়িয়ে ট্রাম এস্‌প্ল্যানেডের দিকে ছুটেছে।

—আচ্ছা, আমায় একটা মাষ্টারী জোগাড় ক'রে দিতে পারবেন? কোনো মেয়ে? ম্যাট্রিক্‌ ক্লাস পর্যন্ত পড়াতে পারবো।

—দেখবো চেষ্টা ক'রে। বাড়ী থেকে কোনো রকম...

—না ; কেউ কিছু মনে করবে না। বরং ওরা তাহ'লে বেঁচে যায়।

কথাটা ব'লেই আত্রেয়ী লজ্জিত হ'লো। অনমিত্র কে যে তা'কে সমস্ত গোপনীয় কথা বলতে হবে? ঐ উন্মুক্ততার কোনো কারণ ও খুঁজে পেলে না।

এস্‌প্ল্যানেডের পরিক্রমা শেষ ক'রে ট্রাম পুনরায় ছুটে চলেছে। হ্যারিস্যন্‌ রোড অবধি একখানা টিকিট নিয়ে আত্রেয়ীর হাতে দিলে অনমিত্র। বললে: আপনার নিয়মিত জায়গাতেই ট্রাম বদলে নেবেন। অসুবিধে হবে না তো?

—না; কিছু না।

—আচ্ছা, আমি তাহ'লে…

অনমিত্র চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। কাঁধ থেকে ঝুলছিলো সিল্কের কোট্‌টা; মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা; পায়ে ফিতে দেয়া জুতো। দীর্ঘ দেহ; তুলে আঁচড়ানো একমাথা চুলের তরংগ। আত্রেয়ী তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

পরদিন বারোটার সময় আত্রেয়ী গেইটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। অনেক দূরে অনমিত্র একটা কিয়স্কের পাশে দাঁড়িয়ে একটা বই পড়ছিলো। রাস্তা পার হ'য়ে এসে আত্রেয়ী এগিয়ে চললো।

—এই যে! অনমিত্র বই বন্ধ ক'রে তাকালে আত্রেয়ীর দিকে।

—এখানটায় বড্ডো রোদ। আত্রেয়ী বললে।

—ঐ ট্রামটা আসছে; আসুন উঠে পড়া যাক।

—কিন্তু এখনো আমার দুটো ক্লাস রয়েছে যে?

—তা'তে কি? ক্লাস আরম্ভ হবার আগেই ফিরে আসবেন।

দু'জনে ট্রামে উঠে পড়লো; বসলে পাশাপাশি। আত্রেয়ীর

বুকটা কাঁপতে লাগলো। নিজের এই চাঞ্চল্যের জন্যে ও শাসালে নিজেকে।

—চমৎকার উপন্যাস এটা; পড়বেন? অনমিত্র ওর হাতে একখানা বই দিয়ে বললে।

বইয়ের পাতা উল্টোতেই আত্রেয়ী দেখলে মুখ খোলা একখানা খামের মধ্যে কতকগুলো নোট।

আত্রেয়ী তাকালে অনমিত্রের মুখের দিকে। সে তখন পাশের লোকটির কাছে দেশলাই চাইছিলো।

এর পর কী বলা যায় আত্রেয়ী ভেবে পেলো না। মামুলী ধন্যবাদের কথাগুলো ওর মনে কুৎসিৎ ঠেকছিলো। অতএব চুপ ক'রে রইলো ও। অনমিত্র নীরবে সিগারেট টেনে চলেছে। আত্রেয়ী জানে না কেমন ক'রে তা'র এ ঋণ ও পরিশোধ করবে? কোনো উপায়, কোনো সম্ভাবনা ও অদূর ভবিষ্যতের কোথাও খুঁজে পেলে না। কিন্তু এখন আর কী-ই বা বলা যায়?

—নামবেন এখানে? আপনার ক্লাস আরম্ভ হবে আবার।

—আপনি?

—কি দরকার? ঐ আপনার ফিরতি ট্রাম আসছে।

স্টপেজে ট্রাম দাঁড়াতেই আত্রেয়ী নেমে পড়লো।

হারিয়ে গেলো ওরা পরস্পরের কাছে।

নয়

কলেজের ছুটি হ'য়ে গেলো। দীর্ঘ অবকাশ। আনন্দের কোনো উপচারই ওদের জন্যে নেই। তবু ওরা অনুভব করলে, কয়েকটা সোনালী দিন আসছে; আনন্দে ঝলমল্ দিন, আশা আর উন্মাদনায় চঞ্চল।

সমস্ত বাড়ীতে একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। হেমন্তবাবু সস্ত্রীক যাচ্ছেন পাটনায়; স্ত্রীর বাপের বাড়ী। বসন্তবাবু যাচ্ছেন জামতাড়া। আত্রেয়ী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। দীর্ঘ এবং ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ও কলকাতার সমস্ত রাস্তা মুখরিত ক'রে তুলবে। সিমেণ্ট আর য়্যাশ্ফ্যল্টের জমাট কেঁপে কেঁপে উঠবে; বেজে উঠবে ওর চলার ছন্দে। এমন কি রাত ক'রেও ও বাড়ী ফিরতে পারে। সিনেমায় যেতে পারে; যেতে পারে নানা জায়গায় বেড়াতে, যেখানে আজ পর্যন্ত ওদের যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। আর পড়বে সমস্ত সকাল, সারাটা দুপুর। না প'ড়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও থাকতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কলেজের তাড়া নেই; খেতে যাবার তাগাদা নেই।

কিন্তু সমস্ত চিন্তার মধ্যে একটা কথা সূক্ষ্ম ধারালো এক অস্ত্রের মতো ওর মনের মধ্যে বিদ্ধ হ'য়ে রইলো। ওদের টাকার দরকার। কে জানে, হয়তো ছুটির এই সমস্ত দিনগুলো নিজের খরচেই ওদের সংসার চালাতে হবে। শোনা যাচ্ছে একজন চাকর মাত্র বাড়ীতে থাকবে। অবশ্য এ বিষয়ে বাড়ীর কেউ আত্রেয়ীর সংগে কোনো কথা বলেনি। আর সবাই ধ'রে নিয়েছে যে ওরা বাড়ীতেই থাকবে। যাবে আর কোথায়?

দেশে যাওয়া মানে অনর্থক কতোগুলো টাকা নষ্ট। তা'ছাড়া সামনে আত্রেয়ীর পরীক্ষা।

দিন কাটতে লাগলো।

হেমন্তবাবু চ'লে গেছেন পাটনা। বসন্তবাবুরও যাবার আর দেরী নেই। তবে সুরবালা পাঁজিতে একটা ভালো দিন দেখতে পাচ্ছেন না ব'লেই আটকে আছেন। না হ'লে বসন্তবাবুর কোর্ট বন্ধ হ'য়েছে অনেকদিন। সুরবালা অষ্টপ্রহর স্বামীকে রাখলেন চোখে চোখে, পাছে টাকাকড়ি কিছু আত্রেয়ীর হাতে গিয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই পুরুষ-জাতটাকে। বয়েস হ'য়েছে, তা'তে হ'য়েছে কি ?

যা' হোক, টাকা কিছু পড়লো না আত্রেয়ীর হাতে। তবে চাল ডাল মসলাগুলো সংগে নিয়ে যেতে পারলেন না ব'লে সুরবালার আফ্‌শোসের অন্ত নেই। ফিরে এসে যে কণামাত্রও পাওয়া যাবে না, এ-কথা তাঁ'কে অতীব দুঃখের সহিত বুঝতে হ'লো।

যাবার আগের দিন অমরেশ এলো ওপরে। আত্রেয়ীর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বললে : চলুন না আমাদের সংগে।

আত্রেয়ী বিস্মিত হ'লো। বললে : কলেজের পড়া আছে যে! যাই কেমন ক'রে ?

—বই নিয়ে চলুন না!

—নতুন জায়গায় গিয়ে পড়ায় মন বসে না মোটেও। অথচ পাশ তো করতে হবে।

—বাঃ, আর আমাকে বুঝি পাশ করতে হবে না ? অমরেশ বললে।

—তা', তো হবেই। না, সে-কথা বলছি না। আর অনেকগুলো টাকাও তো খরচ হবে।

—সে তো বাবা দেবেন।

—কিন্তু কেন? অনর্থক খরচ তো?

অমরেশ উত্তর দিলে না। সমস্ত মুখে ওর অদ্ভুত কোমল একটা ভাব।

খালি হ'লো বাড়ী। আকাশ হ'য়ে উঠলো ঘোরতর নীল। অসংকোচ পদক্ষেপে ওরা সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আত্রেয়ী কাণ পেতে শুনতে পায় বিশাল নগরীর কোলাহল। ভাবতেই ওদের আশ্চর্য লাগে, এই এতো বড়ো বাড়ীতে ওরা একা। একটা চাকর ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী আর কেউ নেই। গলা ছেড়ে আত্রেয়ী খানিকটা গান গেয়ে নিলে। প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় গা ভাসিয়ে প'ড়ে রইলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জলের মধ্যে আশ্চর্য লাগছিলো ওর দেহের ভংগী। একদার খেলাধূলার স্বাক্ষর আজ ওর প্রতিটি দেহের রেখায় জীবন্ত পরিণতি লাভ করেছে। নিজেকে অনাবৃত দেখবার অবসর জীবনে ও আজ প্রথম পেলো। আত্রেয়ীকে ওর মনে হ'লো অপরিচিত, অভিনব, নূতন। এতো সুষমা, এতো কমনীয়তা ওরি সর্বাংগে মেশানো রয়েছে, এ-কথা ও জানেনি কোনোদিন? আশ্চর্য কিন্তু।

চাকরটা লোক ভালো; নাম বংকু। মেজাজ নরম; ভদ্র এবং বাধ্য। তা'কে নিয়ে কোনো বেগ পেতে হ'লো না।

কয়েকটা দিন কেটে গেলো হাল্কা ছন্দে, লঘু গতিতে।

কলেজের মাইনে দিয়েও ওর হাতে কিছু টাকা ছিলো। ভেবেছিলো একটা টিউশ্যনী ও জোগাড় ক'রে নেবে। তা'র জন্যে ও চেষ্টাও করছিলো। কিন্তু সামনে পরীক্ষা। অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দেবার ওর বিন্দুমাত্র অবসর নেই।

অষ্টমী পূজোর দিন বংকুকে বাড়ীতে বহাল ক'রে ওরা দু'বোন কাপড় প'রে নিলে। আজ ওরা বেরোবে পথে; আনন্দমুখরিত পথ। শহরের স্পন্দন অনুভব করবে বুকের মধ্যে; মিশে যাবে জনস্রোতের সংগে। যে আকাশ নগরী-

বাসীর প্রাণময়তায় কম্প্রমান, সে আকাশে তরংগায়িত হবে ওদেরো আনন্দের সুর। ওদের চলার ছন্দে ধ্বনিত হবে যে সুর, সে সুরের মূর্ছনা ঝংকৃত হবে পথচারীদের বক্ষে।

ওরা নেমে আসছিলো নীচে।

বংকু খবর দিলে : বাইরে কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

—কার কাছে ? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—আপনার নাম বললেন।

—আমার নাম ? চমকে উঠলে আত্রেয়ী। ওর বুকে উঠলো রক্তের একটা ঝড়। বোধ হয় অনমিত্র। অনমিত্রকে ও মনে মনে আশা করছিলো ; ভাবছিলো, একদিন ও আসবেই। এমন দিনে ওর সংগে দেখা হওয়াই তো উচিৎ।

সন্ধ্যা তখন অতিক্রান্ত। আত্রেয়ী বাইরে এসে দেখলে, অনমিত্র নয়, শ্যামল। ওর মুখের হাসি গেলো মিলিয়ে ; সমস্ত রেখা হ'য়ে উঠলো কঠিন ; শরীরের ভংগীতে এলো দৃঢ়তা।

তপতী ওকে দেখে পেছিয়ে এলো।

—এই যে, কেমন আছেন ? শ্যামল জিগ্‌গেস করলে।

—ভালো।

—চললেন কোথায় ?

—বেড়াতে।

—বাড়ীতে তো নেই কেউ। শ্যামল বললে : অমরেশরা চ'লে গেছে, না ?

—হুঁ।

শ্যামল অনুভব করলে সর্বাংগে একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কা। মিনিট খানেক পরে বললে : চলুন না, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

—গাড়ী চড়তে অভ্যস্ত নই। আত্রেয়ীর কণ্ঠে আঘাত দেয়ার ভংগী।

—তা'তে কী ? সবকিছুতেই সবাই প্রথম থেকে অভ্যস্ত থাকে না। চলুন যাই।

—না; ধন্যবাদ।

—কেন যাবেন না ? শ্যামলের কণ্ঠে প্রকাশ পেলো ক্ষোভ এবং বিরক্তি।

—কিন্তু সে কৈফিয়ৎ আপনি চাইবেন কেন ? আত্রেয়ী শ্বেত কণ্ঠে বললে : যাবো না। ব্যস্, এই তো যথেষ্ট।

—আপত্তি কিসের ? শ্যামল শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো।

—প্রথমতঃ, যে সব মেয়েদের সম্মান-জ্ঞান আছে, তা'রা যা'র-তা'র সংগে বেড়াতে যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েদের মন পেতে সময় লাগে। আপনার সে ধৈর্য নেই।

—মন পাওয়া না-পাওয়ার কোনো প্রশ্ন এখন আসছে না। শ্যামল বললে।

—আসছে। আত্রেয়ী জবাব দিলে : নিজেকে ঠকিয়ে লাভ নেই।

আত্রেয়ীর শান্ত অনুগ্র কথাগুলোয় ধার আছে। শানিত অস্ত্রের মতো তা'রা শ্যামলকে বিক্ষত করছে। বেদনার্ত শ্যামল বললে : আমাকে বিশ্বাস ক'রে দেখলে পারতে; তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণই থাকতো।

—হয়তো তাই। তবু ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হতো আমায়। সে ক্ষতি পূরণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। আমার পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ; আমি তা'কে আরো দুর্গম ক'রে তুলতে চাই নে। সুতরাং নিঃশংক চিত্তে আপনার গাড়ীতে আপনার পাশে ব'সে সান্ধ্যভ্রমণ আমাদের পক্ষে সম্ভব কিংবা সংগত নয়।

অপমানিত শ্যামল ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললে : কিন্তু, মনে রাখবেন, সে ক্ষতি আপনার আমি এমনিতেও করতে পারি।

—ক্ষমতাবান আপনি। জানি সে শক্তি আপনার আছে।

আত্রেয়ীর কণ্ঠে বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো স্ফুলিংগের আভা: এবং এতোখানি নীচতা যে কোনো পুরুষ প্রয়োগ করতে পারে, সেটুকু অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি।

শ্যামল উত্তর দেয়ার মতো কিছু খুঁজে পেলো না। ক'য়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে ও রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। পথের প্রান্তে মিলিয়ে গেলো ওর 'কার' এর শব্দ।

তপতী এতোক্ষণে ঘরে এসে জিগ্‌গেস করলে: লোকটা কে?

—অমরেশের বন্ধু। অন্যমনস্ক আত্রেয়ী উত্তর দিলে: মরুক গে! চল বেরিয়ে পড়ি।

রাস্তার জনস্রোতের সংগে ওরা মিশে গেলো। ওদের কণ্ঠ মিশলো পথের কলরবের সংগে।

সেদিন যখন ওরা বাড়ী ফিরলে, রাত তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। বংকু ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

পূজো কেটে গেলো। আত্রেয়ীর পরীক্ষার আর দেরী নেই। বইয়ের সাগরে ও গেলো ডুবে।

তপতীর পড়ার তেমন তাড়া নেই। সময়টাকে ও যে ভাবে খুসী অতিবাহিত করতে লাগলো। কখনো ও পথে বেরিয়ে পড়ে একাই। ট্রামে ট্রামে ঘুরে শেষ সময়ে ফিরে আসে বাড়ী।

ভ্রমণ-বিলাসীদের ফিরে আসবার সময় হ'লো। কর্ম-স্রোতের আহ্বান তা'রা অনুভব করছে। অবকাশের পর্যাপ্ততা এলো শেষ হ'য়ে; উড্ডীন মনের পাখা আনতে হ'লো গুটিয়ে।

ইতিমধ্যে যে-কোনো একটা দিন আত্রেয়ী আশা করেছিলো অনমিত্র আসবে। কিন্তু এলো না সে। পাওয়া গেলো না তা'র কোনো সংবাদ। আত্রেয়ী ভেবেছিলো, একদিন ওর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তা' ও পারে নি। অনমিত্রের বাড়ীতে সে একা নয়; আরো অনেকে আছেন। তাঁদের দিতে হবে কৈফিয়ৎ—কেন না বয়েসটা ওর সাংঘাতিক। এ বয়েসের মেয়েদের বিশ্বাস নেই কিছু। অতএব আত্রেয়ী পেছিয়ে দাঁড়ালো।

বাড়ীর মালিক-গোষ্ঠী এসে পড়লেন। আত্রেয়ী এবং তপতী সংকুচিত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো এক পাশে। সবার কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে ওরা লুকিয়ে রাখতে চায় নিজেদের। অপর পক্ষ দেখলেন, বাড়ী ঠিক তেমনি সুশৃংখল এবং পরিষ্কার আছে। কোথাও এতোটুকু ধূলো জ'মে নেই। কোনো জিনিষের সামান্যমাত্রও নড়চড় হয় নি। মনে মনে ওদের প্রশংসা না ক'রে কেউ পারলে না। আত্রেয়ীরা আবার স্বল্প-পরিধির মধ্যে আড়াল ক'রে নিলে নিজেদের।

ইতিমধ্যে আত্রেয়ীর নামে এক মণি-অর্ডার এলো একশো টাকার। আত্রেয়ী অবাক হ'য়ে নীচে ছুটে এলো। কুপনে লেখা রয়েছে, তোমার পরীক্ষার ফীস্ এবং মাইনে পাঠালাম। ইতি—দাদা।

কিন্তু হাতের অক্ষর যে সুহৃদের নয় এবং সে-পক্ষের ঠিকানাও যে ঠিক নেই, এ কথা আত্রেয়ী নিজে ছাড়া জানলে না আর কেউই। সুরবালা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আত্রেয়ীর বুঝতে দেরী হ'লো না টাকা পাঠিয়েছে কে? কিন্তু লোকটা কি পাগল না কি? দেখা-শোনা নেই; নেই কথা-বার্তা...... হঠাৎ এতোগুলো টাকা!

তপতী জিগ্‌গেস করলে: দাদা টাকা পাঠালো বুঝি?

—হ্যাঁ রে ; ভারি আশ্চর্য, না ?

—আমাদের ভোলেনি এখনো দেখছি !

—না। আমি তো ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলাম ; এতোগুলো টাকা আসবে কোথা থেকে। কপাল ভালো।

পরীক্ষার আর দেরী নেই। দিনগুলো হু হু ক'রে ছুটে পালাচ্ছে। ওরা আর ফিরবে না কখনো।

তপতী বললে একদিন দুপুরে : বড়দি, বেরুচ্ছি আমি। আজ অনেক জিনিষ কিনবো।

—যা। আত্রেয়ী হেসে বললে : পথ হারাস্ নি যেন।

তপতী ট্রামে উঠলো বড়ো রাস্তায় এসে। যখন ও ট্রামের হাতল চেপে ধরেছিলো তখন এক মুহূর্তের জন্যে কে একজন হাতলের ওপর ওর হাতখানা স্পর্শ করেছিলো। তাকিয়ে দেখলে, শ্যামল। দ্বিতীয়বার ও তাকালে না তা'র মুখের দিকে।

শ্যামল একেবারে ওর পাশে এসে বসলো। সরাসরি জিগ্‌গেস করলে : কেমন আছো ?

—কে আপনি ? তপতী বললে : আমি তো আপনাকে চিনিই না।

—চেনো। শ্যামল তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে : আর না চিনলেই বা কি এসে যায় ? চেনবার অপেক্ষায় ব'সে থাকলে এ পৃথিবীতে কারুর সংগে আর আলাপ করা হ'তো না। কিন্তু সেজন্যে তোমায় ভাবতে হ'বে না ; আমি তোমাকে চিনি। ঈষৎ হাসলে শ্যামল। ওর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো দেখা গেলো। বললে : তোমার নাম তপতী ? চমৎকার নাম ! খুব ভালো লাগে আমার। আর তোমার দিদির নাম আত্রেয়ী। হ্যাঁ, যাক—দেখো, আমার কাছে তোমার কোনো সংকোচ করবার দরকার নেই ; কি বলো ? আছে না কি ?

শ্যামলের কোথাও ভয়াবহ কিছু খুঁজে পেলে না তপতী। সেদিন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যা'র কথা ও শুনেছিলো, আজকের এ-লোক যেন সে নয়।

—একলা কোথায় যাচ্ছো? শ্যামল মিষ্টি ক'রে জিগ্‌গেস করলে। ওর আকর্ষণীয় পরিচ্ছদ থেকে ভেসে আসছে এসেন্সের গন্ধ।

—কয়েকটা জিনিষ কিনতে। তপতী বললে। ওর নিরীহ সরল মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠলো; চোখের বড়ো বড়ো পল্লবগুলো এলো নুয়ে।

শ্যামল আড়চোখে তাকাচ্ছিলো ওর দিকে। ওর মনে বারবার ধ্বনিত হ'লো, তপতী সুন্দরী; তপতী অপূর্ব সুন্দরী!

—কোথায় জিনিষ কেনো? শ্যামল বললে।

—যে-কোনো দোকান থেকে কিনলেই হয়। তপতী জবাব দিলে: বিশেষ কিছু না। ভাবছিলাম কলেজ ষ্ট্রীট থেকেই কিনে নেবো।

—তার চাইতে চলো না মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেটে যাই। গেছো কখনো ওখানে?

তপতী ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে গেছে।

—ভালো লাগে না সেখানে? আমায় তো চমৎকার লাগে বেড়াতে; কতোদিন যাই শুধু শুধুই। চলো, সেখানেই যাওয়া যাক। জিনিষ কিনেই ফিরে আসবে, দেরী হবে না। কয়েক মুহূর্ত থেমে পুনরায় বললে: অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহ'লে—

শ্যামল থামলো।

কপালের ওপর থেকে একগোছা চুল বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে তপতী যথেষ্ট সংকোচ কাটিয়ে বললে: না; আপত্তি আর কি? চলুন।

ট্রাম তখন ধর্মতলায় মোড়ে এসেছে। শ্যামল বললে: চলো, তাহ'লে এখানে নামি। ব্যসে গেলে শিগ্‌গির হবে।

নেমে পড়লো ওরা; ব্যস ধরলো। তপতী পয়সা দিতে যাচ্ছিলো। শ্যামল বললে: ওকি? তুমি পয়সা দেবে কেন?

ও হরিণের চামড়ার ভরা ব্যাগটা বা'র করলে। দু'খানা টিকিট কেনা হ'লো।

—জানো? তোমার দিদি আমায় মোটেই পছন্দ করেন না। শ্যামল বললে করুণ কণ্ঠে।

—কেন? তপতী তাকালে ওর দিকে। আশ্চর্য তপতীর চোখের দৃষ্টি!

এক মুহূর্তের জন্যে শ্যামলের মনে হ'লো, কোনো একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে ও নেমে যায় ব্যস্ থেকে। ওর মনে প'ড়ে গেলো আত্রেয়ীর সেই সন্ধ্যার শান্ত কথাগুলো। ওর মনে হ'লো, তপতী শিশিরের মতো স্বচ্ছ; সদ্য-ফোটা রজনীগন্ধার মতো শুভ্র; তপতী দেবী-মূর্তির মতো অনিন্দ্যসুন্দর।

—কেন, কি জানি। দোষের মধ্যে আমি সেদিন বলেছিলাম, চলুন আমার গাড়ীতে। কিন্তু গেলেন না তিনি। আচ্ছা তপতী, তুমিই বলো তো গেলে কী হ'তো? পৃথিবীতে কেই বা আহ্বান করে কা'কে? আহ্বান করলেই কি তোমার বিশ্বাস হয় কোনো মতলব থাকতে হবে? অন্ততঃ আমার ছিলো না; বিশ্বাস করো তপতী। অমরেশের কাছে তোমাদের কথা যেদিন শুনেছি, সেদিন থেকেই আমি তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট। 'আকৃষ্ট' কথাটা শ্যামলের বহু গবেষণার অবদান। ও পুনরায় শান্ত কণ্ঠে ব'লে চললো: আচ্ছা তপতী, মানুষকে মানুষের ভালো লাগাটা কি অন্যায়? তা'ছাড়া ভালো লাগাটা কি নিজের ওপর নির্ভর করে? বলো না তুমি! ধরো তপতী, যদি আমি প্রকাশ করি যে তোমাকে আমার ভালো লাগে;

মানে খু-ব ভালো লাগে ; আচ্ছা তা'তে কি তুমি রাগ করবে ? নেমে যাবে ট্রাম থেকে ? কথা বলবে না আমার সংগে ?

তপতী কোনো উত্তর দিলে না ; চুপ ক'রে রইলো। শংকান্বিত হ'লো শ্যামল। ইনিও কি অগ্রজার পদাংক অনুসরণ করলেন ? নিরুৎসাহ না হ'য়ে ও আরো কোমল ক'রে বললে : রাগ করলে ?

—না, রাগ করবো কেন ? ওর কণ্ঠস্বরের সংকোচ শ্যামলের কান এড়ালো না।

গাড়ী এস্‌প্ল্যানেডে এসে পড়লো।

—এসো, নামা যাক। এখান থেকে হেঁটেই মার্কেটে যাবো। শ্যামল বললে।

ওরা হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি।

—তোমার দিদি কি করছেন ?

—পড়ছে। পরীক্ষার তো আর দেরী নেই।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটলো।

—এক্স্‌কিউজ্‌ ; প্রশংসা না ক'রে পারছি না। এ শাড়ীটা তোমাকে আশ্চর্য মানাচ্ছে কিন্তু। শ্যামল ওর দিকে তাকিয়ে বললে।

তপতী লাল হ'য়ে উঠলো। উষ্ণ আরক্ত একটা আভা ওর মুখের ওপর ঝল্‌কে গেলো। অন্তরে উঠলো একটা স্রোত। ও মাথাটা নীচু ক'রে নিলে।

—কিন্তু সবাইকে কি আর মানাতো ? কথার জের টেনে শ্যামল ব'লে চললো : আচ্ছা তপতী, রাগ করবে না তো ? তুমি জানো, তুমি কেমন দেখতে ?

তপতীর শরীরে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো রক্তস্রোত ; কিন্তু বাইরে প্রকাশ পেলো না কোনো কিছু। প্রায় শান্ত কণ্ঠে ও

বললে ঃ বাঃ, জানবো না কেন? প্রত্যেকেই তো জানে সে নিজে কেমন দেখতে।

—হয়তো তাই। কিন্তু তুমি যে কতো সুন্দর দেখতে তা' তুমি জানো না, তপতী ; জানতে পারো না। আর কেউ কখনো তা' বলেও নি তোমাকে। এবার শ্যামলের স্বরে বেশ অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেলো ঃ মানুষের কোনো ভাষা নেই, যা' তোমাকে বর্ণনা করে। এমন শিল্পী নেই যে তোমাকে ফোটায়। সত্যিই তুমি আশ্চর্য তপতী, তুমি অপরূপ!

তপতীর নিশ্বাস ঘন হ'য়ে এলো। একবার ওর ইচ্ছে হ'লো, শ্যামলকে থামতে বলে। কিন্তু পারলে না। ওর কানে কেউ যেন সুধা-বর্ষণ করছে। লোভ সম্বরণ করবার ক্ষমতা ওর লুপ্ত হ'লো। কেউ কোনোদিন এমন কথা বলেনি ওকে। আজ যদি কেউ বলে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তা'কে নিষেধ করবে ও কেমন ক'রে? ওর অন্তরে যে শতদল এতোদিন ঘুমিয়েছিলো, কথার আঘাতে তা'র ঘুম ভাঙছে। সে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে; মেলে ধরছে তা'র রসপুষ্ট পাপড়িগুলো।

—আমি জানি তুমি রাগ করবে না তপতী, বা মনে করবে না কিছু; কারণ অন্যায় কিছু আমি তোমাকে বলছি না। তুমি যে সুন্দর এ-কথা তোমায় বলার মধ্যে দোষের নেই কিছু। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। আমি যদি তোমার মতো সুন্দর হ'তাম, আর সে-কথা আমায় কেউ বলতো, আমি কি মনে করতাম কিছু? করতাম না তপতী। কিন্তু শুধু সুন্দর বললেই তোমার বর্ণনা শেষ হয় না। সব জিনিষের রূপ কি মানুষ এক কথায় ব'লে দিতে পারে? সন্ধ্যার সময় আকাশের যে রঙ হয়, দুপুরে সমুদ্রের যে সমাহিত মূর্তি, অরণ্যে যে ঝড় ওঠে, এ সব কি মানুষ বর্ণনা করতে পারে? আমিও তেমনি বলতে

পারি না তোমার সমস্ত কথা। মানুষের আকাশকে যেমন ভালো লাগে, ভালো লাগে যেমন তারাভরা রাত্রিকে, তোমাকে আমার ভালো-লাগাও তেমনি, তপতী। আর সেইজন্যেই তো কিছু মনে করবার অধিকার তোমার নেই। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো, পথের মধ্যে হঠাৎ অভাবিত এতো সব কথা তোমাকে বলছি কেন? কিন্তু না ব'লে কি আমি পারতাম? চুপ ক'রে থাকবার ক্ষমতা কি আমার ছিলো? মানুষ কেন কবিতা লেখে? কেন গান গায়? কেন নদীতে জোয়ার আসে, তুমি জানো, তপতী? শ্যামল থামলো।

ওরা মার্কেটে এসে পড়েছে।

—স্থান, কাল, পাত্র ভুলে খুব খানিকটা বকলাম, কি বলো?

কোনো উত্তর দিলে না তপতী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও শুধু এগিয়ে চললো।

অবসর।

—কই? কি কিনবে তুমি?

—সে সামান্য। এখানে বললে দোকানদার হাসবে।

—বা রে! পাগল মেয়ে; হাসবে কেন? বলো, কি কি দরকার তোমার?

—শাড়ীর একটা পাড়। তপতী মৃদু কণ্ঠে বললে।

—বেশ তো; এসো।

ওরা ঢুকলো একটা দোকানে। শ্যামলের নির্দেশ মতো দোকানদার কাউণ্ট্যরের ওপর স্তূপীকৃত ক'রে রাখলে অসংখ্য শাড়ীর পাড়।

—এগুলোর বড্ডো দাম হবে! তপতী শ্যামলকে বললেঃ সস্তা দেখে দিতে বলুন।

—কে বললে তোমায় দাম হবে ? কোনটা তোমার পছন্দ তাই বলো না।

—দামে যা'তে কুলোয় তাই একটা কিনবো আর কি ?

—বেশ ; তাই কিনো। কিন্তু কোনটা ভালো লাগছে, বলো তো ? দামে না পোষায়, না কেনা তো রয়েইছে।

তপতী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে একটা জরীর পাড়। শ্যামল দাম জানলে, এক টাকা গজ। চাইলে আট গজ।

—না না ; অতো দাম দিয়ে কি হবে ? তা' ছাড়া অতো ভালো জিনিষেরই বা দরকার কি ? তপতী বাধা দিতে চাইলে।

—বাঃ, দরকার তো ভালো জিনিষেরই। পছন্দ হ'য়েছে অথচ টাকার জন্যে কিনবে না, সে কি হয় ?

—কিন্তু অতো টাকা আমার কাছে হবে না। আমি চেয়েছিলাম একটা সাধারণ পাড় কিনতে।

—টাকা আমার কাছে আছে। না হয় পরে দিয়েই দিয়ো।

—অতো দামী জিনিষ নিলে বড়দি বকবে।

—বোকা মেয়ে। দিদিকে দামটা কমিয়ে বলতে পারবে না ?

—যদি ফের কিনতে চায় ? জানতে পারে ?

—জিনিষের দর বেড়ে যায় না ?

কাগজের প্যাকেট্টা হাতে নিয়ে শ্যামল একখানা দশ টাকার নোট দিলে। দুটো টাকা ফেরত নিয়ে ও তপতীকে বললে : তারপর ? আর কি বলো ?

সংকুচিত তপতী নীরবে মাথাটা নীচু ক'রে নিলে।

—আমার কাছে তোমার লজ্জা কি ? শ্যামল বললে।

—না, লজ্জা নয়। সহজ হ'তে চাইলে তপতী।

—তবে বলো না কি কিনবে ?

—কয়েকটা মাথার কাঁটা।

—আচ্ছা, এসো। কী রকম কাঁটা কিনবে ?

—এই সাধারণ।

শ্যামল হেসে উঠলো। বললে: অসাধারণ যে নয় তা' বুঝতে পারছি। কিন্তু লোহার না অন্য কিছু ?

—চলুন না, আগে দেখা যাক।

একটা ষ্টলে ওরা চুলের কাঁটা কিনলে। এবারো দাম দিলে শ্যামল। তপতীর ব্যাগটা ও কেড়ে নিয়ে রেখেছে।

—পাঁচটা বাজে ; যেতে হবে এবার। নইলে বড়দি আবার ভাববে।

—চলো যাই। কিন্তু তা'র আগে এসো দুটো আইস্‌ক্রীম্ খেয়ে নেয়া যাক।

—আপনি খেয়ে নিন, আমি দাঁড়াচ্ছি।

—একেবারে বোকা। এসো ভেতরে। শ্যামল আকর্ষণীয় ভংগীতে বললে।

ওরা ঢুকলো একটা দোকানে। কি দিতে হবে জেনে নিয়ে বয় পর্দাটা টেনে দিলে। ছোট্টো কেবিন। বাইরের শব্দটা শুধু শোনা যায়। সীটের সামনেই একটা প্রকাণ্ড আয়না। সে আয়নার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হ'লো শ্যামল ও তপতীর। তপতী চোখ নামিয়ে নিলে। আজকের এ ঘটনা ও আত্রেয়ীকে বলবে না। এ কাহিনী ওর একান্ত নিজস্ব হ'য়ে থাক: অভিনব, গোপন ইতিহাস।

বয় দুটো আইস্‌ক্রীম্ দিয়ে গেলো।

—আজকের দিনের কথা আমি ভুলবো না কখনো। শ্যামল হঠাৎ বললে: তোমার সংগ দিয়ে যে সম্মান তুমি আজ আমায় দিলে, হয়তো আমি তা'র যোগ্য নই। কিন্তু

তোমার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে, তপতী; বিশেষ ক'রে আজকের এই বিকেলের কথা।

কথার মাঝখানে অকস্মাৎ শ্যামল তপতীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে। তপতী মৃদু আপত্তির ভংগীতে হাতখানা সরিয়ে আনছিলো। তরলায়িত কামনার শিহরণ ওকে অস্পন্দ ক'রে আনছে। শ্যামল ছাড়লে না ওর হাত। গাঢ় স্বরে ডাকলে : তপতী!

তপতীর বুকটা কেঁপে উঠলো। চকিত দৃষ্টিতে ও একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলে। না; কেউ নেই এখানে; শুধু সে আর শ্যামল।

—শোনো তপতী! আমি তোমায় ভালোবাসি; হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালোবাসি। হয়তো তুমি বিশ্বাস করো না; তবু বলবো, সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি, তপতী! বলো, তুমি রাগ করলে না; দুঃখিত হ'লে না।

কিন্তু তপতী মুখ তুলতে পারলো না; মর্মর-মূর্তির মতো ব'সে রইলো।

—তুমি হয়তো ভাববে, এ মিথ্যে। শ্যামল পুনরায় বললে : দু' ঘণ্টায় ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু হয় তপতী, ভালোবাসা দু' মিনিটেও সৃষ্টি হয়; আবার সারা জীবনেও হয় না। আমি আজ, এই মুহূর্তেই বুঝতে পারছি, এতোদিন শুধু তোমার অপেক্ষাই করেছি।

কয়েক মিনিট অতিবাহিত হ'লো। আইসক্রীম্ গ'লে যাচ্ছে।

—কই? খাও, তপতী।

তপতী তাকালো শ্যামলের মুখের দিকে।

—খাও! এই যে আমি আরম্ভ ক'রে দিলাম। শ্যামল আইসক্রীমের পাত্রে চামচ ডোবালে।

তপতী যখন বাড়ী ফিরলো তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। .

—কি রে! আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই রাস্তা হারিয়েছিস আর না হয় অনমিত্রবাবুর সংগে দেখা হ'য়েছে।

—না। একটু থমকে গিয়ে তপতী বললে: দেখা তো কারো সংগে হয় নি। গিয়েছিলাম মার্কেটে; সমস্তটা দেখলাম; চমৎকার!

—গেলি কেমন ক'রে?

—কলেজ ষ্ট্রীট থেকে ট্রাম ধ'রে এলাম এস্প্ল্যানেড্। দেখো, পাড় পছন্দ হ'য়েছে কিনা?

—চমৎকার! নিশ্চয়ই অনেক দাম।

—না, মোটে চার টাকা। একটা ঢোক গিলে নিয়ে তপতী বললে: ভেবেছিলাম প্রথমে অনেক নেবে। আর এই কাঁটা। ওর বুকের ভিতরটা তখন কাঁপছিলো।

জামা-কাপড় ছেড়ে তপতী গেলো বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে। বড়দি'র সম্মুখীনতা থেকে আত্মরক্ষা। তা'ছাড়া গাল আর কাণ দুটো ওর কিছুতেই ঠাণ্ডা হ'চ্ছে না। দরজায় ও খিল তুলে দিলে। ভাবলে, একেবারে স্নানই ক'রে ফেলা যাক। অবশ্য স্নানের প্রয়োজনের চেয়ে ও বেশী তাগিদ অনুভব করলে নিজেকে দেখবার। দেখবে ও নিজেকে একান্ত ভাবে, সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে। দেখবে সমগ্র শরীরটাকে আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতা-বোধ নিয়ে; দেখবে প্রতিটি অবয়ব। শ্যামল বলেছে: অপরিমেয় সুষমা নাকি ওর দেহে। বলেছে: বর্ণনাতীত সুন্দর ও। প্রশ্ন করেছে: তপতী নিজেকে দেখেছে কি না কোনোদিন? দেখেছে ও। সে-কথা প্রকাশও করেছে। তবু মনে হ'লো, দেখা হয় নি ওর নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে। সুতরাং আজ দেখবে।

ওর মনে পড়লো, সহপাঠিনী নীরা সেদিন ওকে বলেছিলো : জামা-কাপড়ের ওপর থেকেও তোর দেহটা দেখলে ইচ্ছে হয়, যদি পুরুষ হ'তাম······

পাশ থেকে কৃশতনু একটি মুখে ব্রণ-ভরা মেয়ে অভিমত জানিয়েছিলো : তা' ব'লে ও রকম······পুরুষদের সামনে বেরুতে লজ্জা করে—

মণিকুন্তলা একদিন বলেছিলো : তোকে সেদিন আমাদের ওখানে দেখে অশোকদা' কী রিমার্ক করলে জানিস ? বললে, অংগহীন গ্রীক মর্মর-মূর্তিগুলোকে পুনর্নির্মাণ করতে হ'লে তোর চেয়ে ভালো মডেল নাকি আর হ'তে পারে না।

আজ এই মুহূর্তে ওর একে একে সব মনে পড়ছে।

তপতী শিউরে উঠলো 'আর্ট ইন্ পোর্ট্রেইট্-ফোটোগ্রাফী'র নগ্ন নারীমূর্তিদের আকর্ষণীয় ভংগীগুলোর কথা স্মরণ ক'রে। প্রথম যেদিন ও কয়েকখানা ছবির পাতা উল্টিয়েই নন্দিতার কাছে বহু মিনতি ক'রে বইখানা চেয়ে নিয়েছিলো নির্জন রাত্রে দিদি ঘুমিয়ে পড়লে অলস মন আর সাগ্রহ দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোকে উপভোগ করবে ব'লে, সেদিন ওকে ভালো লেগেছিলো সে-সব ছবি। আর আজ কল্পনায়ও তা'রা ওর সর্বাংগে দেহ-তাত্ত্বিক একটা পবিবর্তন এনে দিচ্ছে।

নন্দিতা বহু দিব্যি দিয়ে ব'লে দিয়েছিলো : কালই ফিরিয়ে দিস কিন্তু। চুরি ক'রে এনেছি। দাদা আবার খুঁজবে।

অবশেষে তপতী নিজেকে অনাবৃত ক'রে ফেললে। আয়নার মধ্যে ও মেঘমুক্ত আকাশের মতো ঝল্‌মল্ ক'রে উঠলো। মুগ্ধ হ'লো নারী। মুখ ও হাতের তুলনায় কতো বেশী উজ্জ্বল ওর দেহের রঙ! মোমের মসৃণতা ওর শরীরে। অপূর্ব ওর আবয়বিক পরিপুষ্টি। গলার হারখানা একটু ছোটো না করিয়ে নিলে লকেট্‌টা ঠিক বসবার স্থান পায় না। জীবন্ত

যৌবনের উদ্ধত শিখর থেকে পিছলে পড়লো ওর দৃষ্টি; নেমে এলো নীচে। বুভুক্ষু প্রাণশক্তি চায় সাগরের সংগম। অবিশ্রান্ত প্রবাহ; তরংগের সংঘাত; সৃষ্টির আবেদন। বাতাস-বিক্ষুব্ধ বহ্নিশিখার মতো কেঁপে উঠলো ওর দেহ; চিন্‌চিনিয়ে উঠলো ওর রক্তকণা; ক্ষুধাতুর হ'য়ে উঠলো শাণিত তরবারির মতো ওর ওষ্ঠ। পর্যাপ্তপুষ্পস্তবক-স্তনাভ্য নিজেরি শরীরকে ও একবার আলিংগন ক'রে ফেললে। রঙীন স্বপ্নের বিলীয়মান স্মৃতির মতো অনুভব করলে ও শ্যামলের সেই স্পর্শ। তপতীর পল্লবঘন চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হ'য়ে এলো।

দশ

কেটে গেলো অনেকগুলো দিন; অনেকগুলো রাত্রি। সূর্য পৃথিবী থেকে স'রে গেলো আরো দূরে। গাছের পাতা— পুরানোগুলো গেলো ঝ'রে; নতুন কতো জন্ম নিলো।

ইতিমধ্যে তপতীর সংগে শ্যামলের আরো দু'বার দেখা হ'য়েছে। হঠাৎ শ্যামলের সংগে রাস্তায় ওর দেখা হ'য়ে যায়। শ্যামল বলে, ও একেবারে আশ্চর্য হ'য়ে গেছে তপতীকে দেখে। ও নাকি জানতো, দেখা হবেই; না হ'য়ে পারে না।

ওদের সম্বন্ধ রীতিমতো ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। তপতী 'আপনি' থেকে এসেছে 'তুমি' হ'য়ে। সংকোচ ওর ক'মে গেছে। শ্যামলের সংগে দেখা হ'লে আনন্দে আর সুখে, উত্তেজনায় আর সম্ভাবনায় ঝলসে ওঠে ও। আশ্চর্য এক ফুলের মতো ওঠে সুরভিত হ'য়ে। ব্যবধান আর বিরহে ওর দিনগুলো ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। কল্পনার পাখায় ও উড়ে বেড়ায় দিক্ থেকে দিগন্তে। আত্রেয়ীর অবশ্য অনুজার ভাবান্তরের দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই বিন্দুমাত্র। সামনের সোমবারেই ওর পরীক্ষা। সমগ্র পৃথিবী ওর দৃষ্টির অন্তরালে। তপতী শ্যামলের ঠিকানাও সংগ্রহ করেছে। চিঠি লিখে তা'কে বারণ ক'রে দিয়েছে; সে যেন চিঠির উত্তর না দেয়; তাহ'লে সব জানাজানি হ'য়ে যেতে পারে। এটুকু তপতী বুঝতে পেরেছে যে, সমাজ আর আত্মীয়-স্বজন ওর ভালোবাসা কখনো বরদাস্ত করবে না; কখনো সম্মতি দেবে না। তাই ও সমাজের কাছে, লোকচক্ষুর সামনে উদঘাটিত করতে চায় না ওর এই প্রেম। বিবাহের অনুমোদিত ব্যভিচারে

সমাজের সম্মতি আছে : আছে সন্তুষ্টি। কিন্তু ওই অনুশাসনের বাইরে বিন্দুমাত্রও হৃদয়াবেগ সমাজ ক্ষমা করে না; কারণ সমাজ বৃদ্ধ; সমাজ ভীরু। বিচারবুদ্ধি তপতীকে দিয়েছে মানসিক তীক্ষ্ণতা; অভিজ্ঞতা ওকে দিয়েছে সাবধানী হবার সুবুদ্ধি।

শ্যামলের বাবা, মা বাইরে যাচ্ছেন কয়েক মাসের জন্যে। ওর মায়ের শরীর বিশেষ খারাপ। শ্যামলকেও যেতে হবে। তপতী সে-কথা জানতে পেরে পথের মাঝখানেই কেঁদে ফেলবার জোগাড়।

—ও কি? ছিঃ; অমন করে না। শ্যামল ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে : আমি কি যুদ্ধে যাচ্ছি? না দ্বীপান্তরে? না, না; তাকাও আমার মুখের দিকে। আমি সেখানে মোটেও দেরী করবো না। দেখো তুমি, ক'য়েক দিনের মধ্যেই এসে পড়বো। তুমি তো জানো—তোমাকে ছেড়ে একা একা আমি একদিনও থাকতে পারবো না। আর এই ঠিকানাটা রাখো; নিয়মিত চিঠি দেবে; না হ'লে কিন্তু আসতে আরো দেরী করবো। চলো, ঐ ট্রামটায় উঠি; সন্ধ্যে হ'য়ে এলো।

শ্যামল গেছে কলকাতার বাইরে। তপতী ওকে চিঠি লেখে। এর চেয়ে বেশী ভেবে-চিন্তে কাজ করবার ওর সামর্থ্য নেই। করবে না ও যা' ওর ভালো লাগে?

এদিকে আত্রেয়ীর পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেলো।

শেষদিন পরীক্ষা দিয়ে যখন ও বেরিয়ে আসে, দেখলে সামনেই অনমিত্র। আত্রেয়ীর বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দুলে উঠলো। তসরের কোটটা বাঁ কাঁধে ঝুলছে; মুখে সিগারেট।

—কেমন পরীক্ষা দিলেন? ও জিগ্গেস করলে।

—কি জানি! বুঝতে পারছি না। স্মিতহাস্যে আত্রেয়ী বললে: পাশ করলেও করতে পারি।

—উত্তম। আপাততঃ বাড়ীর দিকে না কি?

—কোথায় আর যাবো? আত্রেয়ীর কণ্ঠ হাল্কা; কথাগুলো বাতাসে কাঁপছে: চলুন; না হয় খানিকটা এদিক ওদিক করা যাক।

ওরা চলতে আরম্ভ করলো।

ফাল্গুনের অপরাহ্ন। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙের পেছনের আকাশ সূর্যের আভায় লাল। আর লাল আত্রেয়ীর হৃদয়। চুলের কয়েকটা খুচরো গোছা ওর কপালে এসে পড়েছে। ডান হাতে একটা কলম।

—আপনার কলমটা আমায় দিন।

—কেন? কি করবেন?

—খেয়ে ফেলবো। প্রশান্ত হাস্যে ওর সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

আত্রেয়ী লজ্জিত হ'য়ে কলমটা দিলে। নিবটা খুলে কলমটা কোটের পকেটে রাখলে অনমিত্র। বললে: শান্তি।

—কেন?

—কা'র গায়ে ফুটিয়ে দিতেন নিবটা কে জানে? অস্ত্র হাতে 'জোয়ান অফ আর্ক'।

আত্রেয়ী হেসে উঠলো।

—চলুন, একটা ব্যস ধরা যাক। অনমিত্র বললে।

—কোথায় যাবেন?

—বাঃ, আমি কি জানি? যেখানে আপনার ইচ্ছে হয়।

ওরা ব্যসে উঠলো। নামলে চৌরংগীতে।

—একটা কাজ করলে হয় না?

—যা' খুসি। আত্রেয়ীর কণ্ঠে কৌতুক।

—ঠিক ?

—ঠিক।

একটা রেস্তোরাঁয় ওরা ঢুকলো। এলো অনেকগুলো খাবার।

—এ সব কে খাবে ? আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে।

—আপনি এবং আমি।

—আমার ক্ষিধে পেয়েছে আপনাকে কে বললে ?

—কই ? তা'তো জানি না ? তবে বলেছে নিশ্চয়ই কেউ। তা'ছাড়া এখন তো খাবার সময়। চায়ের সময় তো উত্তীর্ণই হ'য়ে গেছে। হ্যাঁ, কি খাবেন বলুন ; চা ? কোকো ? কফি ?

—আপনি যা খাবেন !

—কোকোটা নির্জীব ; ওটাকে বাদ দেয়া যায়। বাকি চা আর কফি। আসুন লটারী করা যাক।

একটা টাকা নিয়ে টস্ করা হ'লো। কফি।

অনমিত্র সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে খেতে আরম্ভ করলে।

—খান। অনমিত্র আত্রেয়ীকে বললে।

আত্রেয়ী যে রীতিমতো ক্ষুধার্ত সে ওর খাওয়া দেখেই বোঝা গেলো। অনমিত্র আরো কিছু খাবারের অর্ডার দিলে।

—অতো খাবে কে ?

—কই, আপনি আর আমি ছাড়া আর কেউ তো খাদক নেই ! ইতিমধ্যে পেয়ালায় মাঝে মাঝে চুমুক দিন। কফিটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

আরো কিছু খাদ্য এলো।

—আপনার সংগে আমার কথা আছে। খেতে খেতে আত্রেয়ী বলেলে।

—সে তো আছেই।

—কেমন ক'রে জানলেন? আত্রেয়ী হাতের খাবারটা নামিয়ে রাখলে।

—বা রে! কথা না বললে সময় কাটবে কেমন ক'রে? অনমিত্র কফিতে চুমুক দিলে।

আত্রেয়ী হাসলো।

—আর একটা কথা। অনমিত্র বললে।

—কি?

অন্যমনস্ক অনমিত্র বললে: নাঃ।

—কি না?

—কই? কিছু বলছিলাম না কি?

—বলবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু···ভয়ে···

—কিসের ভয়? কই দেখি আপনার হাত। অনমিত্র হঠাৎ ওর বাঁ হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে: কই? বেশ তো সুন্দর নখ; ধারালো তো নয়। হাতখানা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললে: তবে আর ভয় কি?

—তবে বললেন না কেন?

—কি বলবো?

—তা' আমি কেমন ক'রে জানবো? মনে করুন না।

অনমিত্র খাওয়া বন্ধ ক'রে মাথাটা নীচু ক'রে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগলো।

—থাক; আপনাকে আর ভুলে যাওয়ার ভাণ ক'রতে হবে না। আত্রেয়ী ঈষৎ হেসে বললে।

টেনে টেনে বললে অনমিত্র: এই···আসছে···আ-স-ছে··· আচ্ছা, আপনি একটু ধরিয়ে দিন তো আপনি কি বলছিলেন?

—আমি বলছিলাম, আপনার সংগে আমার একটা কথা আছে। আপনি বললেন, সে তো আছেই। আমি জিগ্গেস্ করলাম, কেমন ক'রে জানলেন আপনি? আপনি বললেন, কথা না বললে সময় কাটবে কেমন ক'রে?

—আপনি নির্ঘাত পরীক্ষায় একটা অসম্ভব কিছু করবেন।

—কেন?

—কী সাংঘাতিক স্মরণশক্তি। হ্যাঁ, দেখুন, আমার একটা স্যাজেশ্যন আছে।

—কি স্যাজেশ্যন?

—আপনার মাথায় চুলের যা' সমারোহ দেখছি, মাঝে মাঝে হাওয়ায় মেলে দেবেন। মাথায় হাওয়া লাগলে স্মরণশক্তি প্রখরতর আর পরীক্ষার ফল আরো প্রশংসনীয় হবে।

আত্রেয়ী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। ভাগ্যে ক্যার্টেইন্টা ওদের অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকের থেকে আলাদা ক'রে রেখেছিলো; না হ'লে কী বিশ্রী ব্যাপার হ'তো।

—কিন্তু আমি ভুলিনি। আত্রেয়ী পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললে।

—আমার মনে পড়েছিলো; কিন্তু আপনি যা' হাসলেন! আমি আবার সব ভুলে গেলাম।

—আবার ধরিয়ে দিচ্ছি। আত্রেয়ী ছাড়বার পাত্রী নয়; সুতরাং বললে: আপনি বলছিলেন, কথা না বললে সময় কাটবে কেমন ক'রে?

—ঠিকই তো! কি ক'রে? অনমিত্র বললে: তারপরে কি বলছিলাম জানেন? বলছিলাম, কথা না থাকা মানেই পরস্পরের কাছে ফুরিয়ে যাওয়া। আমরা···এ-তো শিগ্গির কি এমন দুর্দশায় পড়বো?

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না।

অনমিত্র রুমাল দিয়ে মুখ মুছলে।

কয়েক মিনিট অতিবাহিত হ'লো। রাস্তায় মোটরের শব্দ আর মানুষের কোলাহল। সন্ধ্যার অন্ধকার বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে। রেস্তোরাঁর আলোগুলো সব জ্ব'লে উঠলো।

অনমিত্র সিগারেটটা মুখে রাখলে।

—দেশলাই আছে? আত্রেয়ী হেসে বললে।

অনমিত্রও হাসলো।

—এই নাও বখ্‌শিষ। অনমিত্র বললে।

বয় বিল্‌ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। অনমিত্রকে একটা প্রকাণ্ড কুর্নিশ জানিয়ে ও বিদায় নিলে।

—শুনুন তাহ'লে একটা গল্প। সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে অনমিত্র বললে।

—কিন্তু তা'র আগে আমার একটা কথা আছে।

—বলুন না। অনমিত্র তাকালে আত্রেয়ীর মুখের দিকে।

—অতোগুলো টাকা পাঠালেন কেন?

—কই? কি টাকা? অনমিত্র আকাশ থেকে পড়লো: আমি আবার কবে টাকা পাঠালাম! তা'ছাড়া আমার টাকাই বা কোথায়?

—কিন্তু আপনি কি জানেন না, আমার অভাব?

অনমিত্রের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। সিগারেটটা ও য়্যাশ্‌ট্রেতে নিভিয়ে রাখলে।

—কখন আমি আপনাকে অতোগুলো টাকা ফেরত দেবো? আত্রেয়ী বললে; ওর কণ্ঠ একান্ত করুণ এবং হতাশ: যদি কোনোদিন দিতে না পারি, কী লজ্জার কথা বলুন তো?

—শুনুন। অনমিত্রের গলার স্বর গম্ভীর, সহজ: আমি কি তাগাদা দিচ্ছি আপনাকে টাকার জন্যে? কোনো নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে টাকা দিতে হবে, এ চুক্তি তো আপনার সংগে হয় নি। অতো ব্যস্ত হবার কি আছে ?

—কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না; আমারও একটা কর্তব্য আছে তো ?

—আমি কি বলছি নেই ? এমন দিনও আসতে পারে, যেদিন হয়তো আপনি নিজে রোজকার করবেন। কে বলতে পারে ? কিংবা হয়তো ইতিমধ্যে আপনার বিয়ে হ'য়ে যাবে, তখন আপনার ভবিষ্যৎ স্বামীর কাছ থেকে না হয় টাকা ক'টা চেয়ে নিয়ে আসবো। কিন্তু আপাততঃ আপনি দয়া ক'রে একটু নিশ্চিন্ত হ'লে বাধিত হবো।

এরপর আর টাকার কথা উল্লেখ করতে আত্রেয়ী সংকোচ বোধ করলে।

—শুনুন।

আত্রেয়ী তাকালে অনমিত্রের দিকে।

—আমি টাকা দিয়েছি, এর জন্যে আপনি এতো কুণ্ঠা বোধ করছেন ; এর কারণ কি ?

উত্তরের জন্যে অনমিত্র কয়েক মূহূর্ত অপেক্ষা করলো। আত্রেয়ী সাড়া দিলে না।

—আমি আপনার অনাত্মীয় ব'লে ? আমাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই ব'লে ? অনমিত্রের কথাগুলো ধারালো হ'য়ে উঠলো : অবশ্য আমাদের পরিচয়ের আয়ু দীর্ঘ নয় ; আ-র বন্ধুত্বের দাবীও আমি করছি নে।

—অনমিত্রবাবু ! গাঢ় স্বরে আত্রেয়ী ডাকলে।

—বলুন।

—কিছু মনে করবেন না আপনি। আত্রেয়ী বললে : বিশেষ কিছু ভেবে আমি আপনাকে বলি নি। বিপদে আপনি

সাহায্য করেছেন, একথা কখনো ভুলবো না—বললে বোধহয় কিছুই বলা হবে না—

ওর অসমাপ্ত কথায় রেখা টেনে দিয়ে অনমিত্র বললে: চলুন, যাই। আমাদের পেট ভারী হওয়ার সংগে সংগে মনও ভারী হ'য়ে উঠছে; আসুন।

ওরা বাইরে এলো; রাস্তায়। সামনেই ক্যর্জন পার্ক্; মোটরের বিরাম নেই।

—আপনার রাত হ'য়ে যাচ্ছে না তো? অনমিত্র জিগ্গেস করলে: বাড়ীতে আবার ভাববে।

—কে আর ভাবছে আমার জন্যে?

—কেন? তপতী?

—ও আজ বাড়ীর মেয়েদের সংগে থিয়েট্যারে গেছে। আসবে সেই রাত্রি এগারোটা নাগাদ। হ্যাঁ, কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

—মাঠে কোথাও বসা যাবে; নয়তো ইডেন্ গার্ডেনে; কিম্বা আউট্রাম ঘাট, যেখানে বলেন।

—চলুন, কেল্লার পেছন দিকে শ্বেতপাথরের গম্বুজের কাছে গংগার ধারটা বেশ নির্জন।

—তাই চলুন।

কোলাহল ছাড়িয়ে, খেলার মাঠগুলো অতিক্রম ক'রে ওরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে বসলে, যেখান থেকে চৌরংগীর মোট্যরের শব্দও কানে পৌঁছায় না। দূর থেকে শহরের আলোগুলোকে মনে হ'চ্ছে বহুদূরে কোনো এক প্রাসাদে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়ালী সাজানো হ'য়েছে। মনে হ'চ্ছে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল এখন থেমে গিয়েছে। বিরাট যন্ত্র-দানব বিশ্রাম চায়। শুধু শহরের মৃদু স্পন্দন কম্পিত হ'চ্ছে প্রান্তরের বায়ুস্তরে।

ঘনিয়ে এসেছে রাত্রির অন্ধকার। আকাশে তারাগুলো স্পষ্ট এবং প্রখর। চৈত্রের একটি রাত্রি। বসন্তের একটানা বাতাস। কান পেতে রাখলে ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাক শোনা যায়। ওরা শুধু দেখতে পাচ্ছে পরস্পরকে ; বাইরের আর কোনো কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন কতো রাত্রি শেষ হয়েছে ; আরো আসবে এমন কতো রাত্রি। অন্ধকার আসছে গাঢ়তর হ'য়ে। হঠাৎ মনে হয় গভীর রাত্রি। চোখ তুললেই কালো আকাশ ; সপ্তর্ষি আর ধ্রুবতারা।

—মাটিতে যদি অসুবিধে হয় এই কোট্‌টা বিছিয়ে বসতে পারেন। অনমিত্র বললে।

—না, কই ? কোনো অসুবিধে হ'চ্ছে না তো !

চুপচাপ। আত্রেয়ী আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না। অন্ধকারে ও বুঝতে পারলে অনমিত্র পকেট থেকে একটা সিগারেট বা'র করলো।

—দেশলাই আছে ? অনমিত্র বললে।

—আছে। আত্রেয়ী উত্তর দিলে।

—কই ? দিন।

—আপনার কোটের পকেট থেকে নিন।

অনমিত্র হেসে উঠলো। দেশলাই বা'র ক'রে ও সিগারেট ধরালে। সে আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে আত্রেয়ী অনমিত্রের মুখখানা দেখতে পেলো।

—আচ্ছা, এখানে কেউ আসবে না তো ? পুলিশ ?

—এলেই বা অনমিত্র বললে।

—যদি আমাদের থানায় নিয়ে যায় ?

—নিলেই বা।

—কিছু হবে না ? আত্রেয়ী বিস্মিত হ'লো।

—কি আবার হবে? আমি তো আর জোর ক'রে আপনাকে ধ'রে আনি নি।

—আমি যদি সেখানে গিয়ে বলি, আপনি আমায় জোর ক'রেই নিয়ে এসেছেন।

—ওরা সে-কথা বিশ্বাস করবে না। অনমিত্র সিগারেট টানতে লাগলো।

—বা রে; কেন করবে না?

—সত্যি নয় ব'লে। আর আমি যদি বলি, আপনি আমায় ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন?

—ওরা বিশ্বাস করবে না। গম্ভীর হ'য়ে আত্রেয়ী বললে।

—কেন? অনমিত্র জিগ্‌গেস করলে।

—সত্যি নয় ব'লে।

দু'জনেই হেসে উঠলো। এবং যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কয়েক মিনিট কথা বলতে পেরেছে ব'লে দু'জনেই আনন্দিত হ'লো।

আবার সেই নিস্তব্ধতা; ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।

কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অনমিত্র বললে: আপনার ঠাণ্ডা লাগবে না তো?

—না। আর লাগলেই বা উপায় কি?

—কেন? আমার কোট্‌টা রয়েছে তো?

—আপনার বুঝি ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই?

—আমার সার্ট্‌ আছে।

—আমারো তো জামা আছে; শাড়ী আছে।

—আপনাদের থেকে আমরা অনেক শক্ত।

—কিন্তু দেখা গেছে পুরুষরাই এসব কম সহ্য করতে পারে।

—পুরুষদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কোথায় হ'লো? অনমিত্র ব'লে ফেললে।

—তা' হ'য়েছে। উত্তর দিলে আত্রেয়ী।

কিন্তু এ প্রসংগটা বিরক্তিকর।

—শুনুন। অনমিত্র হঠাৎ বললে।

আত্রেয়ী চমকে উঠলো।

—পাশ ক'রে কি করবেন ঠিক করেছেন ?

যাক। আত্রেয়ী একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়লো। বললে : কি জানি ? আগে পাশ করি।

—কিন্তু আমি জিগ্‌গেস করছি, পাশ করলে কি করবেন ?

—কি জানি ?

—কেন ? পড়বেন না ? অনমিত্র সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে।

—টাকা নেই।

—কিন্তু কিছু তো একটা ক'রতে হবে। না হয় দু' একটা মাষ্টারী জোগাড় ক'রে নেবেন। এ তো মধ্যপথে এসে থেমে যাওয়া। না হ'লো এদিক, না হ'লো ওদিক। বি. এ.-টা অন্তত: আপনাকে পাশ করতেই হবে। অবশ্য যদি অন্য কোনো মতলব থাকে, সে-কথা আলাদা।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ...মানে...যদি বিবাহিত হওয়া স্থির ক'রে থাকেন—

—বিবাহ ? কবে ? কা'কে ? বিস্মিত আত্রেয়ী প্রশ্ন উজাড় ক'রে দিলে।

—বাঃ, তা'...আমি কি জানি ?

অবসর।

সামলে নিলে আত্রেয়ী ; প্রস্তুত হ'য়ে নিলে অনমিত্র। দু'জনেই স্বাভাবিক।

—হুঁ, কি বলছিলেন ? আত্রেয়ী সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

সহজতর হ'য়ে অনমিত্র উত্তর দিলে : তা'ছাড়া আজকাল বোধ হয় মেয়েদের বিয়ে করাটাই সেইফ্।

—কেন? আত্রেয়ী উদ্‌গ্রীব হ'লো।

—সমাজ এখনো তৈরী হয় নি; তা'র জন্যে সময় লাগবে। দেখুন, দু'টো ছাড়া মেয়েদের পথ নেই। এর জন্য অবশ্য দায়ী পুরুষরা। কিন্তু সে কথা আমার বক্তব্য নয়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, দু'টো মাত্র রাস্তা মেয়েদের জন্যে খোলা; এক স্কুল-মাষ্টারী আর একটা বিয়ে।

আত্রেয়ী বিস্মিত হ'লো। অনমিত্রের মনের আর একটা দিক ওর কাছে ধীরে ধীরে আলোকান্বিত হ'য়ে উঠছে। আগ্রহান্বিতা আত্রেয়ী নীরব রইলো।

অনমিত্র শরীরটাকে ঘাসের ওপর এলিয়ে দিয়ে ডান হাতের ওপর মাথাটা ভর ক'রে বললে : আমরা কী জানেন? সমাজের রূপ। অর্থাৎ আমি আজ যা', মানে আমায় আপনি আজ যা' দেখছেন কিংবা আমি আপনাকে আজ যা' দেখছি, এ আমাদের সমাজের সৃষ্টি। সমাজ আমাদের বিধাতা। আমাদের সমস্ত রক্তে তা'র ইংগিত রয়েছে; আমাদের সমস্ত কার্যে তা'র প্রভাব, আধিপত্য। আমাদের ভালোবাসা, ভালোবাসার আদর্শ, আমাদের দুর্বলতা, জয়, পরাজয়, আমাদের ঔদার্য আর মহত্ব, শঠতা এবং সহৃদয়তা সমস্তই সমাজের সৃষ্টি। আর এই সমাজের দুর্ব্যবস্থার জন্যে আমাদের বিয়েগুলো সব একেকটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। কিন্তু এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট না ক'রে আমাদের উপায় নেই। তথাপি আমার কি মনে হয় জানেন? বিয়েটা সব মেয়েদের পক্ষেই উপযোগী; কিন্তু সব পুরুষের পক্ষে নয়। পুরুষরা বহির্মুখী অর্থাৎ বিভিন্ন পথগামী তা'দের চিত্ত; আকর্ষণ তা'দের বহু; মেয়েরা সাধারণতঃ একমুখী; মন তা'দের একনিষ্ঠ। আর

তাই তা'দের যৌবনের শেষের দিকটা হ'য়ে ওঠে ভয়াবহ; অত্যন্ত করুণ; বন্ধুহীন, একাকী। যৌবনে তাদের বন্ধু অগণিত। যৌবনের শেষে তা'রা বন্ধুহীন। তাই আমার মনে হয়, প্রায় সব মেয়েরই বিয়ে করা উচিত; যদিও এটা একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌। আমরা, পুরুষরা বাহাত্তর ঘণ্টা সাঁতার কাটতে পারি; বাহান্ন ঘণ্টা খেলতে পারি তাস। আমরা যুদ্ধে ম'রে যেতে পারি এক মুহূর্তে; খেলার মাঠে পা ভাঙ্‌তে পারি; চিরজীবন মামলা করতে পারি; অবিরাম প্রেম করতে পারি। অর্থাৎ মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের জীবনে ফেনায়িত বৈচিত্র্য আছে। আপনাদের তা নেই। পুরুষের বার্ধক্যেও তা'র বৈচিত্র্যের অভাব হয় না; কিন্তু মেয়েরা যায় শেষ হ'য়ে। যৌবনের পর অবিবাহিতা মেয়েরা হ'য়ে যায় অনাবশ্যক, অর্থহীন। অনমিত্র থামলো।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

—আমি কি ভাবছিলাম জানেন? আত্রেয়ীর কণ্ঠ প্রশান্ত, স্নিগ্ধ।

কি?

—আপনি যে এতো কথা ভাবেন তা' তো ধারণা করতে পারি নি!

—কই? আমি ভাবি না তো!

—হ্যাঁ, ভাবেন।

—তাহ'লে ভাবি। কিন্তু আমি নিজেই জানি না যে, আমি কিছু ভাবি। আচ্ছা আপনার মনে এ-সব কোনোদিন জাগেনি?

—না; সময় পাই নি আমি। এবার থেকে হয়তো ভাববো। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই ভাবতে হ'বে। সামনে আমার শংকাকুল ভবিষ্যৎ। আত্রেয়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—কেন ?

—এই মাথার ওপর কেউ নেই দেখা-শোনা করবার ; সাহায্য করবার নেই কেউ। দাদা ছিলেন, তিনি গেলেন ছেড়ে ; তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ছেড়ে আমাদের সংবাদ নেয়ার সময় পান না। অনেকটা জো'র ক'রে কলকাতা চ'লে এসেছি ; যদি কোনোদিন নিজের একটা ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। কিন্তু তা' পারবো ব'লে মনে হ'চ্ছে না। যাঁদের কাছে আছি তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু একটা ব্যাপার কি জানেন ? কোনোদিন আমি নিরুৎসাহ হই নি ; ভয় পায়নি কোনো কিছুর জন্য। আর……তারপর……

– আত্রেয়ী হঠাৎ থেমে গেলো।

—থামলেন যে ? অনমিত্র জিগ্‌গেস করলে।

—তারপর নিতান্ত দুঃখের দিনে আপনার দেখা পেলাম। কিন্তু অনেক উপমা আর অলংকার দিয়ে তো আপনাকে বিশ্লেষণ কী ব্যাখ্যা করা যাবে না।

অনমিত্র কোনো উত্তর দিলে না।

সময়ের কাঁটা ঘুরে চলতে লাগলো অত্যন্ত মৃদু গতিতে। রাত্রি হ'লো গভীর। শহরের স্পন্দন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। শহর ম'রে যাচ্ছে। তারাগুলো স্থান-পরিবর্তন করেছে।

—সামনে তো দীর্ঘ ছুটি ; দেশে যাবেন না কি ? মনে আছে ষ্টীম্যরের সেই ভিড়ের কথা ? নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রে অনমিত্র বললে।

—আছে। দেশে যাবো না ; কেউ তো নেই সেখানে। আচ্ছা, আপনি আমার জন্যে একটা মাষ্টারি জোগাড় ক'রে দিতে পারেন ?

—কি হ'বে ?

—কি হ'বে মানে? সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন, টাকা আসবে।

অনমিত্র উত্তর দিলে না; চুপ ক'রে রইলো।

—আপাততঃ টাকা-কড়ির কথা ভোলা যাক। অবশেষে অনমিত্র বললে: আচ্ছা, একটা মজার ব্যাপার দেখেছেন?

বিস্মিত হ'য়ে আত্রেয়ী বললে: কি?

—সমস্ত সন্ধ্যেটাই আমরা যে-সমস্ত জিনিষ নিয়ে কথা বলেছি, মোটেই সে-সব নিয়ে আমাদের কথা বলবার কথা নয়। আর তাই যা' কিছু আরম্ভ করি ক্লান্তিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। বলুন সব এমন কিছু যা—

অনমিত্র থামলো।

—কি বলবো? আমার জীবনে কোনো ঘটনা নেই; নেই কোনো মহৎ সম্ভাবনা। এক কথায় অ্যান্‌ইম্‌পরট্যান্ট্। বরং আপনি কিছু বলুন, আমি শুনি; বেশ ভালো লাগবে আমার। আচ্ছা, আপনার বাড়ীর কথা বলুন।

—বাড়ীর কথা কি আর? একটা বাড়ী; লোকজন তেমন নেই। আত্মীয়ের মধ্যে আমি আর মা; বাবা নেই; বোন একটি মাত্র, বি. এ. পড়ছিলো; দু' বছর হ'লো মারা গেছে। একটি ছোটো ভাই আছে; লাট্টু ঘোরায় আর চাক্‌তি খেলে। নিজের বলতে আর বিশেষ কেউ নেই কয়েক জন বন্ধু ছাড়া। বেশীর ভাগ সময় তা'দের সংগেই কাটে। কিছুই আপাততঃ করি না; বেকারও বলতে পারেন: লোকেরাও তাই বলবে। আড্ডা মেরে আর উপন্যাস প'ড়ে সময়টা খুব চমৎকার কাটে। আর···কোনো স্ত্রী-বন্ধু নেই; অবশ্য আপনি সম্মতি দিলে বলতে পারি, আপনি ছাড়া—

আত্রেয়ী মুখ তুলে তাকালে অনমিত্রের মুখের ওপর। ওর ঝক্‌ঝকে চোখ দুটো অনমিত্র দেখতে পেলো। একটু থেমে

পুনরায় ও বললে : কথাটা বলবার আগে আমার বোধ হয় একবার ভেবে দেখা উচিত ছিলো, আমার কোনো অভিসন্ধি আছে, এ-কথাও তো আপনার মনে হ'তে পারে।

—ছি ছি ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে-কথা আমার মনে হ'তে পারে না।

—সেই তো স্বাভাবিক।

—সব ক্ষেত্রে নয়। আত্রেয়ী প্রতিবাদ করলে।

আত্রেয়ী প্রশংসা ক'রতে জানে না ; প্রয়োজনও বোধ করে না। কিন্তু তবু যেন অনেক কথা বলতে চায় অনমিত্র সম্বন্ধে। কী কথা, তা' অবশ্য ও নিজেও সব সময়ে বুঝতে পারে না।

—যাবেন না কি একদিন আমাদের বাড়ী ? চলুন না। অনমিত্র বললে : দেখে আসবেন কেমন সব কার্টুন এঁকেছি।

—যাবো। আপনি ছবি আঁকেন না কি ?

—ঠিক ছবি নয় ; অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরা যা' আঁকেন, তা' নয়। ঠাট্টা করতে আমার ভালো লাগে ; সিরিয়্যস্ ছবি আমি আঁকতে পারি না। সুন্দর মেয়ের ছবি আঁকতে গিয়ে তা'র নাকটা দিই একটুখানি ঘুরিয়ে ; চিবুকের তলায় আঁকলাম মাংসের স্তূপ ; গলাটা করলাম জিরাফের মতো। একবার ভালো একটা ল্যাণ্ড্স্কেইপ্ আঁকলাম ; কিন্তু হাসবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার তুলি কি সৃষ্টি করলো জানেন ? একটা গাধা, গাছের নীচে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে পা ছুঁড়ছে। এবং ঠিক সেজন্যেই আমার ছবিখানা বন্ধুমহলে প্রশংসা পেলো না। তা'রা বললে : গাধাটাকে মুছে দাও। আমি বললাম : অসম্ভব। তা'হলে হাসবার আর রইলো কি ? বন্ধুরা বললে : সব কিছুতেই হাসতে হ'বে তা'র মানে কি ? আমি বললাম : বাঃ, যদি

ঠাট্টাই করতে না পারলাম, তবে করলাম কি? আচ্ছা, মনে হয় না আপনার, আমাদের সমাজে এমন কিছু আছে যা' ব্যংগের বাইরে? যা'কে মুখ ভ্যাঙচাতে আমাদের সংকোচ হ'বে? যা'কে ঠাট্টা করতে আমাদের মন হ'য়ে উঠবে দ্বিধাগ্রস্ত? যা' কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান, যা' কিছু মানুষের সম্বন্ধে, যতো কিছু হৃদয়াবেগ, প্রিয়তমের জন্যে যতো চোখের জল, সমস্ত sham. সব চাইতে হাস্যকর কি জানেন? এই পশ্চিমিক আধুনিকতা; আধুনিক হ'বার জন্যে আমাদের অক্লান্ত চেষ্টা। পোষাকে, পরিচ্ছদে, ভংগীতে, কথায়, ব্যবহারে আমাদের আধুনিক হবার প্রাণান্তকর পরিশ্রম। তুলি দিয়ে আঁকতে হ'বে ভ্রূ, রঙ দিয়ে লাল কাল করতে হ'বে ঠোঁট আর নখ, বেল্ট্ দিয়ে সরু করতে হ'বে কোমর, আর পরিচ্ছদ প্রকাশ করবে দেহ যেখানে লজ্জা-হীন তার পংকিল পরিণতি। আমরা মদ খাওয়াকে সভ্য করেছি ড্রিংক্ আখ্যা দিয়ে; মাতলামিকে বলি, একটু ওভ্যর-ডোজ্; নারী-পুরুষ নাম লেখাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে লালসার অনুপেক্ষণীয় প্রেরণায়। মেয়েরা প্রচার করে যেন তা'দের আর কিছু নেই; ওরা পুরুষদের ভোলাতে চায় রঙ দিয়ে, দেহের লোভ দেখিয়ে। যে দেহের মূল্য সামান্য কয়েকটি রজতমুদ্রা মাত্র। কয়েকটি টাকার পরিবর্তে যে দেহ আমরা পাই আমাদের যথেচ্ছ আয়ত্তের মধ্যে। সব-চাইতে হাস্যকর কি জানেন? আমাদের এই আধুনিক ভালোবাসা; যা'কে আমরা কখনো কখনো বলি প্লেটোনিক্। কী ভয়ংকর সুবিধান্বেষী যে আমাদের এই পারাবত-প্রেম, সে-বিষয়ে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না জানি নে; কিন্তু আমার কিছু কিছু দেখা আছে। যা'রা আজ পরস্পরের কাছে কাঁদে তা'রাই কাল তৃতীয় পক্ষের বুকে মাথা রেখে হাসে।

উত্তেজিত অনমিত্র থামলো। আত্রেয়ী স্তম্ভিত। কয়েক

মুহূর্ত অতিবাহিত হ'লো। অনমিত্র একটা সিগারেট বা'র ক'রে ধরালে। দেশলাইএর আলোতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর রক্তাভ মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

অনেক ক্ষণ অতিবাহিত হ'লো। অনেকগুলো মুহূর্ত খ'সে পড়লো সময়ের হাত থেকে; ভেসে চ'লে গেলো সমুদ্রের ফেনার মতো; মিলিয়ে গেলো। আর রাত্রি হ'লো গভীর। আকাশের তারাগুলো কাঁপছে আর কাঁপছে স্পন্দিত শহরের দূর বাতিগুলো। বাতাস ব'য়ে আসছে মাঠের ওপর দিয়ে; শাহরিক বাতাস। যে বাতাসের তরংগে রয়েছে সভ্য মানুষের পিয়ানোর ঝংকার, প্যারিসিয়ান্ সন্ধ্যার গন্ধ, স্কচ্ পানীয়ের সোনালী মাদকতা; উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি আর লালসার গান; যে বাতাসে শহরের যন্ত্রের শব্দ আর সভ্যতার কালো ধোঁয়া।

—চলুন, শহরে ফেরা যাক্। অন্যমনস্ক সুরে অনমিত্র বললে: অনেক রাত হ'লো বোধ হয়। চলুন, ঘড়ি দেখে আর কি হ'বে? চারিপাশে অবকাশ আর মনেও বিশ্রাম। মন্দ লাগে না এ আলস্যের স্পন্দন; কি বলেন?

—সত্যিই। চলুন।

অনমিত্র দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। ওর প্রসারিত হাতে ভর ক'রে আত্রেয়ী উঠে পড়লো। সটান হ'য়ে দাঁড়িয়ে ও চুলটা ঠিক ক'রে নিলে; শাড়ীর প্রান্তকে নিলে সুবিন্যস্ত ক'রে। এবার ওরা শহরের দিকে পা বাড়ালো, যেখানে মোট্যর আর মানুষের ভিড়, বিদ্যুৎ আর বেতারের ভীতি।

এগারো

আত্রেয়ী দাদাকে চিঠি লিখলে, পরীক্ষায় ও ভালো করেছে ; নিশ্চয়ই পাশ করবে। এর পর ওদের কী করা উচিত ? পড়তে অনেক খরচ ; সে খরচ সংগ্রহ করবার ক্ষমতা ওর কোথায় ? সে ওদের নিয়মিত কিছু সাহায্য করতে পারে কি না ? অনেক কষ্টে ও এতোদিন চালিয়েছে ; আর ওর সামর্থ্য নেই। সে যদি চায় ওরা ফিরে যেতে পারে দেশে। সেখানেও দু' বোনে পড়াশোনা করতে পারে।

চিঠি ও লিখলো বটে। কিন্তু উত্তর আর এলো না। অনেক অপেক্ষা ও করলো, কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই। বিরক্তি এবং দুঃখে ওর সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। বন্ধন ওদের আল্গা হ'য়ে এসেছিলো সত্যি ; কিন্তু সে যে একেবারে ছিন্ন হ'য়ে যাবে এতোটা ও আশা করে নি। আজ এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হৃদয় ওর ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। দাদার স্নেহ এবং ভালোবাসার স্মৃতি ওদের মন থেকে কোনোদিন মুছে যাবে না। সে আনন্দের দিনগুলো আমরণ অক্ষয় হ'য়ে থাকবে ওদের চিত্তে। তথাপি আজ হঠাৎ ওর মনে হ'লো, হৃদয়তন্ত্রীর সমস্ত তার ছিন্ন। তারা বুঝি কোনো-দিন জোড়া লাগবে না ; বাজবে না আর কোনোদিন। নিজের জীবনে না ঘটলে ও কোনোদিন ধারণাও করতে পারতো না যে এমনও সম্ভব।

কিন্তু দিন ওদের কাটতে লাগলো। বাড়ীর মধ্যে দু' বোনেই বেশ খাপ খেয়ে গেছে। কেউ আর ভ্রূক্ষেপ করে না ওদের ; আছে বা নেই সে-বিষয়ে কারুর যেন এসে যায় না কিছু। মেয়েরাও আর ওদের গ্রন্থির পরিপুষ্টি কিম্বা আধ্যিবিক

স্ফীতির সমালোচনা করে না। সমস্ত আলোচনা তা'দের শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু অমরেশ ওদের ভোলে নি; সে নেয় ওদের সংবাদ। ওদের সুখ-সুবিধের ওপর তা'র তীক্ষ্ণ নজর। সময়ে অসময়ে সে আসে; আত্রেয়ীর সংগে গল্প করে, হাসে, ঠাট্টা করে; কোনোদিন করে রাগ বা অভিমান। সলজ্জ স্বভাব ওর ভীরু। জোর ক'রে কিছু প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করবার ওর ক্ষমতা নেই; সাহস নেই স্পষ্ট ক'রে কিছু বলবার। যে আকাংক্ষা ওর অন্তরে অংকুরিত হ'য়ে ওঠে তা'র আয়ু নিতান্ত অল্প। ঝড় নেই, আছে একটা স্পন্দন; স্রোত নেই, আছে স্রোতের একটা ঝিকিমিকি; ঢেউ নেই, শুধু একটা জলোচ্ছ্বাস। অমরেশ ওদের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছে; দরকারে অদরকারে ও এসে দাঁড়ায়। প্রয়োজন যখন জাগে, ও ছুটে আসে। প্রয়োজনের অনুভূতি যখন শেষ হ'য়ে যায়, তখনও ও যাবার নাম করে না; ফেরবার রাস্তা ও হারিয়ে ফেলে।

এদিকে তপতীর কিশোর জীবনে যে অপরূপ অধ্যায়ের সূচনা হ'য়েছিলো, তা' আবার পরিণত রূপ গ্রহণ করলো। শ্যামল এলো ফিরে ওদের কলকাতার বাড়ীতে—একা। পরিবারের সবাই রইলো বাইরে; স্বাস্থ্যের তাগিদে।

তপতীর সংগে দেখা হ'তে শ্যামলের দেরী হ'লো না। তপতীর কিন্তু একটা মাত্র সময় একা বেরুবার; কলেজের সময়টা। কলেজে যাবার জন্যে ও বেরোয়; কিন্তু যায় না কলেজে। শ্যামলের সংগে দক্ষিণেশ্বর, মিউজিয়াম, বোটানিক্‌স্, চিড়িয়াখানা, কিম্বা কোনো ভালো রেস্তোরাঁ, এই ক'রে ঘুরে বেড়ায়। শ্যামল ওকে কিনে দেয় নানান জিনিষ, যেগুলো আত্রেয়ীর দৃষ্টি এড়িয়ে ওকে রাখতে হয়; ব্যবহার করতে হয় গোপনে। একদিন ও ভেবেছিলো দিদিকে বলবে শ্যামলের সমস্ত কথা; কিন্তু পারলে না বলতে। সব সময়েই ওর মনে

হয়, লুকোবার কিছু নেই, নেই কোনো অন্যায় এতে। তথাপি ও ভয়ে পেছিয়ে আসতো; বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মতো সাহস ও সংগ্রহ করতে পারতো না। আশ্চর্য হ'য়ে যেতো ও। পৌঁছুতে পারতো না কোনো সিদ্ধান্তে। নিজেদের ভালো-বাসাকে ও কোনোদিন বিচার ক'রে দেখেনি; দেখেনি কোনোদিন বিশ্লেষণ ক'রে। ভাবতেই পারতো না ও; যুক্তির স্থিরতা ওর এখনো হয় নি। একটা অস্বস্তি অনুভব করেছে; একটা শারীরিক যন্ত্রণার মতো ও সময়ে সময়ে অস্থির হ'য়ে পড়তো। কী করবে ভেবে পেতো না; স্থির করতে পারতো না ওর কর্তব্য কী? ওর অনেকবার মনে হ'য়েছে, কোথায় যেন কী একটা খুব সাংঘাতিক গোলমাল চলেছে, যা'কে অনুভব করা যায় মাত্র; কোনো রূপ দেয়া যায় না। কোনো কোনো দিন শ্যামলের সংগ ছেড়ে এসে ও আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকাতে পারতো না; ওর যেন ভয় করতো। আশংকা ওর প্রেম-পরিণতির জন্যে নয়; আশংকা, যদি ওর ভালোবাসা অপমানিত হয়। এ-ই ওর জীবনের প্রথম প্রেম। নিজের ওপর এক একদিন ও বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতো। পথেই মনস্থির ক'রে ফেলতো, আজ আর কোনো লুকোচুরি নয়, আজ ও খুলে বলবে সব কথা; কোনো কিছু গোপন রাখবে না। কিন্তু অগ্রজার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে সংকল্প ওর টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যেতো।

আরো কয়েক মাস অতিবাহিত হ'লো।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আত্রেয়ী পাশ করেছে খুব ভালো ভাবেই। কিন্তু আনন্দের পরিবর্তে এলো ওর ভয়। পথ যতোদিন শেষ হয় নি ততোদিন ও হেঁটেছে। আজ সীমানায় এসে ও থম্‌কে থেমে গেলো। নতুন পথ যে আরো আছে সেটা ও জানে; কিন্তু সে পথের দুর্গমতাও ওর একেবারে অজানা নয়; জীবনে যে সময়ে ওর যুদ্ধক্ষেত্রের

সীমানার বাইরে থাকবার কথা, সে সময়টা ও কামানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। জয়ী হবার দৃঢ় একটা আকাংক্ষা ওকে দিয়েছিলো উদ্যম, দিয়েছিলো একটা শক্তি। আজ জীবনে ওর নেমে এসেছে ক্লান্তি; ভয়াবহ একটা ক্লান্তি। পৃথিবীর চারিদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও ওর উৎসাহ নেই।

বাড়ীতে সবাই আত্রেয়ীর কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হ'লো। এটাও কেমন ক'রে প্রকাশ পেলো যে, অমরেশ পাশ করলেও আত্রেয়ীর মতো ভালো ভাবে পারে নি।

সেদিন সুরবালা বললেনঃ দেখো বাছা! আর পড়াশোনা নয়। হাকিম হ'তে যখন যাচ্ছো না তখন অতো কেতাব মুখস্থ করবার দরকারই বা কি? সরকারের বুদ্ধি আছে যে, মেয়েদের তারা হাকিম করে না। মেয়েরা চিরদিনই অন্দর-মহলের জীব। বরঞ্চ লিখে দিচ্ছি সুহৃদকে এবার একটা পাত্রের সন্ধান করুক; এদিকে আমরাও চেষ্টায় থাকি।

আত্রেয়ী উত্তর দিলে না; চুপ ক'রে রইলো। এ বিষয়ে কোনো ধারণা ওর নেই। বিয়ের কথা ও ভাবতে ভুলে গেছে; আর কোনোদিন মনে হয় না ওর এ সম্বন্ধে কোনো কথা।

সুরবালার জেরা ও জিদে অবশেষে ও একদিন দ্বিরুক্তি না ক'রে রাজী হ'য়ে গিয়েছিলো। অচেনা পথে পথিকের চলবার যে অনিশ্চয়তা, সেই অনিশ্চয়তাই ছিলো ওর ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে।

কে জানে হয়তো এমন কেউ আসতেও পারে, যে এক কথায় ওকে বিয়ে করতে রাজী হ'য়ে যাবে। কিন্তু জীবনকে ও বাঁধতে চায় না। মুক্তির স্বাদ ও পেয়েছে; পেয়েছে বৃহত্তর জীবনের পরিচয়; আত্মার যেখানে বিস্তৃতি, মনের যেখানে পরিব্যাপ্তি। মনে ওর আকাংক্ষার শিখাগুলো জ্বলে

উঠেছে। জড়তার নাগপাশ কাটিয়ে ওর মানস-পাখী মেলে ধরেছে পাখা।

ইতিমধ্যে একদিন অনমিত্রের সংগে ওর দেখা।

—চিঠি লিখে অভিনন্দন জানানোটা সুবিধের মনে হ'লো না। অনমিত্র বললে: কিন্তু আপনি তো আমার ঠিকানা জানতেন।

—জানতাম; দেখা তো হবেই আপনার সংগে। আত্রেয়ী বললে: আর এই হ'লোও তো।

—উত্তম। চললেন কোথায়?

—কাগজে একটা চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, যাচ্ছি একবার খোঁজ নিতে।

—কি চাকরী?

—হাকিমী নয়।

—বলা বাহুল্য। আর সেই জন্যেই জিগ্‌গেস করছি। অনমিত্র সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়াচ্ছিলো।

—মাষ্টারি আর কি! আত্রেয়ী বললে।

—মাইনে কতো?

—পঁয়ত্রিশ। মাইনর স্কুল; একজন আই. এ. পাশ মাষ্টার চায়।

—স্কুলটা কোথায়?

—সারকুলার রোডে।

—কিসে যাচ্ছেন?

—ব্যাসে। আপনিও চলুন না।

—না; কাজ আছে। সিগারেটটা মুখে রেখে অনমিত্র বললে।

—কি কাজ? কথার ঝোঁকে প্রশ্ন ক'রে ফেললে আত্রেয়ী

—আজ দ্বিগুণ বাজী আছে 'দাবা'তে। কাল দু'বার উপর্যুপরি মাৎ হ'য়ে গেছি। আশ্চর্য—

—এই আপনার কাজ? আত্রেয়ীর কণ্ঠে কৌতুক।

—না; মাষ্টারী খোঁজাটাই কাজ। হ্যাঁ, শুনুন, আপনার সংগে আমার একটা জরুরী বিষয়ে আলাপ আছে। কাল একবার দেখা করতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই পারবো। কোথায়?

—হোয়াইট্‌অ্যাওয়েরে সামনে একটার সময় দাঁড়াবেন।

—দাঁড়াবো। আত্রেয়ী বললে এক মিনিট পরে পুঞ্জীভূত গাম্ভীর্য নিয়ে: দিনে না রাত্রে?

কোনো জবাব না দিয়ে অনমিত্র শুধু হাসলে। কয়েক মুহূর্ত পরে বললো: এই আপনার ব্যস এসে পড়েছে।

ব্যস এসে দাঁড়ালো। ফিরে দাঁড়াবার সময় আত্রেয়ী অনমিত্রের মুখের ওপর তাকিয়ে বললে: যেন হেরে যান খেলায়।

—আপনার মাষ্টারীও ওই পর্যন্তই জুটবে। অনমিত্র উত্তর দিলে।

কলেজ সেশ্যন আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

অমরেশ ভর্তি হ'য়েছে বি. এ. ক্লাশে।

—ভর্তি হবেন না আপনি? অমরেশ আত্রেয়ীকে জিগ্‌গেস করলো।

—কোথায়?

—কোথায় আবার? কলেজে। অমরেশ আশ্চর্য হ'য়ে বললে।

নাঃ।

—কেন ?

—মেয়েদের আর অতো প'ড়ে লাভ কি ? সেই তো হাঁড়ি ঠেলা।

—কেন ? সে তো আপনি নাও করতে পারেন। পড়াশোনাটা ছাড়ছেন কেন ? কতো মেয়ে তো আজকাল পড়াশোনা করছে ; নানান কাজকর্ম করছে।

—কিন্তু কাকীমা যে বিয়ের ব্যবস্থা করছেন।

—কোথায় ? ওর প্রশ্নে আহতের সুর।

—কোথায় আবার ? নানা জায়গায় ; কোথাও না কোথাও লেগেই যাবে। কি হবে অনর্থক কেতাব ঘেঁটে ? আর এ তবু জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকবে ; ছন্নছাড়া হ'য়ে থাকতে হবে না।

আঘাত ফিরিয়ে দিতে চাইলে অমরেশ। ও বললে : তাই বলুন, আপনি তো নিজেই বিয়ের জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন দেখছি।

—সত্যিই তো। সব মেয়েরাই চায় জীবনটাকে শৃংখলাবদ্ধ করতে ; শৃংখলবদ্ধ অবশ্য নয়। স্বামী চায়, সংসার চায় তা'রা ; চায় সংসারে তা'দের একটা নিজস্ব আসন। আরো একটা ব্যাপার আছে ; সেটা হ'চ্ছে, আমাদের দেশে অবিবাহিতা মেয়েরা শ্রদ্ধা পায় না ; সম্মান পায় না। তা'রা হয় অসীম কৌতূহলের পাত্রী। লোকে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। বিয়ে না ক'রে উপায় কি বলুন ? যাবো কোথায় বিয়ে না ক'রে ? কতোদিন আর লোকের চোখের কাঁটা হ'য়ে থাকবো।

—এ সব কথা আপনি বিশ্বাস করেন ? অমরেশ বিস্মিত কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে।

—সহস্রবার করি। বিয়ে ছাড়া পুরুষের সমাজে মেয়েদের

গতি নেই, তা'র পরিচয় নেই। স্বামীই তা'র সর্বস্ব আর চিন্তাধারণই তা'র জীবনের সার্থকতা।

অমরেশ অবাক হ'য়ে গেলো। মেয়েদের সংগে ওর আলাপ নেই। তা'দের সম্বন্ধে যেটুকু ওর ধারণা তা'তে ওর মনে হ'য়েছিলো, আধুনিক মেয়েরা খানিকটা স্বাধীন জীবনের পক্ষপাতী। বিয়ের ওপর তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু আত্রেয়ীর কথা শুনে ওর সে ধারণা ভেঙে গেলো।

—সব মেয়ে কিন্তু আপনার মতো নয়। ক্ষীণ কণ্ঠে অমরেশ বললে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ সবাইর মত বোধ হয় আপনার মতো নয়।

—প্রত্যেক মেয়েরই এই মত। দৃঢ় কণ্ঠে আত্রেয়ী বললে : প্রত্যেকেরই এই বিশ্বাস। ক'টা মেয়ে আর খুলে বলে মনের কথা ? কিন্তু তাদের এই চিন্তাধারার জন্যে, তাদের এই সিদ্ধান্তের জন্যে দায়ী তা'রা নয় ; দায়ী সমাজ। প্রত্যেকটি মেয়ের শিক্ষা, চিন্তা এবং সভ্যতার জন্যে দায়ী আমাদের এই আধুনিক সমাজ। নিজেরাই তা'রা জানে না কোথা থেকে কেমন ক'রে তাদের এই অভিমত তৈরী হ'লো। সমাজ একটা যন্ত্র, যে যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ আমাদের সৃষ্টি করবার জন্যে দায়ী। আমাদের ব্যক্তিগত কোনো অস্তিত্ব নেই ; স্বাধীন কোনো চিন্তা রূপ পায় না আমাদের মনে। সমাজের এই শাসনের মধ্যে, তা'র এই জীবন-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আমরা খাপ খেয়ে গেছি। আমাদের প্রত্যেকটি কথা সেই কঠিন যন্ত্রের ভাষা, আমাদের প্রত্যেকটি কাজ সেই যন্ত্রের ইংগিত।

অমরেশ বুঝতে পারলে না আত্রেয়ীর মনস্তত্ব ; পারলে না উপলব্ধি করতে ওর সমস্ত কথার অর্থ। এবং ওর এই না-বোঝাটা বুঝতে পারলে আত্রেয়ী হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

—আপনাদের পড়াশোনা আরম্ভ হ'য়ে গেছে কলেজে' আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—হ্যাঁ; এক মাস তো হ'য়ে গেলো।

—দেখি শেষ অবধি আমার কী হয়। হয়তো ভর্তি হ'য়েও যেতে পারি। লাখ কথার আগে তো আর বিয়ে হবে না।

অমরেশ আনন্দিত হ'লো। বিয়ে সব মেয়েরই হয়; আত্রেয়ীরও হবে। কিন্তু তবু ওর মনে কোথায় যেন খচ্‌খচ্‌ করছিলো। আত্রেয়ী যখন জানালো ও-ও কলেজে ভর্তি হ'তে পারে তখন অনেকখানি আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা নিয়েই অমরেশ নীচে নেমে গেলো।

দুপুরে তপতী কলেজে গেছে।

সাড়ে বারোটার সময়ে আত্রেয়ী সবারি অলক্ষ্যে রাস্তায় নেমে এলো। বাড়ীতে সবাই জানে দুপুরে তা'র কোনো কাজ থাকতে পারে না বাইরে।

আত্রেয়ী যখন হোয়াইট-অ্যাওয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ভেবেছিলো পৌঁছেই অনমিত্রকে দেখবে। না দেখতে পেয়ে একটু হতাশ হ'লো। পরিমিত ফুটপাথটুকুর পরিক্রমা করলে ও অসংখ্যবার। কতো বিভিন্ন সাজসজ্জা, বিচিত্র চলার ভংগী, বৈদ্যুতিক গতি। একটা বেজে গেলো; অনমিত্রের দেখা নেই। বোধ হয় ভুলে গেছে; লোকটা বোধ হয় আসলেই একটু অন্যমনস্ক। কিংবা হয়তো বন্ধুদের সংগে মেতে গেছে কোনো আড্ডায়; অথবা হারিয়ে গেছে কোনো বইয়ের বিশ্লেষণে। একটা দশ। আত্রেয়ী হতাশ হ'য়ে পড়লো। দেড়টা। বিব্রতা আত্রেয়ী নিরুৎসাহের ভংগীতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ ওর

ঘেঁষে প্রকাণ্ড এক 'হাম্বার' থামলো আর সশব্দে দরজা খুলে নেমে এলো অনমিত্র।

—অনেকটা ছোটালাম তোমায়। ষ্টিয়্যারিঙ-হুইলে যে যুবকটি ব'সেছিলো তা'র উদ্দেশ্যে অনমিত্র বললে।

—না; এই তো সামান্য রাস্তা। আচ্ছা; বাই-বাই।

অপরিচিত যুবক গিয়্যারে টান মারলে। গাড়ীটা একটা পাক খেয়ে বেরিয়ে গেলো অনেকটা আমিরী চালে।

অনমিত্র ওর ঝোলানো পকেট থেকে দেশলাই বা'র ক'রে সিগারেট ধরিয়ে নিলে। কোঁকড়ানো ধোঁয়ার অজস্রতায় স্পষ্ট দেখা গেলো না ওর কপালের মধ্যস্থ নীলাভ শিরা দু'টো।

—প্রথম প্রস্তাব, চলুন একটা রেস্তোরাঁয় ঢোকা যাক। চা মন্দ লাগবে না এখন। আর দ্বিতীয়তঃ, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার আছে।

—কেন? কি করেছেন?

—ভীষণ অপরাধ। অনমিত্র ভংগী ক'রে বললে।

—বলুন না কি?

—আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি অনেকক্ষণ।

—ও, তাই বলুন। আত্রেয়ী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো।

—অতএব ক্ষমা-ভিক্ষা।

—আচ্ছা, মার্জনা।

ওদের হাসি বিদ্যুতের মতো ছিট্‌কে পড়তে লাগলো পথচারীদের কাণে।

প্রায় দু'টো বেজেছে এমন সময়ে ওরা একটা রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলে।

চা এবং সামান্য কিছু খাবার অর্ডার দেয়া হ'লো। হঠাৎ

অনমিত্র ব'লে উঠলো : কফি খাবেন ? হ্যাঁ, কফিই ভালো হবে। বয় ! চা নেহি ; দোঠো কফি লে আও।

বয় নিস্ক্রান্ত হ'লো।

—ও ভদ্রলোক কে ? যিনি গাড়ী চালাচ্ছিলেন ? আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—বন্ধু। এক মিনিট পরে : ওকে বললাম—

কথা অসম্পূর্ণ রেখেই অনমিত্র থেমে গেলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে বললে : আচ্ছা, কফি আনতে এতো দেরী হ'চ্ছে কেন বলুন তো ?

—হোক্ না। মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে আত্রেয়ী উত্তর দিলে : হুঁ, ওঁকে কি বললেন ?

—কা'কে ? অনমিত্র যেন চোখের সামনে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌-কোর ভূমিকম্প দেখছে।

—আপনার বন্ধুকে ? আত্রেয়ীর ঠোঁটে হাসির বিদ্যুৎ।

—বন্ধুকে ? ও হ্যাঁ, বললাম, তোমার গাড়ীটা বেশ হে। অনমিত্র হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে দিলে।

আত্রেয়ীর চোখে কৌতুকের ছটা।

—চ'ড়ে আরাম আছে। অনমিত্র থামলো।

—আপনার বন্ধু কি বললেন ?

—বন্ধু বললে, অনমিত্র আর একটা সিগারেট মুখে লাগিয়ে রেখে শুরু করলো : কি আর এমন ভালো গাড়ী ? বড্ডো তেল খরচ হয়।

—ও ! তারপর আপনি কি বললেন ?

আত্রেয়ীর চিবুকে যে ক'টি রেখা হাসবার সময়ে ফুটে ওঠে তা' অনমিত্রের পরিচিত।

—আমি বললাম, অনমিত্র উত্তর দিলে : বড়ো গাড়ী

চড়বার যেমন আরাম, সেটা ব্যালেন্স্‌ড্‌ হ'য়ে যায় তেলের দামে।

—বেশ; আপনার বন্ধু কি উত্তর দিলেন?

—ও বললে, গাড়ীটা বেচে দেবো হে। একখানা 'টাল্‌বোট্‌' কিনবো। চমৎকার গাড়ী; ভারী স্মার্ট চেহারা।

—আপনি কি বললেন? আত্রেয়ী এবার রীতিমতো হাসছিলো।

—তারপর আর আমি কি বলতে পারি বলুন? ও নিজের গাড়ী বেচে দেবে বলছে; পছন্দ-মতো আরেকটা কিনবে বলছে, তা'তে আমার বলবার কী আছে?

—না···এমনি···মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম, পাছে আবার ভুলে যান। আত্রেয়ী মাঝে মাঝে মৃদু কণ্ঠে হেসে উঠছিলো।

ইতিমধ্যে এলো কফি আর কেক্‌।

—বাঃ···হাসবার কি হ'য়েছে? অনমিত্র জিগ্‌গেস করলো পরাজিত কণ্ঠে।

—বা রে! হাসি পেলে হাসবো না?

অনমিত্র খাপছাড়া প্রশ্ন ক'রে বসলো: আচ্ছা, হাসলে আপনাকে কেমন দেখায় জানেন?

—জানি। আত্রেয়ীর সুরে একটা সহজ সিদ্ধান্ত।

অনমিত্রের কপালে কয়েকটা সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠলো।

—কেমন? আত্রেয়ীই জিগ্‌গেস করলে।

—সুন্দর। কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগলো, না? সহজ অনমিত্র বললে: নিন্‌, খান; এবার ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো।

অনমিত্র ওর দিকে এগিয়ে দিলে কফির পেয়ালা।

একটা চুমুক দিয়ে অকম্প্র কণ্ঠে আত্রেয়ী বললে: আপনি মেয়েদের মতো ভীরু।

—আর আপনি পুরুষদের মতো সাহসী। অন্য কাউকে এ-কথা বললে কী হ'তো জানেন ?

—কি ? শ্বেতকণ্ঠে আত্রেয়ী উচ্চারণ করলে।

—আপনার সংগে কথা বলতো না ; আর যদি পুরুষ হ'তেন তাহ'লে ডুয়েল্ লড়তো। যাক্, নিন্ কেক্ খান।

—না, আপনি খান। আমার এখনো ভালো ক'রে ক্ষিধে পায় নি।

—সেই জন্যেই তো হাল্কা খাদ্যের ব্যবস্থা। নিন্ শুরু করুন।

আত্রেয়ী একখানা কেক্ তুলে নিলে।

—আপনি কি এ সময়ে খান ? না, আমার জন্যেই সৌজন্য আর অর্থব্যয় ?

—বা রে ! খাচ্ছি না তো কি করছি ব'লে আপনার মনে হ'চ্ছে ?

—না…হয়তো আপনার দরকার নেই ; শুধু আমার জন্যেই—

—পুরুষদের কখনো মনে করিয়ে দেবেন না তা'রা মেয়েদের জন্যে কিছু করছে, তাহ'লে তা'রা সংগতি হারাবে। না ; এ সময়ে চা কিম্বা কফি না হয় সোডা অথবা সরবৎ একটা কিছু খাওয়া অভ্যাস ক'রে ফেলেছি।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

—অনমিত্রবাবু ! তখন কি বলছিলেন আপনি ?

'তখন'-এর তাৎপর্য বুঝলে না অনমিত্র ; প্রশ্নও কিছু করলো না। সরাসরি ব'লে চললো : বলছিলাম, বন্ধু, জল্‌দি পৌঁছে দাও ; আর এক বন্ধু পথে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

আত্রেয়ী হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলে না। এক

মিনিটের জন্যে তুলে উঠলো ওর সমস্ত অন্তর। মাথা নীচু ক'রে ভারী গলায় ও শুধু ডাকলে: অনমিত্রবাবু।

ওর কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলো অনমিত্রের।

—আপনি কি সত্যি সত্যিই তাই মনে করেন? আর্দ্র আত্রেয়ীর স্বর।

—কি? আত্রেয়ীর মুখের ওপর প্রসারিত অনমিত্রের দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা প্রগাঢ় হ'য়ে উঠলো।

—যা বললেন এই মাত্র।

অনমিত্র বার কয়েক চামচটা ঠুকলো খালি পেয়ালার ওপর। তারপর বললে: ও—বাঃ, নিশ্চয়ই।

—কিন্তু জানেন? আমি আপনার সমকক্ষ হবার অনুপযুক্ত।

—তাই বলুন। এক পেয়ালা কফিতে আপনার পোষালো না।

বিস্মিত আত্রেয়ী প্রশ্ন করলো: মানে?

—মানে, দুর্বল হার্ট; ক্যাফেইনএ ভালো কাজ হবে। অনমিত্র ডাক দিলে: বয়! দোঠো কফি।

তথাপি আত্রেয়ীর গলার সে সুর হারালো না। তেমনি মৃদু কণ্ঠে ও জের টেনে বললে: আমি ভয়ানক নিঃস্ব; অত্যন্ত—

—শুধু দয়া; আপনি চুপ করুন দয়া ক'রে। চোখ দু'টো বিস্ফারিত ক'রে অনমিত্র বললে।

—না; আমায় বলতে দিন। কঠিন কণ্ঠে বললে আত্রেয়ী: আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন তা' আমি ভুলবো না কখনো। কিন্তু সব সময়েই আমার মনে হ'য়েছে, আমি আপনার অনুগ্রহের উপযুক্ত নই। কেন জানি না; এ-ই আমার মনে হয়। কেন আপনি আমার জন্যে এতোখানি করলেন তা' আমি ভাবি; আমি—

বাধা দিয়ে অনমিত্র বললে: কেন জানেন?

—কেন ?

আত্রেয়ীর দুই চোখে যে একাগ্রতা ফুটে উঠলো, কোনো মেয়ের চোখে তা' অনমিত্র দেখে নি কোনোদিন।

—ভয়ানক একটা দুরভিসন্ধি ছিলো আমার।

ওর গলায় পরিহাসের সুর আত্রেয়ীর কাণ এড়ালো না। আত্রেয়ী সশব্দে হেসে ফেললো।

—যাক্। দেখেছেন ? ঘেমে গেছি। অনমিত্র পকেট থেকে রুমাল বা'র করলে।

—কেন ?

—বাপ্; যে দৃশ্যের অবতারণা ক'রেছিলেন। আর একটু হ'লে আমিও করুণ হ'য়ে উঠছিলাম।

—আপনি বড্ডো লাইট্। আত্রেয়ী অভিযোগ করলে।

—অর্থাৎ লঘু; কিনা হাল্কা; মানে খেলো; দাঁড়ালো অপদার্থ। অতএব এক নম্বরের—

—আঃ, থামুন।

—থামলাম।

কফি এলো।

—চুমুক দিন; তাজা হ'য়ে উঠবেন। অনমিত্র বললে।

—আচ্ছা, আপনি কি ছেলেবেলায় খুব্ দৌড়ঝাঁপ করতেন ?

—কেন ?

—আপনার সমস্ত শরীরে একটা দৌড়ঝাঁপের ইংগিত রয়েছে; অর্থাৎ দেখলেই একটা স্পীডের কথা মনে পড়ে।

—ঠাট্টা করছেন না কি মোটা ব'লে ?

—মোটা আর ম্যাস্‌কুল্যারের পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে অনমিত্র। ও বললে : ক'টা বাজলো দেখুন তো ?

—ক'টা আর ? দু'টো হবে। আত্রেয়ী উত্তর দিলে।

হাসির একটা তরংগ স্পন্দিত হ'লো চারিদিকে। অনমিত্র বললে : এখনো দু'টো ?

—আরো বেশী বলছেন ? না না ; বেশী হবে কেন ? এই তো ঢুকলাম এখানে।

অনমিত্র কোটের পকেট থেকে সোনার ঘড়িটা বা'র করলো ; বললে : তিনটে বেজে গেছে।

ওদের খাওয়া শেষ হ'লো।

—এবারে উঠতে হ'লো। এতোক্ষণ কোথায় কাটালাম হয়তো তা'র জবাবদিহি করতে হবে। কলেজ যে নেই বাড়ীর সবাই জানে।

—কিন্তু জবাবদিহি কেন ?

—কুমারী মেয়েদের বাইরে থাকতে নেই। স্পষ্ট ক'রে বললে আত্রেয়ী।

—বলবেন, কলেজে এসেছিলেন।

—বিশ্বাস করবে কেন ?

—করবে না কেন ? অনমিত্র বললে : আপনি ছিলেন যে কলেজে।

—হুঁ, কী করছিলাম ?

—কেন ? অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনছিলেন।

—এখনো ভর্তি হই নি, এ-কথা ওরা জানে না নাকি ভেবেছেন ?

—আপনি যে ভর্তি হ'য়েছেন, এ-কথাই ওরা জানে না।

আত্রেয়ী অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো অনমিত্রের মুখের দিকে। কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতার পর জিগ্‌গেস করলে : মানে ?

—যা' বলছি তা'র তো অন্য কোনো মানে হয় না। সংগে সংগে চমকে উঠে বললে অনমিত্র: ওঃ ও, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আপনিও জানেন না। নিন, ধরুন। পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র বা'র ক'রে ও বললে: এই আপনার বিল্-বুক; ওতে আপনার রসিদ আছে। ভর্তি হবার কী কী সব লাগে আর ছ' মাসের মাইনে অগ্রিম দেয়া হ'য়ে গেছে। আর এই বইএর লিষ্ট। কী স্যবজেক্ট নেবেন ঠিক ক'রে ফেলুন; কাল থেকেই লেগে যান।

আত্রেয়ী এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেচে যেখানে আনন্দ বেদনা বা বিস্ময় সবেরই সমন্বয় রয়েছে কিন্তু চেতনা অস্পষ্ট। যেখানে বলার অনেক কিছু থাকলেও বলবার শক্তি যায় হারিয়ে; কোনো কিছু করণীয়ের আবেদন বুকের মধ্যে অনুরণন তুললেও অচল যন্ত্রের মতো সে নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে থাকে।

সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে অনমিত্র বললে: উঠুন, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। আপনার জবাবদিহির খসড়া আবার অনেক বড়ো হ'য়ে যাবে।

—শুনুন।

আত্রেয়ীর গলার শব্দে অনমিত্র প্রায় চমকে উঠেছিলো।

—আপনি কেন এসব করলেন? আমার পড়ারও তো কিছু ঠিক নেই!

—কেন? সহজ স্বরেই প্রশ্ন করলে অনমিত্র।

—বিয়ের কথাবার্তা হ'চ্ছে। মাথা নীচু ক'রে আত্রেয়ী বললে।

—হোক না। তা'র সংগে পড়ার সম্বন্ধ কি? না কি বিয়ের কথাতেই আপনার পড়াশোনার ডিস্‌ট্যার্‌বেন্স্ হবার ভয় আছে?

—শুনুন; অনমিত্রবাবু এ ঠাট্টার সময় নয়। বাড়ীতে যদি সত্যিই কোথাও স্থির ক'রে ফেলে—

—হয়তো কোনো জায়গায় আপনার বিয়ে হ'য়ে যাবে। এই তো? তা' আমিই কি বলছি যে আপনার বিয়ে হ'তে পারে না? কিন্তু সে জন্যে আপনার পড়া আট্‌কাচ্ছে কোথায়? আশ্চর্য—

—কিন্তু কেন আপনি এতোগুলো টাকা অকারণে···

—আচ্ছা, টাকা কার? আমার তো? হ্যাঁ! সুতরাং তা' নিয়ে আমি যাই করি না আপনার মাথা ব্যথা কেন বলুন দেখি?

—কিন্তু খরচ হ'চ্ছে যে আমারি জন্যে!

আকস্মিক প্রশ্ন ক'রে বসলো অনমিত্র : আচ্ছা, আপনার বয়েস কতো?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে শিহরিত হ'য়ে বিস্ময় মেশানো দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আত্রেয়ী অনমিত্রের মুখের ওপর। স্তিমিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে : কেন?

—মনটা আপনার বিগত শতাব্দীর, মানে গোঁড়া সঞ্চয়শীল। তাই জিগ্‌গেস করছিলাম। এ যুগ কিন্তু বলে, অধিকন্তুতে অপরের প্রয়োজনের দাবীই অগ্রগণ্য।

তেমনি নিষ্প্রাণ কণ্ঠে আত্রেয়ী শুধু বললে : ও।

—হ্যাঁ, Transfer of social significance from wealth to service, মানুষের সমাজে এই হ'লো কল্যাণের পথ। কলংকময় যুদ্ধ-যুগের পর আদর্শ মানুষ-সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে সর্বাগ্রে বলতে হয় Men will then prefer to be known for what they do, rather than for what they possess.

—অনমিত্র বাবু! শান্ত কণ্ঠে আত্রেয়ী শুধু ডাকলে। সমাহিত ওর মূর্তি। বক্তব্য শেষও করতে পারলে না।

—অতো গম্ভীর হ'য়ে ডাকবেন না। হেসে অনমিত্র বললে : মনে হ'লো যেন আমার বিচারের জন্যে Summon করছেন।

আভা ভরা চোখ অনমিত্রের মুখের ওপর প্রসারিত ক'রে আত্রেয়ী বললে : আপনাকে অনেক সময়ে বুঝতে পারি না। সত্যিই মনে হয় আপনি মিষ্টিক্।

—কি আশ্চর্য! হাল্কা ভংগীতে অনমিত্র বললে : এই সামান্য কথাটুকুও আমি বোঝাতে পারলাম না আপনাকে ? মিষ্টিক্ না বলে' মূর্খ বলুন তাহ'লে।

অনমিত্র হাসলে।

নিস্পন্দ আত্রেয়ী ব'সে রয়েছে। বক্তব্যের বারুদ বিস্ফোরিত হ'লে ও তৃপ্তি পেতো। আলোর মতো অশ্রু ঝ'রে পড়তো ওর দু'চোখ বেয়ে। স্ফুলিংগের মতো বেরুতো অজস্র বক্তব্য। নিঃশেষিত হ'তো সমস্ত উত্তাপ। অবশেষে আত্রেয়ী নিরুদ্বিগ্ন, নিরুত্তাপ, নিশ্চিন্ত হ'তে পারতো। কিন্তু আত্রেয়ী ব'সেই রইলো নির্বাক, নিষ্ক্রিয়।

—নিন্, আরেকটা চেষ্টা করছি নিজেকে, স্পষ্টতর করবার। To be আর To have—সত্য দু'টোই। কিন্তু আমি বিশ্বাসী To beর ওপর। শুধু আমিই নয়, আগামী যুগ। Having অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে মানুষকে চেনবার, বুঝবার বা বিচার-করবার যুগ নিঃশেষিতপ্রায়। কারণ Having ধোপে টিঁকলো না। Having মৃত্যুশীল। Having এই আছে, পরমুহূর্তে হয়তো থাকবে না। কিন্তু Beingএর মৃত্যু নেই। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো। আমি মৃত্যুহীন ; আত্মা অনির্বান। আগামী যুগকে প্রণাম জানিয়ে তাই মানুষকে ও সমাজকে To beর ভক্ত হ'তে হবে। যা' আছে তা'কে বিলিয়ে দিয়ে, কী

করলেন আর সেই কর্ম দ্বারা কী হ'লেন—এইটাই বিচার করতে শিখবেন। বিচার করবেন নিজের জীবনকে আর অপ-রেরও। যুগের সংকেত এই ; মানবতার ইংগিত। এড়াতে পারেন না ; এড়ানো উচিত নয়। আর আমিও তো এর বেশী কিছু করিনি।

অনমিত্র থামলো। ওকে মনে হ'লো আকাশের মতো মহান, অন্ধকারের মতো গভীর, হিমাচ্ছন্ন গিরি-শিখরের মতো প্রশান্ত।

আত্রেয়ী বিস্মিত হ'লো ; হ'লো মুগ্ধ। আর একবার তাকালে ও অনমিত্রের মুখের ওপর। কিন্তু এ দেখার দৃষ্টি নয়। এ দৃষ্টি প্রণামের রূপান্তর।

অবসর।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অনমিত্র বললে : তা' ছাড়াও—

ও থেমে গেলো।

—কি ? প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী।

পরিবেশকে হাল্কা করতে চাইলে অনমিত্র। বললে : আর যদি নেহাৎ আপনার বিয়ে হ'য়েই যায়, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্ষণিক থেমে : তাহ'লে আমি কেন কারুর জন্যে লোকসান দিতে যাবো ? কি বলেন ?

—সেই কথাই তো ! সাগ্রহ কণ্ঠে বললে আত্রেয়ী।

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলাম। তা' দেখুন—

আত্রেয়ী মুখ তু'লে তাকালে। সমাধানের অনুসন্ধিৎসা ওর দৃষ্টিতে।

—লোকসান দেয়ার অধিকার যিনি পাবেন আপনার জন্যে, ভংগী-ক'রে অনমিত্র বললে : না হয় সেই ভদ্রলোকের কাছ

থেকে টাকা ক'টা ব'লে ক'য়ে নিয়ে আসা যাবে! ও সশব্দে হেসে উঠলো।

আত্রেয়ী মাথাটা নামিয়ে নিলে।

কয়েক মিনিটের ক্লান্তিকর নিস্তব্ধতা।

আত্রেয়ী খানিকটা আকস্মিক ভাবেই কাগজপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে: চলুন যাই।

—চলুন। অনমিত্রও উঠে দাঁড়ালো।

বারো

আরো কয়েক মাস কেটে গেলো।

আত্রেয়ী আবার পড়াশোনা আরম্ভ করেছে। তপতীর টেষ্ট্ পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেছে। আজকাল বাড়ীতে ব'সে ও পরীক্ষার পড়া তৈরী করে।

সপ্তাহে একদিন তপতীর সংগে দেখা হয় শ্যামলের। ছয় দিন প্রতীক্ষিত শুক্রবার। শ্যামল দুপুর সাড়ে বারোটায় মোটর নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রাম-লাইনের ধারে অপেক্ষা করে। তপতী ট্রাম থেকে নেমে বার কয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা মোটরে গিয়ে ওঠে।

পরীক্ষার চিন্তা আর পড়াশোনার ভিড়ের মধ্যেও এই দিনটির জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে তপতী। তারপর যায় নানা জায়গায়; যেখানে ওদের খুসী। যেখানে লোকের ভীড় কম; চেনা-শোনা কারও সংগে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এমনিই অজস্র দিনের একটি ঃ

গাড়ী চলছিলো গ্র্যাণ্ড ট্র্যাংক্ রোড দিয়ে দ্রুত বেগে। এই রাস্তাটাই সব চাইতে নির্জন। কোনো ভাঙা বাড়ীর ধারে, জংগলের আড়ালে বা গংগার নির্জন তীরে, গাড়ীর মধ্যে বা গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে সুবিধে মতো কোনো একটা জায়গায় ব'সে ওরা গল্প করে।

—তুমি আমায় বিয়ে করবে তো? তপতী বললে।

—এ-কথা কেন তপতী? শ্যামল ওর আশ্চর্য সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে: তুমি আমায় অবিশ্বাস করো?

—না না। কিন্তু ভারী ভয় করে আমার মাঝে মাঝে;

মনের মধ্যেটা হু হু ক'রে ওঠে। দিদি বলে, অনেক সুখের পর মানুষের জীবনে আসে দুঃখ। হয়তো আমারো জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে দুঃখ। তা' আসুক; আমার একমাত্র সান্ত্বনা, আমার সে দুঃখের দিনে তোমাকে পাবো আমার পাশে; তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে না। যদি একজন সাথী পাওয়া যায় তাহ'লে দুঃখের আঘাত সহ্য করবার শক্তি অনেক বেড়ে যায়।

—অন্য কথা বলো তপতী। শ্যামল ওকে আরো ঘনিষ্ঠ ক'রে নিয়ে বললে: বলো লেখাপড়া কেমন হ'চ্ছে আজকাল?

—ভালো।

শ্যামল আর কথা খুঁজে পায় না। ওর দেহে এবং মনে ঘনিয়ে আসে একটা অবসাদ, খানিকটা ক্লান্তি।

—শোনো, আর কতোদিন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবো? তপতী অসহায়ের সুরে বললে: এমন লুকোচুরি আর ভালো লাগে না। এতে যেন মন কলুষিত হ'য়ে যায়; নিজেকে মনে হয় যেন অপরাধী। আর তা' ছাড়া গোপন ক'রে রাখবার কীই বা আছে? কীই বা আমরা করেছি যা'র জন্যে সকলের কাছে আমরা নিজেদের ছোটো ক'রে রাখবো? সকলের চাইতে আমাদের পার্থক্য কোথায়? বরং আমাদের জীবনে যে একটা ঝড় এসেছে, এসেছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন, তা'রি পরিচয় সকলকে দেয়া উচিৎ।

—কে তোমাকে বললে এতো সব কথা? বিস্ময়ের সংগে বিড়ম্বনারও আভাস ছিলো শ্যামলের কণ্ঠস্বরে।

—কে আবার বলবে? এসব কথা কারো বলবার অপেক্ষা রাখতে হয় না। অতি সাধারণ কথা। যেটা জানি অন্যায় নয়, তা'র জন্যে কেন এতো গ্লানি? কেন এতো লাঞ্ছনা? আমি আজই দিদিকে বলবো সব কথা।

সর্বনাশ। মনে মনে আঁৎকে উঠলো শ্যামল। মুখে বললে: তুমি কি পাগল হ'য়েছো? তোমার সেই দিদির কাছে, এই সব কথা……ছি ছি……তোমার লজ্জা করবে না?

—আশ্চর্য; লজ্জা কিসের? ভালোবাসতেও লজ্জা করবো? তাহ'লে জন্মগ্রহণ করেছি এর জন্যেও লজ্জিত হওয়া উচিৎ!

—না না; তা' আমি বলছি না। সামলে নিতে চাইলে শ্যামল: বলবে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু গোড়া থেকেই একটা হৈ চৈ বাধিয়ে লাভ কি? জানবে তো একদিন সবাই।

—যা' চুপ ক'রে শোনবার, তা' নিয়ে লোকে যদি অনর্থক একটা হৈ চৈ করে তো আমরা তা'র কি করতে পারি?

—তুমি বুঝছো না তপতী। মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠছে শ্যামল। তা' অপ্রকাশ রেখেই ও বললে: গোলমাল যে একটা হবে, এ তুমিও জানো। একেবারে সব ঠিকঠাক ক'রে তারপর ধীরে-সুস্থে সব বলা যাবে। এতো অস্থির হবার কি আছে?

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে সবাই রাজী হবেন তো? তপতীর কণ্ঠে ফুটে উঠলো গভীর একটা উৎকণ্ঠা।

—রাজী করাতে হবে সবাইকে। না হ'লে চলবে কেন? তাই তো বলছি, সব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। গোড়া থেকেই একটা হাংগামা বাধিয়ে তো লাভ নেই।

—কিন্তু এমন ক'রে আর কতোদিন পারা যায় বলো না? লেখা পড়ায়ও কিছুতেই মন বসছে না; অথচ পরীক্ষার আর দু'মাসের বেশী তো নেই।

—কী আর করা যাবে বলো? দেখি ভেবে, কী করলে সব ঠিক হয়।

দু'জনেই খানিকক্ষণ নীরব রইলো।

শ্যামল প্রথম কথা বললে, বললে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ক'রে : কাল দুপুরে একবার আমাদের বাড়ী আসবে? আজ পর্যন্ত এক দিনও তো গেলে না।

আনন্দ আর দ্বিধায় দুলে উঠে তপতী প্রশ্ন ক'রে বসলো : কী বলবেন সবাই আমাকে দেখলে? তুমি কি বলবে তাঁদের?

নিশ্চিন্ত চিত্তে উত্তর দিলে শ্যামল : কাল কেউ থাকবে না বাড়ীতে। পিসিমার শ্রাদ্ধে বাড়ীশুদ্ধ সব সেখানে যাবে।

আনন্দে ঝল্‌সে উঠে তপতী বললে : যাবো। কিন্তু...... যদি কেউ এসে পড়েন?

—আসবে না। আর এলেই বা; তুমি যা' বলছিলে তাই হবে। ডাইভ্‌-বম্ব্যারের মতো নিশ্চিত আঘাত দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলবো সব বাধা আর বন্ধন। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে সব ব'লে ফেলা যাবে।

—সত্যিই খুব ভালো হয় তাহ'লে। খুব সহজেই একটা কিনারা হ'য়ে যাবে। তপতী রীতিমতো উৎসাহিত হ'য়ে বললে : কিন্তু এখন চলো; দিদি আসার আগে বাড়ী পৌঁছানো চাই।

তারপর গাড়ীতে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাংক্ রোডে পথচারীদের ভীড় অপস্রয়মান।

—কিছু দেখতে পাচ্ছি না। রুদ্ধ নিশ্বাসে শ্যামল বললে : তোমার চুলে আমার দৃষ্টি ঢেকে যাচ্ছে।

—আমি কি করবো? ছেড়ে দাও না। তপতী বললে।

স্পীডের কাঁটা পঞ্চাশের কাছাকাছি।

—য়্যাক্‌সিডেন্ট্ করবে। ব্যগ্র তপতী বললে।

—হোক একটা।

পরদিন বিশেষভাবে সজ্জিত হ'য়ে তপতী যখন শ্যামলের গাড়ীতে গিয়ে উঠলো তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটা।

—এতো দেরী করলে? শ্যামল গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বললে: আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি আর এলে না আজ।

—বা রে! আসবো না কেন? শ্যামলের সংগে ঘন হ'য়ে ব'সে তপতী বললে: ঠিক সময়েই তো এসেছি।

—এতো সাজ যে? আজ তোমায় কি রকম দেখাচ্ছে তা'র খবর রাখো?

—কি রকম?

—হেলেন বোধ হয় এতো সুন্দরী ছিলো না। আজ বুঝতে পারছি ট্রয় নগরী কেন ধ্বংস হ'য়েছিলো।

তপতী শ্যামলের কাঁধের ওপর দিয়ে হাতখানা প্রসারিত ক'রে রাখলে।

গাড়ী কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্যামলদের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় এসে থামলো।

শ্যামল নেমে দাঁড়িয়ে তপতীকে স্বাগত জানালে: এসো।

ওর হাতে ভর দিয়ে তপতী নেমে পড়লো।

নীচে কয়েকটা চাকর তাস খেলছিলো। শ্যামল এবং তা'র সংগিনীকে দেখে ওরা সচকিত হ'য়ে উঠলো।

সিঁড়ি ব'য়ে দু'জনে ওপরে উঠছে। বাড়ীর আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম দেখে তপতী অবাক হ'য়ে গেলো। ও জানতো শ্যামল বড়োলোকের ছেলে; কিন্তু স্বচক্ষে এ-সব না দেখলে তা'র সত্যতা উপলব্ধি করতে পারতো না।

দোতলায় উঠে শ্যামল বললে: চলো ওদিকে। ওটা আমাদের লাইব্রেরী; দেখবে চলো।

লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকলো ওরা দু'জনে। চারিদিকে মূল্যবান বুক-কেইসে সারি সারি বই। ঝক্ ঝক্ করছে; এক বিন্দু ধূলো নেই কোথাও।

শ্যামল ওকে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়ে, এটা সেটা দেখিয়ে বললে : চলো এবার তিনতলায়, আমার ঘরে।

—চলো।

শ্যামলের শোবার ঘর এটা ; রীতিমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সোনালী সিল্কের বেড্-কভ্যরে বিছানাটা ঢাকা। এক পাশে ড্রেসিং-টেব্ল্ ; তা'র ওপরে নানা রকম প্রসাধন-সামগ্রী। কোণের দিকে রয়েছে একটা বেড্-রূম-ঈজি। পাশের ছোটো টেব্ল্টার ওপর বিলাতি একটা য়্যাশ্-ট্রে, নতজানু এক নগ্ন নারী-মূর্তির কোলে গোলাকার পাত্র। ওপাশে একটা নীচু বুক্-কেইসের মধ্যে কয়েকখানা ইংরাজি বাঙলা বই ; টপের ওপর ফুলভরা একটি ফুলদানির পাশে বড়ো রূপালি ষ্ট্যাণ্ডে নিজেরি একখানা ফটো।

কলকাতা শহরে যে এরকম একখানা বাড়ী আছে, আর সে-বাড়ীতে যে এমন সুন্দর নির্জন একখানা ঘর আছে, এ তথ্য আবিষ্কারের পর তপতী আনন্দে রীতিমতো ছলছলিয়ে উঠলো। ঘরখানা দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে খোলা। শ্যামল ঘরে ঢুকেই সমস্ত জানলার কাঁচের শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে দিলে। শীতকাল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। ঘরটা তবু গরম হ'য়ে উঠলো। শ্যামল কোট্টা খুলে টাঙিয়ে রাখলে।

—বোসো ; বাঃ, দাঁড়িয়ে কেন ? শ্যামল বললে।

—কোথায় বসবো ? হেসে প্রশ্ন করলে তপতী।

—সমস্ত ঘরে বসবার জায়গা পাচ্ছো না ? আচ্ছা দাঁড়াও।

শ্যামল এগিয়ে এসে ওর হাতে একটা টান মেরে নিজে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। সামলাতে না পেরে প্রায় ওর দেহের ওপরেই ঘুরে পড়লো তপতী। দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠলো। তখনি অভাবিত ভংগীতে সটান উঠে দাঁড়ালো শ্যামল। লালসার আতুরতা ওর অভিব্যক্তিতে।

—দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবো ? বর্বর পুরুষ জিগ্‌গেস করলে।

—দাও না। অবিচলিত উত্তর দিলে কামনাদৃপ্তা নারী।

বাইরে ঘনিয়ে এসেছে অপরাহ্নের ছায়া। শীতের বিকেল। পশ্চিমাকাশে সূর্যের শেষ রশ্মির লোহিতাভা।

এতে সাংঘাতিক কোনো পরিবর্তনই হয় নি—এই একই কথা বোঝাতে বোঝাতে ক্রমে ক্লান্তির পর বিরক্তি বোধ করছিলো শ্যামল। সুতরাং ঈজিচেয়ারটায় প'ড়ে প'ড়ে ও সিগারেট টানতে লাগলো।

তপতী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলো একা। দেহে ওর সেই ঝলসানো তলোয়ারের দীপ্তি নেই ; নেই চরণে কোনো ছন্দ। ও নেমে আসচে। দু' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওর অজস্র চোখের জল। ও কাঁদচে ; অশ্রান্ত ক্রন্দন। পায়ের নীচে সিঁড়ির ধাপগুলো ওর বারবার ঝাপসা হ'য়ে আসচে।

শ্যামলদের বাড়ী থেকে তপতী পথে নামবার আগে গুছিয়ে নিলে অবিন্যস্ত শাড়ীর প্রান্ত আর স্খলিত কবরী।

তপতী যখন বাড়ী ফিরলো তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। আত্রেয়ী কলেজ থেকে ফিরে ওরি জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

—কি রে ? কোথায় গিয়েছিলি ? ওকি ? তোর চেহারা অমন হ'য়েছে কেন ?

—কি হ'য়েছে ? শংকান্বিতা তপতী স্তিমিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—কী হ'য়েছে তু-ই জানিস।

—ও, হ্যাঁ। সাম্‌লে নেয়ার চেষ্টা করলে তপতী : পড়তে পড়তে হঠাৎ মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠলো। ভাবলুম, খানিকটা বেড়িয়ে এলেই সেরে যাবে। কিছু দূর হাঁটবার পর

কী যে হ'লো আর চলতে পারলুম না। উঃ···মাথাটা এখনো ঘুরছে।

আত্রেয়ী ওর কপাল স্পর্শ ক'রে বললে: শুয়ে পড়; গা তো রীতিমতো গরম দেখছি। পরীক্ষার সময় আবার একটা কিছু না হয়। আয়।

আত্রেয়ী পরম যত্নে শুইয়ে দিলে ওকে।

পরীক্ষার পূর্বে কিছু আর হ'লো না। তপতী সুস্থ হ'য়ে উঠলো। আত্রেয়ী হ'লো নিশ্চিন্ত। কয়েকটা দিন কেটে গেলো। পুস্তক-সমুদ্রে তলিয়ে যেতে চাইলে তপতী। পরীক্ষার আর মোটেও দেরী নেই।

সেদিন নিস্তব্ধ দুপুর। আত্রেয়ী গেছে কলেজে।

তপতী গায়ে জড়িয়ে নিলে একখানা গরম চাদর; এলো রাস্তায়; একটা ট্রামে উঠে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে ওকে দেখা গেলো শ্যামলদের বাড়ীর কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল-গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছে। দেখা গেলো ওর চোখে মুখে একটা শংকিত ভাব; ভীরু হরিণীর মতো ওর পদক্ষেপ; দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সমস্ত দেহে একটা চাঞ্চল্য, ক্ষিপ্ত এলোমেলো বাতাসের মতো।

অপেক্ষা ক'রে ক'রে ও শ্রান্ত হ'য়ে পড়লো; স্তিমিত হ'য়ে এলো চোখের দৃষ্টি। ও এগিয়ে গেলো বাড়ীটার দিকে; গাড়ী-বারান্দার নীচে দিয়ে গিয়ে একজন চাকরকে ডাকলে। বললে, শ্যামলকে ডেকে দিতে।

পুঞ্জীভূত আশা ও আশংকা নিয়ে ও অপেক্ষা করতে লাগলো। জনবিরল পথ; লোক চলাচল কম; কেউ ওকে তেমন লক্ষ্য করলো না।

অবশেষে শ্যামল এলো। তপতী ছুটে গিয়ে ওর হাত দু'টো

তুলে নিলে নিজের হাতে ; ব্যাকুল কণ্ঠে বললেঃ তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো ? কম্পিত ওর স্বর।

—না, ভুলবো কেন ? কিন্তু কি হয়েছে তোমার ? শরীর এতো খারাপ হ'য়ে গেছে কেন ? এমন ভাবে এসে পড়েছো, বাড়ীর কেউ দেখতে পেলে কি মুস্কিল হ'তো ভেবে দেখেছো ? চলো এগিয়ে যাই। রাস্তাটা মোড় ঘুরলেই একটা পার্ক আছে। বসা যাবে সেখানে। নিজের হাত মুক্ত ক'রে নিয়ে শ্যামল পুনরায় বলতে শুরু করলোঃ আমার কিন্তু একটা ভীষণ জরুরী কাজ আছে ; বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। তোমারো তো পড়াশোনা আছে। হ্যাঁ, কেমন তৈরী হ'লো তোমার ? পাশ করবে তো ?

—করবো। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া শেষ পর্যন্ত হ'য়ে উঠবে কি না জানি না।

ওরা দু'জনে পাশাপাশি পথ চলছে।

তপতীর অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে শ্যামল বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেঃ কেন ?

—চলো। তপতী শুধু বললে।

ওরা পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে বসলো।

শ্যামল কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না।

নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রে তপতীই প্রথম বললেঃ তুমি এতোদিন ব'লে এসেছো আমায় বিয়ে করবে। আজ সে সময় এসেছে।

শ্যামল চমকে উঠলো। ওর মেরুদণ্ডের মধ্যে ব'য়ে গেলো একটা ঠাণ্ডা স্রোত।

—কি হ'লো কি আবার ? প্রায় বিরক্ত কণ্ঠে ও বললেঃ বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে গেলে কেন হঠাৎ ?

—ক্ষেপে না গিয়ে উপায় কি বলো না ? তপতী

দ্বিধাজড়িত স্বরে উত্তর দিলে : আর এক দিনও অপেক্ষা করা যায় না। তুমি বাড়ীতে বলো যে, আমায় তুমি বিয়ে করতে চাও। চাও নয়; বলো, বিয়ে করবে।

—এতো তাড়া কিসের? শ্যামলের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেলো।

—কুমারী থাকতে আমার আপত্তি ছিলো না। তপতী যেন হঠাৎ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠেই শ্যামলের কোলের ওপর মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো; কেঁদে উঠলো উচ্ছৃংখল কান্না।

ত্রস্ত হ'য়ে ওর মাথাটা জোর ক'রে তুলে দিলে শ্যামল; চারিদিকে একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। না, কেউ লক্ষ্য করে নি। শীতের দুপুর। তামাটে রোদ আর রুক্ষ বাতাসে ম্রিয়মানা পৃথিবী যেন ঝিমোচ্ছে।

কয়েক মিনিট কাটলো।

রক্তিম মুখের ওপর থেকে সিক্ত অঞ্চল-প্রান্ত তপতী সরিয়ে নিলে। অদ্ভুত দৃষ্টি ওর প্রসারিত হ'লো শ্যামলের মুখের ওপর।

—কিন্তু এখন কি আর কোনো উপায় নেই? শ্যামল জিগ্‌গেস করলে।

—একটি মাত্র উপায় আছে; সেটা হ'চ্ছে আমাদের বিয়ে। সর্বসমর্পণের শূন্যতা তপতীর সর্বাংগে।

—কিন্তু এতো শিগ্‌গির তা' কেমন ক'রে সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়? বিয়েই যদি তোমার করতে আপত্তি না থাকে তো কালকেই নয় কেন?

—কিন্তু আমাদের বিয়ে যে হ'তে পারে না। শ্যামলকে অবশেষে বলতে হ'লো। যুদ্ধে পরাজয়ের সুর ওর কণ্ঠে। ও ভীরু; বোধহয় কাপুরুষ। শ্যামল পুরুষ।

নিমেষে তপতীর সমস্ত মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো। বিন্দুতম রক্ত নেই সেখানে, নেই পরমাণুমাত্র লালিত্য।

—কি বলছো তুমি? তবে কি তুমি এতোদিন আমায় মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়েছো?

—না, প্রলোভন ঠিক নয়। কুঞ্চিত হ'লো শ্যামলের ভ্রূযুগল। ও বললে: বিয়ে যে একেবারেই হ'তে পারে না, এমন নয়। গলার স্বরে ওর সন্দেহ, দ্বিধা।

—তবে কী? তপতী দৃপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললে: জানতুম তোমার সংগে আমার বিয়ে হবেই; এবং হবেও তা'। বিয়ে আমাদের হ'তে পারে যে-কোনো মতে; হিন্দুমতে, ব্রাহ্মমতে, সিভিলম্যারেজও হ'তে পারে।

—কিন্তু, একটা ঢোক গিলে নিয়ে শ্যামল বললে: আমরা ব্রাহ্মণ; মত দেবে কেন বাড়ীতে? তোমাকে তো রাখতে হবে বাড়ীতেই। কিন্তু কোথাও আমাদের আশ্রয় হবে না। তা' ছাড়া আমাদের একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে, সম্ভ্রম আছে। লোকের মুখে আমি হাত দেবো কেমন ক'রে? বদনামের বোঝাই বা বইবো কেমন ক'রে?

—এতে তোমার বদনাম হবে না? লোকে যদি জানতে পারে এ তোমারি সন্তান? আগুনের হল্‌কার মতো কথা-গুলো বেরিয়ে এলো তপতীর মুখ থেকে।

—সেটা না জানালেও চলবে।

—তা' হয় না। কেটে কেটে বললে তপতী: লোকে জানবেই। একটা পরিচয় তো আমায় দিতে হবে। সে লজ্জাজনক অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে হ'লে বিয়েই কি বাঞ্ছনীয় নয়? তা' ছাড়া তুমি যদি আমায় ভালোই বাসো তো যে-কোনো অবস্থাতে আমাদের বিয়ে হ'তে পারে।

সমাজ থেকে জীবন অনেক বড়ো; সম্ভ্রম থেকে আমাদের ভালোবাসা অনেক শ্রেষ্ঠ।

তপতী থামলো। উত্তেজনায় কাঁপছে ওর সমস্ত শরীর।

—শোনো! ওকে আসতেই যে দিতে হবে এর কি মানে? যা'কে আমরা চাইনে তা'কে সংসারে না আনলেই তো হ'লো? সমাধানের ইংগিত দিতে চাইলে শ্যামল।

—সেটা তোমার ভাবা উচিত ছিলো অনেক আগে। এখন আর কোনো উপায় নেই। কঠিন প্রতিবাদ জানালে তপতী।

—কে বললে উপায় নেই? শ্যামলের কণ্ঠে প্রকাশ পেলো ভংগুর উৎসাহ।

—সে উপায় অবলম্বন করতে আমি রাজী নই। শাণিত কণ্ঠে উত্তর দিলে তপতী।

—তাহ'লে করো যা' ইচ্ছে; আমার আর করবার কিছু নেই। উত্তপ্ত শ্যামল সমগ্র ঘটনার ওপর একটা সমাপ্তির রেখা টেনে দিলে।

তপতীর মনে হ'লো এ লোক শ্যামল নয়, অন্য আর কেউ। ওর হিংস্র দৃষ্টির অন্তরালে পালাতে পারলে তপতী বেঁচে যেতো। তবু ও কোনো রকমে বললেঃ কিন্তু ভেবে দেখো একবার; আমার আর অন্য কোনো পথ নেই। কেঁপে উঠলো তপতীর কণ্ঠস্বর।

শ্যামলেরও উত্তর দেয়ার কিছু নেই।

তপতী হঠাৎ উঠে পড়লো। ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালে যাবার জন্যে।

—যাচ্ছো? এতোক্ষণে শ্যামল জিগ্‌গেস করলে।

তপতী একবারও তাকালে না পেছনে। মন্থর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পার্কের সীমানার বাইরে বেরিয়ে গেলো।

আত্রেয়ী কলেজ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে দেখলে বিছানায়

উপুড় হ'য়ে প'ড়ে তপতী কাঁদছে। কাঁদছে অজস্র কান্না; খোলা চুল বিস্রস্ত পরিচ্ছদ। সমস্ত শরীরটা ওর ফুলে ফুলে উঠছে।

আত্রেয়ী ছুটে গিয়ে ওর মাথাটা কোলে তুলে নিলে; সস্নেহ ব্যাকুলতায় জিগ্‌গেস করলো: কী ছোটদি? কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে রে?

ফুঁপিয়ে উঠলো তপতী; সশব্দ ক্রন্দনে ভেঙে পড়লো অগ্রজার বুকের ওপর।

—বল ছোটদি; কী হ'য়েছে? বল লক্ষীটি! বাড়ী থেকে খারাপ খবর এসেছে কিছু? দাদা ভালো আছে তো? বল না! আত্রেয়ীর কণ্ঠে করুণ ব্যগ্রতা।

—না, সে-সব কিছু নয়। উচ্ছ্বসিত কান্নার ভীড় ঠেলে কথা ক'টা তপতীর মুখ থেকে কোনো রকমে বেরিয়ে এলো।

—তবে?

—বড়দি'! আবার আত্রেয়ীর বুকের মধ্যে মুখ লুকোলে তপতী।

—আচ্ছা, বলতে হবে না তোকে কিছু। চুপ কর; লক্ষীটি কাঁদিস না।

কয়েক মুহূর্তের অবসর।

তপতী শান্তভাবে মুখ তুললো; অস্পষ্ট ধূসর গলায় বললে: ভয়ানক অন্যায় করেছি। বড়দি', আমায় তুমি কখনো ক্ষমা করতে পারবে না।

ভয়ানক আশ্চর্য হ'য়ে আত্রেয়ী প্রশ্ন করলে: কী হয়েছে কি?

—কেমন ক'রে আমি বলবো? করুণ কণ্ঠে বললে তপতী।

—এমন কিছু অন্যায় পৃথিবীতে নেই যা' বলা যায় না।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'লো। পারার মতো ভারী মুহূর্তগুলো। ঘরের মধ্যে একটা ভয়াবহ শান্ত ভাব। বাইরে নেমে আসছে অপরাহ্ণের ছায়া···অন্ধকার রাত্রির ইংগিত; তপতীর আনুপূর্বিক কলংক-ইতিহাস······

চৌরংগীর সেই রেস্তোরাঁয় আত্রেয়ী অনমিত্রের সংগে সাক্ষাৎ করা স্থির করেছিলো। প্রায় ঘন্টাখানেক ওরা মাঝে মাঝে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে আর চলছে মৃদু গুঞ্জন।

—কিন্তু ওকে যে আর সামলানো যাচ্ছে না। ব্যাকুল কণ্ঠে আত্রেয়ী বললেঃ পড়াশোনা বন্ধ করেছে; রাত্রে ঘুমোয় না, ঘুরে বেড়ায় ছাতে; দিনে ঘরের বাইরে পা দেয় না।

—ঠিক হ'য়ে যাবে সব। হেসে অনমিত্র বললে: এতো ঘাবড়ালে চলবে কেন?

—আপনি চেনেন না কি শ্যামলকে?

—আলাপ নেই; দেখেছি।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

—কী উপায় হবে এখন? আত্রেয়ী একান্ত কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে।

—হবে বৈ কি। চলুন এখান থেকে যাই। এবারে এরা চেয়ার টেব্‌লের ভাড়া নেবে। ক্ষিধে তো আর নেই পেটে; না হ'লে আরও কিছু চেষ্টা করা যেতো; আপনিই না হয় আর কিছু চালান।

—যা' বলেছেন। চলুন, ওঠা যাক।

ওরা পথে এসে দাঁড়ালো। তখন বিকেল চারটে।

দিন সাতেক পরে একদিন সকাল বেলা একখানা প্রকাণ্ড

হাম্বার গাড়ী শ্যামলের বাড়ীর কিছু দূরে এসে থামলো। এই গাড়ীটা থেকে আরো একদিন অনমিত্র নেমেছিলো চৌরংগীর রাস্তায়।

গাড়ী থেকে নামলে অনমিত্র। তাকালো একবার বাড়ীটার দিকে। চালক গাড়ীটা ব্যাক্ ক'রে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড় করালো।

আজ আর অনমিত্রের কাঁধ থেকে কোট ঝুলছে না। কোটের সব ক'টা বোতাম আঁটা। চুলে বিরাজ করছে শৃংখলা। আর মুখের সিগারেট অনির্বাণ।

অনমিত্র কয়েক গজ দূরে নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলো। কেউ গেলো শ্যামলদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে; কেউ ঢুকলো বা।

অনমিত্র বারবার পকেট থেকে ঘড়িটা বা'র ক'রে দেখছিলো। প্রত্যেকটি মুহূর্ত ওর কাছে মূল্যবান; আজ ওর অনেক কাজ।

প্রায় আটটার সময় শ্যামল রাস্তায় এলো। সুসজ্জিত বেশ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েক পা এগিয়ে গেছে এমন সময়ে কে ওকে পেছন থেকে ডাকলে: শুনুন!

চমকে ফিরে দাঁড়ালো শ্যামল। হ্যাঁ, ওকেই ডাকছে। কিন্তু······ও আশ্চর্য বোধ করলে, এ ভদ্রলোককে ও পূর্বে কখনও দেখেও নি।

—আমাকে বলছেন? বিস্মিত শ্যামল প্রশ্ন করলে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়ীতে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন; আপনার সংগে দেখা করতে চান।

ওরা দু'জনে গাড়ীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে একটি লোক পেশীবহুল হাত দুটো তুলে বললে: নমস্কার! এই যে, ভেতরে আসুন।

—কিন্তু······আপনার সংগে তো আমার পরিচয়ও নেই। থতমত খেয়ে শ্যামল বললে।

অনমিত্র এতোক্ষণে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ; ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে বললে : আমাদেরও নেই। কিন্তু কোনো কথা না ব'লে গাড়ীতে উঠে পড়ুন।

—কেন ? শ্যামল অবাক হ'য়ে অনমিত্রের প্রশস্ত কাঁধের দিকে তাকালে।

—কেন কি ; উঠুন ! অনমিত্রের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

শ্যামল কোনো প্রতিবাদ করবার আগেই অনমিত্র ওকে প্রায় ঠেলে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিলে । সংগে সংগেই নিজেও উঠে প'ড়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। শ্যামল কিছু বলবার বা বুঝতে পারবার আগেই গাড়ী বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চললো।

শ্যামলের মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেলো। কয়েকজন লোক তা'কে গাড়ীতে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে হঠাৎ ওর মুখ থেকে একটা অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এলো।

—চুপ করুন! কে একজন বললে। ওকেও শ্যামল দেখেনি কখনো।

—কোথায় আপনারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন ? কাতর কণ্ঠে শ্যামল বললে : আমার পকেটে যা' কিছু আছে দিয়ে দিচ্ছি ; আমায় ছেড়ে দিন। আমার আংটি, সোনার বোতাম, ঘড়ি সব আপনাদের দিচ্ছি ; আমায়—

—আঃ! কে একজন ধমক দিয়ে উঠলো।

শ্যামল চুপ করলো। এরা যে সাধারণ লোক নয় এটা ও বুঝতে পেরেছে ; এবং সহজে যে ওকে ছেড়েও দেবে না এ-কথাও ওকে বুঝিয়ে দেয়ার দরকার হ'লো না। ভালো ক'রে হেলান দিয়ে বসলো শ্যামল। গাড়ীর মধ্যে অনমিত্র

ছাড়া আরও দু'জন যুবক এবং গাড়ী চালাচ্ছে একজন।

—আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী, জানতে পারি কি? শ্যামল শান্ত কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে। ও বুঝেছে, অস্থির হ'য়ে লাভ নেই।

—উদ্দেশ্য মহৎ। একজন উত্তর দিলে।

—সেটা কি? শ্যামল পুনরায় প্রশ্ন করলে।

—যথাসময়ে জানতে পারবেন। জবাব এলো।

গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ। কেউ আর কোনো কথা বলছে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ী টালিগঞ্জের একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। এখানে ওখানে দু' এক জন ক'রে লোক; মৃদু তাদের গুঞ্জন।

—আসুন নেমে। অনমিত্র শ্যামলকে ডাকলে।

—যদি না আমি গাড়ী থেকে নামি, কী করতে পারেন আপনি?

—শুধু মাত্র অনুরোধ। মৃদু হেসে অনমিত্র বললে।

—আপনার অনুরোধ যদি আমি না শুনি?

—সে ক্ষেত্রে অবশ্য বল-প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো। কিন্তু সেটা আমরা কেউই চাই না।

শ্যামল একে একে ওদের প্রত্যেকের প্রতি একবার তাকালো। অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ চেহারা প্রত্যেকের; রীতি-মতো ভদ্রলোক। কিন্তু…কি মতলব এদের? তা'কে কি হত্যা করা হবে? কী তা'র অপরাধ? যন্ত্রচালিতের মতো শ্যামল গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। পালাবার চেষ্টা বৃথা; চারিদিকেই ওদের লোক আর সতর্ক সবারি দৃষ্টি।

—কোন দিকে যাবো? শ্যামলের কণ্ঠ নিস্তেজ।

—সামনের ওই দরজা দিয়ে।

শ্যামল নিঃশব্দে প্রবেশ করলো। পরিষ্কার বাড়ী। আসবাব-পত্র অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। যা' আছে তা' সুসজ্জিত।

—বাঁ দিকে সিঁড়ি।

শ্যামল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো।

—ওই তৃতীয় ঘরখানা আপনার।

অদ্ভুত শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠস্বর বক্তার। শ্যামল তাকালে ওর দিকে। লোকটা মোটর চালাচ্ছিলো। রীতিমতো জোয়ান আর সাংঘাতিক চওড়া কাঁধ।

এগিয়ে গিয়ে শ্যামল ওর নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করলো। একখানা খাট; বিছানা পাতা রয়েছে। সমস্ত নূতন; এমন কি তোষক, চাদর, বালিশ পর্যন্ত।

—এখানে আপনি থাকবেন। মেঘমন্দ্রস্বরে পূর্বোক্ত বক্তা বললেঃ আপনার জামা এই হুকে টাঙিয়ে রাখতে পারেন; বিছানা আপনারই জন্যে। ওই টেব্‌ল্‌টায় কতক-গুলো বই রয়েছে; ইংরাজি, বাঙলা, উপন্যাস, গল্প, ইতিহাস, সেক্‌স্—যেটা ভালো লাগে সময় কাটানোর জন্যে পড়বেন। এক মুহূর্ত থেমেঃ আই এক্স্‌পেক্ট্‌ সেক্স্‌ ইজ্‌ ইয়োর স্যবজেক্ট্‌। হ্যাঁ, যথাসময়ে খাদ্যাদি পাবেন; সম্প্রতি এক বাটি চা'ও মিলতে পারে। বাইরে বারান্দার শেষে বাথরুম; হট্‌ য়্যাণ্ড কোল্ড্‌ দু'রকম ব্যবস্থাই আছে; যা' আপনার অভিরুচি। ওধারে আলনায় নতুন ধুতি আর তোয়ালে রইলো; স্নানের সময় দরকার হ'তে পারে। আর—

শ্যামল আর সহ্য করতে পারলো না লোকটার হৃদয়হীনতা; বক্তার হাত চেপে ধ'রে বললেঃ দোহাই আপনার; বলুন এ-সবের মানে কি? আমাকে কেন আপনারা আটকে রেখেছেন। শুধু বলুন, কতোক্ষণ আমায় থাকতে হবে এখানে?

শ্যামলের কাকুতির দিকে তা'র ভ্রূক্ষেপ নেই। আস্তে

আস্তে হাত মুক্ত ক'রে নিয়ে সে বললে : আচ্ছা ; আমার কাজ শেষ হয়েছে। পরে দেখা হবে আবার ; বাই-বাই।

বক্তা নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলো।

শ্যামল তাকালে একবার খোলা দরজার দিকে। দরজা খোলা ; কিন্তু এক পা-ও নড়বার ওর সাহস নেই। বাইরে বারান্দায় গিয়ে মুখ বা'র ক'রে যে একবার দেখবে সেটুকু ইচ্ছাশক্তি পর্যন্ত ওর যেন লোপ পেয়েছে। শ্যামল একটা পদার্থের মতো বিছানায় পড়ে' রইলো।

তেরো

অনমিত্র নিজে আবার মোটর হাঁকিয়ে এলো শ্যামলদের বাড়ী।

বৈঠকখানার দরজায় পা দিতেই সামনে প্রকাণ্ড একটা গোল য্যামেরিক্যান্ ক্লক্। দশটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট দেরী। বিরাট সেক্রেটেরিয়েট্ টেব্‌লে রাশীকৃত বই। কাগজ-পত্রের ভীড়ের মধ্যে শ্যামলের বাবা জ্ঞানরঞ্জন মুখার্জি একটা নথি পড়ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত য্যাটর্ণি তিনি।

অনমিত্র সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো।

জ্ঞানরঞ্জনবাবুর কয়েকজন মক্কেল বসেছিলো টেব্‌লের চারিদিকে। সিগারেটের গন্ধে গৃহকর্তা হঠাৎ মুখ তুলে দেখলেন, তাঁর সামনেই একজন ছোক্‌রা সিগারেট্ ফুঁক্‌ছে। জ্ঞানরঞ্জনবাবু প্রায় ক্ষেপে গেলেন।

—নমস্কার। হাত তুলে অনমিত্র বললে।

অনমিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানরঞ্জনবাবু বললেন: তোমার স্পর্ধা তো বড়ো কম নয় হে! তিনি অবাক হ'য়ে তাকালেন অনমিত্রের দিকে।

অনমিত্র সশব্দে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লো পাশে।

—তোমাকে এখানে আসতে কে বলেছে?

—কেউ না। অনমিত্র হাতের সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বললে।

—কেন এসেছো তাহ'লে?

—প্রয়োজন। অনমিত্রের শান্ত, সংযত কণ্ঠস্বর।

—তোমাকে আমি চিনি না। তোমার সংগে আমার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।

—সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে। আমি আপনাকে চিনি। কাজটাও অত্যন্ত জরুরী। অনুগ্রহ ক'রে এ ভদ্রলোকদের পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলুন। সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে অনমিত্র বললে।

—দরকার নেই পাশের ঘরে যাবার। ওঁরা এখানেই থাকবেন। কিন্তু আমার সময়ের মূল্য অনেক বেশী তা' বোধ হয় তুমি জানো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ; সময়ের মূল্য আমারো কম নয়। যাক্, আমি আপনার ছেলে শ্যামলের বিশেষ বন্ধু।

—সে-জন্যেই আমার সামনে তুমি অসংকোচে সিগারেট টানছো।

—বাঃ, তা'তে কি এসে যাচ্ছে? আপনার সামনে যদি চায়ে চুমুক দিতে পারি, চকোলেট চিবোতে পারি, আঙুল যদি চুষতে পারি, তো সিগারেট ব্যবহারেও কোনো দোষ নেই। যাক—সে তর্ক আজ করবার সময় নেই। আরেক দিন যদি হয় এসে বিষয়টা প্রাঞ্জল ক'রে দেয়া যাবে। সেদিন আমি প্রমাণ ক'রে দেবো, কোনো কিছুই করার মধ্যে দোষ নেই যদি না বাস্তবিকই সেটা কারো পক্ষে ক্ষতিকর হয়। দোষ শুধু ……কিন্তু……নাঃ; আজ আর সে-সব আলোচনার সময় নেই। বলছিলাম, শ্যামল আমার বন্ধু; এবং সে-জন্যেই আমারো খানিকটা কর্তব্য আছে। কথাটা তা'রি সম্বন্ধে—

—প্লীজ, আপনারা সবাই একটু পাশের ঘরে অপেক্ষা করবেন? জ্ঞানরঞ্জনবাবু বললেন।

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা বাইরে গেলেন।

—যখন আমরা সবাই ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ি, সোজা হ'য়ে ব'সে

অনমিত্র শুরু করলে : তখন একটি মেয়ের সংগে শ্যামলের আলাপ হয়। প্রায় দু' বছর ; ওদের আলাপ ক্রমে পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

অনমিত্র থামলো। শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা রাখবার জন্যে য়্যাশ্‌ট্রে খুঁজলো ; পেলো না। জানলা দিয়ে অবশিস্ট সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে বললে : একটা য়্যাশ্‌ট্রের অভাব দেখছি! আপনার মক্কেলরা, বিড়ি-সিগারেট যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অসুবিধায় পড়েন। ও……হ্যাঁ…… তারপর তা'রা ভালোবাসলো দু'জন দু'জনকেই। গভীর সে ভালোবাসা। সে শুধু অনুভব করবার ; তা'কে বিশ্লেষণ করা যায় না। শ্যামল জানালে, সে বিয়ে করবে ; মেয়েটিরও আপত্তি থাকবার কথা নয়। আরও অনেক প্রশ্ন শ্যামলের মনে ভীড় করেছিলো বটে ; অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক সন্দেহ, দ্বিধা, ভয়, আশংকা। কিন্তু ওদের প্রেম রইলো অটল হ'য়ে, অনির্বাণ এক জ্যোতির মতো। ওদের মিলিত আত্মার ওপর সে প্রেমের প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। আমরা দূর থেকে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু ক'রে স'রে দাঁড়ালাম।

অনমিত্র পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বা'র ক'রে দুই ঠোঁটের ফাঁকে আল্‌গোছে চেপে ধ'রে বললে : দেশলাই আছে ?

জ্ঞানরঞ্জনবাবু এতোক্ষণ প্রগাঢ় বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন অনমিত্রের মুখের দিকে। এবারে তাঁর যেন চমক ভাঙলো : দেশলাই ! ওরে, কে আছিস ? তিনি প্রবল কণ্ঠে হাঁক দিলেন।

—হুজুর। বাগানে মালী পাতা পরিষ্কার করছিলো ; ছুটে এসে দাঁড়ালো দরজার পাশে।

—শিগ্‌গির একটা দেশলাই নিয়ে আয়।

প্রভুর সম্মান বাঁচাতে তাঁকে আড়াল করতে হয়। অতএব আকস্মিক ভংগীতে সেইখানেই পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে মালী ট্যাঁক্ থেকে দেশলাইটা বা'র ক'রে এগিয়ে ধরলে।

অনমিত্র সিগারেট ধরিয়ে নিলে।

দেশলাই ফেরত নিয়ে মালী প্রস্থান করলো।

—তারপর শুনুন। গভীর একটা টান দিয়ে অনমিত্র বললে: আজ ওদের বিয়ে; মানে আজই সন্ধ্যায়। লগ্ন ক'টায় এখনো জানা যায় নি। এখান থেকে যেতে হবে পুরুতের বাড়ী। তা' আপনাদের না জানালে কাজটা অসম্পূর্ণ থাকতো। শ্যামল নিজেই বললে, আপনাকে সংবাদটা দিতে। আমার নিজেরো অনুরোধ, আপনারা, প্রবীণ এবং আত্মীয়েরা উপস্থিত থেকে বিয়েটা দেওয়ালে আমাদের দায়িত্বটা ক'মে যায়। ও-সব বিষয়ে আমাদের কারও কিছু জানা নেই কিনা।

—এতোখানি করবার তা'র সাহস ছিলো; শুধু আমাকে বলবারই সাহস ছিলো না? জ্ঞানরঞ্জনবাবু শান্ত কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন।

—অনর্থক একটা গোলমাল বাধিয়ে আপনাদের শান্তি ভংগ করা ওর ইচ্ছে নয়। এ-তো জানা কথা যে, আপনারা রাজী হবেন না কখনো; সমর্থন করবেন না এ বিয়ে। সে-জন্যেই জানায় নি আপনাদের।

—সে কি জানে না, তা'র এই কাজে লোকের চোখে আমরা কতো হীন, কতো নীচু হ'য়ে যাবো? জানে না, আমাদের সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আদর্শ এবং প্রতিপত্তি কতোখানি ক্ষুণ্ণ হবে?

—না; সে জানে না। অনমিত্র বললে: তা'র বিশ্বাস, আপনাদের কারও সম্মান হানি হবার মতো এতে নেই কিছু। এতো দীর্ঘ পরিচয় এবং নিবিড় ঘনিষ্ঠতার পর আজ যদি ও

শুধু সামাজিক আদর্শ এবং প্রতিপত্তির জন্যে মেয়েটিকে বিয়ে না করে, তাহ'লে তা'র ওপর যে অন্যায় এবং অবিচার ও করবে, সে-বিষয়ে আপনাদের সমাজ কি বলে ? কিছুই বলে না। আর সে ক্ষেত্রে আপনারাও সবাই নীরব।

—কি জাতি ? জ্ঞানরঞ্জনবাবু জিগ্‌গেস করলেন।

—এসে যায় না কিছু। জাতির চাইতে বড়ো মানুষ।

—আশা করি, আমায় তুমি বক্তৃতা শোনাবে না।

—কথাটা অতি সত্য, শোনাচ্ছে অবশ্য বক্তৃতার মতো।

—শোনা যাক্, মেয়ে কি জাত ?

—কায়স্থ। অনমিত্র তাকালে জ্ঞানরঞ্জনবাবুর মুখের দিকে, দেখতে বুলেটের প্রতিক্রিয়া।

কোনো ভাবান্তর ঘট্‌লো না তাঁর মুখে। অনমিত্র নিশ্চিন্ত হ'লো।

—বিয়ে কি মতে হ'চ্ছে ?

—হিন্দু মতে।

—কিন্তু আইনতঃ বিভিন্ন জাতির বিয়ে গ্রাহ্য নয় ; সেটা খোঁজ রাখো ?

—হুঁ, রাখি।

—অতএব কি ব্যবস্থা করছো ?

—আপাততঃ বিয়েটা হিন্দু-মতে হ'য়ে যাক্ ; তারপর রেজেষ্ট্রী ক'রে ফেললেই হবে।

নিঃশব্দে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হ'লো। প্রকাণ্ড ওয়াল-ক্লক্‌টা টিক্ টিক্ ক'রে চলেছে।

—বিয়েটা কোথায় হ'চ্ছে ?

—টালিগঞ্জে আমাদের একটা বাড়ী আছে। অনমিত্র ঠিকানা দিয়ে বললে : সংপ্রতি খালি হ'য়েছে, সেখানেই। মেয়ের বাড়ী তালতলা। বাবা মা নেই কেউ। কাকার

কাছে থেকে লেখাপড়া করছিলো ; এবার আই. এ. দেবে। মেয়েদের বয়েস সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই ; তবে ওই বয়েসেই বিয়ে-থা হয় দেখেছি। ওদের বংশ সম্ভ্রান্ত, মেয়ে সচ্চরিত্রা এবং—

অনমিত্র হঠাৎ চুপ করলো।

—এবং কি ?

—এবং অসামান্যা সুন্দরী ; কিন্তু গরীব।

—বিয়ের খরচ-পত্র দিচ্ছে কে ?

—বন্ধুরা চাঁদা ক'রে।

—ভবিষ্যতে বৌকেও বোধহয় বন্ধুরা চাঁদা ক'রে খাওয়াবে ?

—আজ্ঞে না ; আপনি তো রয়েছেন।

—আমি যদি বৌকে ঘরে না নি ?

অনমিত্র উত্তর দিলে না ; নীরবে সিগারেট টানতে লাগলো।

—কেন এসেছো আমার কাছে ? হঠাৎ তিনি গর্জে উঠলেন : কিসের জন্যে এসেছো ? তোমরা কি ভেবেছিলে আমার সম্মতি পাবে ? এই দুর্নীতি এবং অসংযমের প্রশ্রয় দেবো, এই কি তোমরা ভেবেছো ? সমাজের শৃংখলা ব'লে একটা জিনিষ আছে। সে শৃংখলা তোমরা ভাঙবে, তা'তেই আমরা সম্মতি দেবো—এই তোমরা ভেবেছো ? যাও ; এখনি চ'লে যাও। ব'লে দিয়ো, তা'র সংগে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

অনমিত্র কোনো উত্তর দিলে না। কয়েক মিনিট নীরবে কাটলো। আর একটা সিগারেট বা'র ক'রে উঠে দাঁড়ালে অনমিত্র। ও চ'লে যাচ্ছিলো ; কাজ ওর শেষ হ'য়েছে। প্রায়

দরজার বাইরে এসে পড়েছে, এমন সময়ে জ্ঞানরঞ্জনবাবু ডাকলেন : ওহে শোনো !

অনমিত্র থেমে গেলো ; প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশ করলো ঘরের ভেতরে।

—বোসো। জ্ঞানরঞ্জনবাবু আদেশ করলেন।

অনমিত্র চেয়ারে বসলো ; বিস্মিত ওর দৃষ্টি।

চেয়ার সরিয়ে জ্ঞানরঞ্জনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ দেহ ; প্রায় বার্ধক্যের কোঠায় এসে পড়েছেন। কিন্তু এখনো সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। চোখে যৌবনের প্রখরতা ও ঔজ্জ্বল্য। কাঁচা-পাকা চুলগুলো ব্যাক্-ব্রাশ্ করা। তিনি ঘরের বাইরে গেলেন। ব'লে গেলেন : বোসো, যেও না।

অনমিত্র সিগারেট টানতে লাগলো।

—এই নাও। জ্ঞানরঞ্জনবাবু ফিরে এলেন।

অনমিত্র প্রায় বোকার মতো তাকিয়ে রইলো ওঁর দিকে। এক তাড়া নোট গুঁজে দিলেন তিনি ওর হাতে। পাঁচশো হ'তে পারে ; হ'তে পারে হাজারও।

—শোনো ! এর চাইতে বেশী কিছু করবার আমার সামর্থ্য নেই। জ্ঞানরঞ্জনবাবু অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : কেউ যেন না জানতে পারে এই টাকার কথা। যেতে আর পারি না তো ! অনেক বাধা, অনেক শাসন। সামাজিক পংকে আমূল আমরা ডুবে আছি ; বুঝলে হে ? তোমরা সে-সব ধারণাও করতে পারবে না। বুঝি, সবই ঠুন্‌কো। কিন্তু উপায় নেই। এখনো দীর্ঘ জীবন বাঁচতে হবে। আশা করি তুমি বুঝবে। বুদ্ধিমান তুমি। পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে আস্তে আস্তে। ভাবনা করতে বারণ কোরো শ্যামল বা তা'র স্ত্রীকে। ব্রেভ্ ইয়ং সেট্ ! ব্যট্ মাই ডিয়্যর ফেলো, উই ল্যাক্‌ড্ দ্যাট ফায়ার। এর বেশী আর আমার বলবার নেই কিছু।

দশটা বাজার প্রথম ঘণ্টায় চকিত হ'য়ে উঠলেন জ্ঞানরঞ্জন বাবু। তাকালেন ঘড়ির দিকে; বিচলিত স্বরে বললেন: ওঃ·····ও, অনেক দেরী হ'য়ে গেলো অফিসের। আচ্ছা, গুড্ ল্যাক্।

বিস্মিত অনমিত্র রাস্তায় নেমে এলো। এতোখানি ও আশা করে নি।

গাড়ী হাঁকিয়ে আত্রেয়ীদের বাড়ী আসতে ওর মাত্র কয়েক মিনিট লাগলো।

—দেখুন, মিস্·····মিস্ আত্রেয়ী দেবীকে একবার ডেকে দিয়ে যান তো। একটা বিশেষ দরকার আছে।

বসন্তবাবু বেরুচ্ছিলেন কোর্টে। বিস্ময়াহত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন: কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

—পরিচিত একজন লোকও বলতে পারেন অথবা বন্ধুও বলতে পারেন।

—কি দরকার?

—একটু বিশেষ·····

বসন্তবাবু বাড়ীর ভেতর গেলেন। দু' মিনিট পরেই তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে অনমিত্র দুর্ঘটনার ইংগিত পেলো। মুখের সমস্ত রেখা ওর উঠলো কঠিন হ'য়ে।

আত্রেয়ী এলো। ওর মুখে এক বিন্দু সহজতা নেই।

—আসুন! অনমিত্র ওকে স্মিতকণ্ঠে আহ্বান করলে: আরে! আপনার কি শরীর খারাপ নাকি? অতো গম্ভীর যে? হ্যাঁ, শুনুন, আজ আমাদের যুদ্ধের শেষ। হয়তো জয়লাভই করবো! হয়তো কেন? নিশ্চয়ই! কিন্তু অনেক কাজ আপনার। তপতীকে তো সন্ধ্যের আগেই নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারের পর এ-বাড়ীতে আপনাদের আর স্থান হবে না ব'লেই মনে হ'চ্ছে। শ্যামল আজো ও-বাড়ীতেই আছে;

থাক্‌বেও শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম শ্যামলের বাবার কাছে। বল্‌লাম সব। প্রথমটায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু···আশ্চর্য লোক। শান্তভাবে গ্রহণ করলেন সংবাদটা। আ···র এই দেখুন—

অনমিত্র নোটের তাড়াটা পকেট থেকে বা'র ক'রে দেখালো। বললে : শ্যামলের বাবার সহানুভূতি। বিয়ের পরেই ওরা সোজা বাড়ী গিয়ে উঠতে পারবে। কোনো গোলমাল হবে ব'লে মনে হয় না।

—সত্যি ? গাঢ় কণ্ঠে আত্রেয়ী জিগ্‌গেস করলে।

—হুঁ, আমি বলি কি আপনারা চলুন এখনি আমার সংগে হয় আমার বাড়ীতে আর না-হয় যেখানে শ্যামল রয়েছে। যেতে তো হবেই সন্ধ্যের সময়। এখন আগুনের উত্তাপ রয়েছে ; ইন্ধনের প্রয়োজন হবে না। উনিই আপনার কাকা, না ? ভাব দেখে মনে হ'লো, বিকেলে আর আপনাকে আস্ত রাখবেন না।

—না, না। উনি লোক ভালো। আত্রেয়ী বললে : তবে মেয়েছেলের পুরুষ-বন্ধু ? একটা শ্যক্ তো ? তা' বিকেলের মধ্যেই সামলে উঠবেন। পুরুষদের তেমন ভয় নেই ; ভয় মেয়েদের। তা'রাই তা'দের পরম শত্রু। তা'দের রসনা ক্ষুরধার হ'য়ে উঠবে ; খান্ খান্ ক'রে ফেলতে চাইবে আমাদের দু'বোনকে।

—তাই বলছিলাম, এখনি চলুন আমার সংগে। আমি গাড়ী নিয়েই এসেছি। বিছানাপত্র না-হয় থাকুক ; আমি পরে নিয়ে যাবো।

—না, না। এতো তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজন নেই। জীবনে কতো সহ্য করেছি আর সামান্য কথার জ্বালা সইতে পারবো না ? কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন ?

—কি ?

ওরা বেরিয়ে গেলো। আত্রেয়ীর সমস্ত দেহে আশ্চর্য এক ভংগী। সুরবালার বাক্‌স্ফূরণ হ'লো না ; তিনি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

জিনিষগুলো তোলা হ'লো গাড়ীতে। আত্রেয়ী ও তপতী উঠে বসলো।

এতোক্ষণে আত্রেয়ী তাকালে অনমিত্রের মুখের দিকে। না ব'লে পারলে না : এ কি ? আপনার চেহারা অমন হ'য়েছে কেন ? স্নান করেন নি ?

—না ; একেবারে সময় পেলাম না ! দেখি, ফিরে গিয়ে যদি হয়। অনমিত্র বললে।

—খাওয়াটা জুটেছিলো তো ?

—তা' জুটেছিলো। আচ্ছা, আপনাদের বিদায়ের পালাটা খুব ড্রামাটিক্ হ'য়ে গেলো ; না ?

—ভয়ানক ! আরেকটু হ'লে মেলোড্রামাটিক্ হ'য়ে যেতো।

গাড়ী চলতে লাগলো।

—আপাততঃ আমাদের বাড়ীতেই চলুন। অনমিত্র বললে।

—না, না। দেখুন, আর হাংগামা করবেন না নতুন ক'রে।

—কিন্তু আমাদের বাড়ী মানে আমি আর মা। তিনি সবই জানেন ; অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাই তাঁকে বলেছি।

—না ; তা' হোক্। যেখানে যাচ্ছি সেটাও তো আপনাদেরই বাড়ী।

অনমিত্র বললে না কিছু।

গাড়ী এক নির্জন রাস্তায় একটা বাড়ীর সামনে এসে থামলো।

—আসুন ! অনমিত্র নেমে গিয়ে ওদের স্বাগত জানালে।

নামলো ওরা। একটা চাকর বুঝে নিলে জিনিষ-পত্রগুলো। রূপবতী তপতীকে দেখে অনমিত্রের বন্ধুরা চমকে উঠলো। এমন আশ্চর্য রূপসী মেয়ে সাধারণতঃ চোখে পড়ে না।

অনমিত্র ওদের নিয়ে এলো তিনতলার একটা ঘরে। বললেঃ আপাততঃ এখানেই সব গুছিয়ে নিন। পাশের দরজাটা খুললেই বাথরুম। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাড়ীতে লোকের অভাব নেই। কোনো কিছুর দরকার হ'লেই কাউকে ডেকে বলবেন। সংকোচ করবার মতো কেউই নেই এখানে। আমি যাই, মাকে ধ'রে নিয়ে আসি। এ-সব ব্যাপারে আমাদের কারোই বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। জিনিষপত্র কেনা হ'য়েছে, সবই তিনি ফর্দ ক'রে দিয়েছেন। এবার একটু গুছিয়ে নিতে হবে সব। নীচে তো দেখলেনই রান্নার হাংগামা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। অন্ততঃ শ' দুই লোক হবে। তারপর আবার যেতে হবে বাজারে; বর ক'নের কাপড়-চোপড় এখনো কেনা হয় নি! দেখি, আসল লোকটাকে আবার একটু উৎসাহ দিয়ে আসি।

অনমিত্র এলো দোতলায়, শ্যামলের ঘরে। শ্যামল বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলো। ভয়টা ওর অনেক কমেছে। তা'ছাড়া যতোগুলো লোকের সংগে এ-বাড়ীতে ওর দেখা হ'য়েছে বা কথা-বার্তা হ'য়েছে, সকলেই আশাতিরিক্ত ভদ্রলোক। শুধু এখনো ও জানতে পারে নি আসল ব্যাপারটা কি ?

অনমিত্র ঘরে প্রবেশ করতেই ও উঠে বসলো।

—কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে না তো? অনমিত্র জিগ্‌গেস করলে।

—এখানে আবার সুবিধে অসুবিধে কি ? নিজের ইচ্ছেয় কিছু হ'চ্ছে না কি ?

—হবে ; কাল সকাল থেকে। তা' ছাড়া নিজের ইচ্ছেয় কি করতে চান বলুন !

—সে তো সহস্র বার বলেছি, আমি এখান থেকে বাইরে যেতে চাই, রাস্তায়।

—সে অসম্ভব।

—কেন, সেটাই তো জানতে চাইছি।

—আপনার আজ বিয়ে ; সন্ধ্যে সাতটার সময়ে।

—বিয়ে ? শ্যামল আঁৎকে উঠলো : বিয়ে ? কেন ? আমি বিয়ে করবো, এ-কথা তো কাউকে বলি নি !

—আপনার বলা না-বলাতে তো কিছু এসে যায় না।

—মানে ? বিয়ে তবে কা'র ?

—অবশ্যই আপনার।

—অথচ আমার বলা না-বলায় কিছু এসে যায় না ?

—ঠিক তাই।

—ও। কে ঠিক করলো আমার বিয়ের ?

—এই আমরা সবাই। পাত্রীকে আপনি দেখেছেন ; আপনার সংগে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও আছে। নাম তপতী।

এক মুহূর্তে শ্যামলের মুখ রক্তহীন, পাংশু হ'য়ে গেলো। কয়েক মিনিট ও নিস্পন্দের মতো চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠলো : আমার এমন সর্বনাশ আপনারা করবেন, এ আমি ধারণাও করতে পারি নি। জানেন ? তাহ'লে আমার বাবা আর জীবনে আমার মুখ দেখবেন না !

—আপনার বাবার কাছে আমি আজ সকালবেলায় গিয়েছিলাম। সমস্ত বুঝিয়ে বলাতে তিনি সম্মতি দিলেন। প্রথম শুনেই অবশ্য রেগে গিয়েছিলেন ; পরে আমি ভিজিয়ে এসেছি ওঁকে। শেষকালে তিনি বললেন, বিয়ে করবে, এ-কথা আমাকে বললেই তো পারতো ; এতে অগৌরব তো কিছু নেই।

—আপনি বলেছেন, ভিন্ন জাতের মেয়ে ?

—বলেছি।

চুপচাপ উভয় পক্ষেই ; কয়েক মিনিট অতিবাহিত হ'লো।

হঠাৎ শ্যামল চীৎকার ক'রে উঠলো: বিয়ে করবো না আমি। কি করতে পারেন আপনারা?

—জোর ক'রে বিয়ে দিতে পারি।

—কিন্তু আমি যদি মন্ত্রোচ্চারণ না করি?

—কোনো ক্ষতি হবে না তা'তে। আমাদের উদ্দেশ্য, বাইরের সমাজকে, বাইরের পৃথিবীকে জানানো যে, আপনার এবং তপতীর বিয়ে হ'য়েছে; তপতী আপনার বিবাহিতা পত্নী; আপনি তা'র স্বামী। তারপর আপনি যান না যেখানে খুসি। বাল্যকালেই কতো মেয়ের স্বামী ম'রে যায় না? জীবন কি তা'দের ওমনি অর্থহীন হ'য়ে পড়ে? তা'দের কি আর পৃথিবীতে কিছুই করবার থাকে না?

শ্যামল কোনো উত্তর দিলে না। তর্ক করা বৃথা। এদের বিদ্যাবুদ্ধি ওর চাইতে মোটেও কম নয়। এবং শেষ পর্যন্ত রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। বিয়ে ওকে করতেই হবে; সে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেই হোক্ আর মুখ বুজে ব'সে থেকেই হোক্। তপতীকে ওর ধর্মপত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে হবেই।

সাতটা বাজবার কয়েক মিনিট মাত্র বাকি।

অনমিত্রের অগণিত বন্ধু এবং বান্ধবী; তা'র ওপর আবার এই রোম্যান্টিক কাণ্ড; হৈ-চৈএর আর অন্ত নেই। কিন্তু সূচনা আর ভূমিকার কথা জানে শুধু অনমিত্র। কয়েকটি মেয়ে তপতীকে সাজাতে লেগে গেলো। ওর বন্ধুরাও সব সংবাদ পেয়েছিলো। আনন্দে সবারি মন হাউইএর মতো আকাশে উড়ছে। সৌভাগ্যবতী তপতী। যা' ওদের প্রত্যেকের স্বপ্ন, তা'ই রূপায়িত হ'লো তপতীর জীবনে।

উরসিলা তপতীকে দীপ্যমান সজ্জায় দেখাচ্ছিলো মহীয়সী

এক রাণীর মতো। গোপন ঈর্ষায় কুমারীদের মধ্যে ভারি হ'য়ে উঠলো কারো কারো হৃদয়।

নীচের আঙিনায় বিয়ে আরম্ভ হ'লো। একদিকে পীড়া-পিড়ি চলতে লাগলো খেতে বসবার জন্যে। কিন্তু বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ পাতে বসবে না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় তপতীকে নামিয়ে আনা হ'লো। কে একজন ঠাট্টা ক'রে বললে: আশ্চর্য! এ মেয়ে ছিলো কোথায় হে? আমাদের চোখে একদিনও পড়লো না।

সবাই হেসে উঠলো।

তপতীকে দেখার পূর্ব পর্যন্ত শ্যামলের মনটা কঠিন হ'য়ে ছিলো। কিন্তু যখন অপরূপ রূপময়ী তপতীর করুণ মুখের পানে ও তাকালে, অনুভব করলে তা'র অতল দৃষ্টির মৌন আবেদন, এক মূহূর্তের মধ্যে শ্যামলের মন ভিজে গেলো অপূর্ব স্নেহে, অননুভূত এক সুষমায়। তপতীর প্রতি ওর অবিচারের এই প্রতিবিধানে শ্যামলের অন্তর সেই মুহূর্তে আলোক-রশ্মির মতো ঝল্‌সে উঠলো।

বিয়ের মাঝখানে হঠাৎ মৃদু এক গুঞ্জরণ উঠলো। শ্যামলের বাড়ী থেকে ওর মা এবং বোনেরা এসেছে।

শ্যামলের মন থেকে কেটে গেলো যতো মেঘ।

বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান যখন শেষ হ'লো, তখন রাত্রির কয়েক প্রহর মাত্র বাকি। সমস্ত শহর নিস্তব্ধ। পশ্চিমাকাশে শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদ; আর মিট্‌মিট্ করছে নিষ্প্রভ তারা, জাগরণ-ক্লান্ত রূপবতী নারীর চোখের মতো।

চোদ্দ

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। আকাশে উদয় হ'য়েছে অনেক পূর্ণিমার চাঁদ। বসন্তের বাতাসে মর্মরিত হ'য়েছে জীবনের অনেক স্বপ্ন। আত্রেয়ীর এবং অনমিত্রের, আরও অনেকের মনে কল্লোলিত হ'য়েছে অনেক আশা আকাংক্ষার ঢেউ।

তপতী ও শ্যামলের জীবনে আরম্ভ হ'য়েছে মধুমাস। তপতীর একটা ছেলে হ'য়েছে ; ওরি মতো সুন্দর। সে-বছর তপতী পাশ করেছিলো। শ্যামলের ইচ্ছে ছিলো ও আরো পড়ে ; কিন্তু তপতীর পড়বার ইচ্ছে নয়। বাইরের কোনো কিছুর সংগে আর ও নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায় না। জীবন-পাত্র ওর মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

আত্রেয়ী আছে অনমিত্রদের বাড়ীতে। গত জুন মাসে ও বি. এ. পাস করেছে। অনমিত্রের ইচ্ছে, ও এম. এ. পড়ে। আত্রেয়ীর ইচ্ছে চাকরী করবার। চাকরীর চেষ্টারও ওর অন্ত নেই। বিলাসপুরের কোনো গার্লস্-স্কুলে একটা চাকরীর জন্যে ও দরখাস্ত করেছে। উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনে যাচ্ছে। এম. এ.-টা প্রাইভেট্ দেবে এই আত্রেয়ীর ইচ্ছে।

অনমিত্রের বিধবা মা করুণাময়ীর সংগে পরিচয় না হ'লে আত্রেয়ী কখনো জানতো না এমন শুদ্ধ-অন্তঃকরণ, উদার কোনো মহিলার মন সম্ভব। আত্রেয়ী নতুন ক'রে পেয়েছে নিজের মাকে। করুণাময়ীর স্নেহের পক্ষ-ছায়ায় আত্রেয়ী কৃতার্থ ; পরিপূর্ণ ওর হৃদয়।

কিন্তু তবু, তবু ও যেতে চায়। স্নেহের ওপর, করুণার ওপর অত্যাচারী দাবীর কল্পনাও ও সইতে পারে না। কতো

দিন আর এমন ভাবে কাটতে পারে? এই স্নেহের বন্ধন, এই অট্টালিকার বন্ধন, এই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার অন্যায়ী মায়া তাই ও ফেলে যেতে চায় পশ্চাতে। চ'লে যেতে চায় অনেক দূরে, শহরের বাইরে, কোলাহল আর সাড়ম্বর সভ্যতার সীমানা পেরিয়ে, অনমিত্র ও করুণাময়ীর অদৃশ্য বন্ধনের স্পর্শ যেখানে পৌঁছায় না। প্রাচীর যেখানে মন-উপবনের সীমানা নয়; যেখানে প্রান্তরে উন্মুক্ত আকাশের ইংগিত।

—শোন্, তোর সংগে আমার কথা আছে। করুণাময়ী একদিন অনমিত্রকে পাকড়াও করলেন। প্রশান্ত মুখে ওঁর স্নেহের কমনীয়তা। বয়েস পঞ্চাশের কাছে।

—থাকবেই তো! অনমিত্র বললে।

—তুই কি ক'রে জানলি? করুণাময়ী হাসলেন।

—আশ্চর্য! কথা তো থাকবেই। কথাই তো আমাদের সব। কথা না থাকলেই তো বেঁচে থাকার সমস্ত অর্থ কঠিন হ'য়ে ওঠে।

—আচ্ছা, বল তো তুই এতো বকিস্ কেন?

—'এতো' শব্দটা তুমি খুব ভালোবাসো, না মা? এতো বকি, এতো ঘুরি, এতো পয়সা ওড়াই, এতো সিগারেট খাই। সব কথাতে তোমার 'এতো' আছেই।

—তুই কি বুঝতে পেরেছিস কি বলবো আমি?

—পেরেছি।

—তাই এতো বকছিস?

—হুঁ; শুরু করো।

—আচ্ছা, আত্রেয়ী এখান থেকে চ'লে যেতে চাইছে কেন?

—জানি না; কারণ আমার সংগে এ বিষয়ে কোনো কথাই হয় নি।

—কিন্তু তুই যেতে দিবি কেন ?

—বা রে ; ও তো আর আমাদের বন্দিনী নয়। যেতে না দেয়ার তো কোনো কারণ দেখছি না। কতোদিন আর পরের আশ্রয় ভালো লাগে ? এতোদিন ছিলো অনন্যোপায় হ'য়ে। আজ এসেছে জীবনে সুযোগ ; ঈপ্সিত পথ ও খুঁজে নেবে না ?

—কিন্তু একা ওই একটা মেয়ে, কোথায়, কতোদূরে……

—জীবনের জটিল পথের জন্যেই ও তৈরী মা ; যা' আর সব মেয়ে নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার ইংগিত দেখতে পাও না ওর অতল দৃষ্টিতে ?

—তবু আমি ওকে যেতে বারণ ক'রে দেবো, অনমি। আমার মন চাইছে না ওকে ছেড়ে দিতে।

—ছি, মা ! উন্মুক্ততাকে যে ভালোবাসে তা'কে তুমি বাঁধবে কেন ? স্বাধীনভাবে জীবনকে গ'ড়ে তোলবার গৌরব থেকে তুমি ওকে বঞ্চিত করবে কেন ? আমাদের করুণা বা স্নেহের চাইতে ওর আত্মমর্যাদা তো ছোটো নয়।

করুণাময়ীর কণ্ঠে আর কোনো উৎসাহ নেই। তিনি বললেন ঃ বেশ ! তোরা যা' ভালো বুঝিস্—

সত্যিসত্যিই বিলাসপুরের সে চাকরীটা আত্রেয়ী সৌভাগ্য-ক্রমে পেয়ে গেলো। এতে অবশ্য অনমিত্রের হাত ছিলো ; এবং সে সংবাদ গোপনীয়। অনমিত্রের এক বিশিষ্ট বন্ধু বিলাস-পুরের ইঞ্জিনীয়্যর। তা'কে ও বিশেষ ক'রে লিখেছিলো যা'তে আত্রেয়ীর চাকরীটা হয়।

চিঠিটা রেজেষ্ট্রি-ডাকে এসেছিলো ; অনমিত্রই সই ক'রে নিলে।

খাম হাতে নিয়ে অনমিত্র আত্রেয়ীর ঘরে ঢুকলো। সকাল এগারোটা হবে। আত্রেয়ী স্নান সেরে, খোলা চুলে চেয়ারে

ব'সে একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়ছিলো। অনমিত্রকে দেখে ও উঠে দাঁড়ালো।

—উঠলে যে? থাক না; আমি এখানটায় বসছি। তারপর? বইটা কি রকম লাগছে?

—চমৎকার! আচ্ছা, আমাদের দেশে এ-রকম ভাবতেই পারে না; না?

—পারে; কিন্তু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবার হুকুম নেই। তাহ'লেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শুচিবাই জাত; বুঝলে না?

—আচ্ছা, Mellors এর চরিত্র ভারি sad; না?

—খু-ব। আর কি জানো? ওর শান্ত স্বভাবের মধ্যে ভয়ংকর একটা বিদ্রোহী মন। ঠিক যেন—like a cold dynamite waiting to explode all. লোকটা Sir Clifford Chatterleyর gardener. অথচ Sir Clifford-এর ওপর ওর attitudeটা দেখেছো? আর শুধু Sir Cliflord-এর ওপরই নয়, সমস্ত যন্ত্র-সভ্যতার ওপর, সমস্ত আভিজাত্যের ওপর তা'র অবহেলা আর শ্লেষ। Mellors-এর প্রেম যে একদিন অপমানিত হবে, একথা সে জানতো। এটা যে কখনো গোপনীয় থাকবে না, সমস্ত যন্ত্রজগৎ যে একদিন তা' broadcast করবে, এ-কথাটাই সে তা'র বিদুষী প্রণয়িণীকে বলতে চেয়েছিলো। Mellors-এর চরিত্রটা কি রকম জানো? যন্ত্রের বিরুদ্ধে, সভ্যতার বিরুদ্ধে একটা রুদ্ধ অভিযোগ, একটা ক্ষুব্ধ নালিশ। আমাদের আত্মা যে এখানে প্রতি পদে কলুষিত, প্রতি মুহূর্তে নিপীড়িত হয়, এ কথাটা সে হৃদয়ংগম করেছিলো অনেক বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্যে।

অনমিত্র চুপ করলো।

—কিন্তু কেতাব-সমালোচনা আরেক দিন হবে; আপাততঃ একটা সুখবর আছে। অনমিত্র বললে।

—কি? শান্ত প্রশ্ন করলে আত্রেয়ী।

—Guess করো।

—আমি কিছুই Guess করতে পারছি না। আভাভরা আয়ত চোখে তাকালে আত্রেয়ী অনমিত্রের মুখের দিকে।

—দেখো। অনমিত্র খামখানা আত্রেয়ীর হাতে দিলে।

খাম দেখেই আত্রেয়ী বুঝতে পারলো; প'ড়ে দেখলে চিঠিখানা। পয়লা অগ্যাষ্ট্ থেকে তা'কে কাজে যোগদান করতে হবে। সংগে আরেকখানা চিঠিতে লিখেছেন হেড্ মিস্ট্রেস্, স্কুলের বোর্ডিংএ ও থাকতে পারে; শুধু Messing-এর দরুণ দশ টাকা দিলেই হবে। রওনা হবার আগে ও যেন ঐকখানা চিঠি দেয়।

—ভাবি নি এটা হবে। আত্রেয়ী বললে।

অনমিত্র মৃদু হাসলো।

—আচ্ছা, সেখানে এতো বাড়ীর ভিড় নেই, না? এতো লোকের ভিড়? ধূলো আর ধোঁয়া? মাটিতে লোহার লাইন আর আকাশে বৈদ্যুতিক বন্ধন? কেমন জায়গা তুমি জানো?

—জানি। অনমিত্র বললে: খোলা মাঠ শুধু, যে দিকেই চোখ যায়; শাল আর মহুয়া-বন; পাহাড় আর নদী; রাতের আকাশ। তোমার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পাবে আকাশের তারা। যদি কোনোদিন চাঁদ ওঠে মহুয়া বনে, তা'ও দেখতে পাবে। আ-র চাঁদ তো উঠবেই; কি বলো?

জুলাই মাসের আঠাশ তারিখ। সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

বাইরে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিলো। আকাশে মেঘের

সমারোহ। শ্রাবণের মাঝামাঝি। বর্ষার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিগন্ত।

সমস্ত আয়োজন শেষ হ'য়ে এসেছে। আত্রেয়ী সারা বিকেলটা অসম্ভব ব্যস্ত ছিলো যাত্রার জোগাড় করতে।

অনমিত্র অলস দেহ আর অনুপস্থিত মন নিয়ে সারাক্ষণ একটা সোফায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট টেনে কাটিয়ে দিলে। প্রাক্‌সন্ধ্যার ম্লানায়মান আলো আজ ওর অদ্ভুত লাগলো। মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্বের চারধারে একটা পোকা অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছে! সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনমিত্রের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো। রাত্রির আগতপ্রায় অন্ধকারের ইংগিত মূর্ছিত হ'য়ে উঠলো অনমিত্রের অন্তরে, ওর স্নায়ু-শিরায়।

সমস্ত কিছু সেরে আত্রেয়ী ঘরে এসে বসলো। এলো এতো লঘু পদক্ষেপে যে অনমিত্রের সমাহিত মন প্রথমে টেরই পেলে না। ব'সে রইলো আত্রেয়ী অনেকক্ষণ। অনমিত্র দেখছে সিগারেটের পুঞ্জীভূত ধোঁয়া। অনেকক্ষণ ওরা কোনো কথা বললে না। কথা কি তবে ওদের শেষ হ'য়ে গেছে আজ এই বর্ষামুখর সন্ধ্যায়?

অবশেষে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অনমিত্র কথা বললেঃ কাল এমন সময়ে তুমি সেখানে।

আত্রেয়ী শুধু একবার তাকালে অনমিত্রের দিকে। অদ্ভুত নরম ওর ভংগী।

অবসর।

—সময় হ'য়ে এলো। এবার ওঠ, অনমি।

ঘরে প্রবেশ করলেন করুণাময়ী।

—হ্যাঁ মা; এই যে। উঠে দাঁড়ালো আত্রেয়ী।

চাকর এসে জানালে গাড়ী তৈরী।

অনমিত্র উঠে কাঁধে কোট্‌টা ফেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আত্রেয়ী প্রণাম করলে করুণাময়ীকে। ও মুখ নীচু ক'রেই রইলো। করুণাময়ীর চোখ তখন ছলছল ক'রে উঠেছে।

অনমিত্র গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। রাস্তার লাল কাঁকর ছাপিয়ে সিঁড়ির নীচে জল জ'মে রয়েছে। শেষ ধাপ সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে ফুট্‌বোর্ডে পা রাখতে চাইলে আত্রেয়ী। হঠাৎ দু'জনেই একসংগে হাত বাড়িয়ে দিলে দু'জনের দিকে। আত্রেয়ী অনমিত্রের হাতটা টেনে নিতে পেরেছিলো কিংবা—অনমিত্রই আত্রেয়ীর হাতটা টেনে নিয়েছিলো।

অনমিত্র পূর্ণবেগে ড্রাইভ ক'রে এলো চৌরংগীর রাস্তায়। কাঁচের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট লাগছিলো ওর মুখে। চৌরংগীর আলোগুলো বৃষ্টির জলে ঝাপসা হ'য়ে গেছে। বাঁদিকের একটা ভয়ানক নির্জন রাস্তায় ও গাড়ীর মোড় ঘোরালো।

পেছনের সীটে ব'সে আত্রেয়ী; ব'সে রয়েছে জানলার ধারে মাথা রেখে। বাইরে রাত্রির নিস্তব্ধ শহর; য়্যাশ্‌ফ্যল্টের রাস্তা বৃষ্টির জলে চক্‌চক্ করছে। এলোমেলো হাওয়ার অবিশ্রান্ত দাপাদাপি অট্টালিকার কঠিন প্রাচীরে, পথপ্রান্তের কম্পনরত বৃক্ষশীর্ষে। জানলার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রূপালী পোকার মতো জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

ঠিক বোঝা গেলো না আত্রেয়ী অনমিত্রের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কি না!

তেমনিই বোঝা গেলো না অনমিত্র আত্রেয়ীর উপস্থিতির বিষয় সচেতন কি না।

আজ এই রাত্রে অনমিত্রের মনে পড়ছে আত্রেয়ীর সংগে